শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও কর্ম *

(তাঁর নিজের লেখা থেকে সংগৃহীত)

অনুবাদ—পশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীহিমাংশু কুমার নিয়োগী
শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশ কাল — ১৩৪৭

প্রচ্ছদচিত্র—সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র

মুদ্রক :
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে যেখানে যা কিছু লিখেছেন, তার থেকেই বেছে বেছে সংকলন ক'রে পুস্তিকাটি গ্রথিত হয়েছে তাঁরই মূল ইংরেজী ভাষা থেকে, সেইগুলি এখানে বাংলাতে অনুবাদ করা হলো। মাঝে মাঝে ঘটনা পরম্পরার শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য সংকলনকারক আপন ভাষাতে কিছু কিছু ব্যাখ্যা যোগ করেছেন, সেগুলি রইল [ ] চিহ্নিত ব্রাকেটের মধ্যে।

"O plains, O hills, O rivers of sweet Bengal,
O land of love and flowers, the spring bird's call
And southern wind are sweet among your trees.
Your Poet's words are sweeter far than these."

Sri Aurobindo on "Bamkim Ch. Chatterjee."

"হে বঙ্গের জলস্থল, হে চিরসুন্দর সুশোভন,
মধুর তোমরা সবে, মধুময় দক্ষিণ পবন—
বঙ্গের নিকুঞ্জবনে পিককণ্ঠে আছে মধু জানি,
তা হতে অধিক মধু মঞ্জুবাক্ বঙ্কিমের বাণী।"

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্ণ যোগ

পরিশিষ্ট



প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও প্রেরণা

১

ইংলণ্ডে অবস্থান—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা

শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয় কলকাতায় ১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে তাঁর পিতার ছিল সতেজ ব্যক্তিত্ব ও প্রচুর কর্মদক্ষতা, এ-দেশ থেকে প্রথম যাঁরা বিলাতে যান শিক্ষালাভের জন্য, তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। দেশে ফিরলেন সম্পূর্ণ সাহেবিয়ানার মনোভাব ও চালচলন নিয়ে—তা এতই বেশি উগ্র ছিল যে তাঁর পুত্র অরবিন্দ কেবল ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী ভাষা ছাড়া বাংলা কথা বলতে মোটেই শিখলেন না। নিজের দেশের বাংলা ভাষা প্রথম তিনি শিখলেন যৌবনকালে ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসার পরে। কারণ পিতা চাইতেন যে গোড়া থেকে পুরোপুরি ইউরোপীয়দের মতোই যেন তাঁর সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষা হয়। ভারতে থাকার কালে তাদের পড়তে পাঠানো হয়েছিল দার্জিলিংএ আইরিশ মিশনারি স্কুলে। তারপর ১৮৭৯ সালে তাঁর তিন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বিলাতে গিয়ে এক ইংরেজ পাদরী দম্পতির তত্ত্বাবধানে রেখে এলেন এই কড়া নির্দেশ দিয়ে যে কোনো ভারতীয়ের সঙ্গে তাদের যেন আদৌ মিশতে দেওয়া না হয়। এ নির্দেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল, অতএব অরবিন্দ সেখানে মানুষ হতে লাগলেন নিজের দেশ ভারতের সম্বন্ধে কিছুই না জেনে, ভারতের লোকের ধর্ম বা নীতি বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছুই তিনি জানলেন না।

*　　　*　　　*

ম্যাঞ্চেষ্টার সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে তিনি ক্ল্যাসিক ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষার দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন, এবং সেখানকার শেষের তিনটি বছর স্কুলের

পাঠ্য বিষয়গুলি পড়া ছাড়াও অবসর সময়ে তিনি বিশেষ ক'রে পড়তেন নানারকম ইংরেজী কাব্য-সাহিত্য ও উপন্যাসাদি। এ ছাড়া তিনি শিখলেন ফরাসী সাহিত্য, কিছু কিছু ইটালীয় এবং জার্মন এবং স্প্যানিশ ভাষা, এবং ইউরোপের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ও বর্তমান যুগের ইতিহাসও তিনি পড়লেন। অনেক সময় তিনি নিজেও কবিতা রচনা করতেন। স্কুলের পাঠ্যগুলি পড়ে ফেলতে তাঁর অল্প সময়ই লাগত, তাঁর পক্ষে তা এতই সহজ ছিল যে তাই নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করার দরকারই হতোনা। একবছর গ্রীক ও ল্যাটিন কবিতা লিখে তিনি কিংস্ কলেজের সকল পুরস্কারই লাভ করেছিলেন।

কেম্‌ব্রিজে গিয়ে তিনি কলেজে পড়লেন কিন্তু গ্রাজুয়েট হলেন না। ট্রাইপস্ পরীক্ষাতে প্রথম অংশে তিনি ফার্ষ্ট ক্লাস নিয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করলেন। এই প্রথম অংশে উত্তীর্ণ হলেই সাধারণত বি. এ. ডিগ্রি দেওয়া হয়; কিন্তু তিনি মাত্র দুই বছরেই ওতে উত্তীর্ণ হলেন। অথচ তিন বছর পড়া শেষ না হলে ও ডিগ্রি মেলে না; যদি দুই বছরে প্রথম অংশটি পাস করা হয় তবে চতুর্থ বছরে ট্রাইপসের দ্বিতীয় অংশটি পাস করলে তবে ঐ ডিগ্রি মিলতে পারে। তার জন্য দরখাস্ত করলে তিনি ঐ ডিগ্রি পেতে পারতেন, কিন্তু সেদিকে তাঁর মন ছিল না। ইংরেজীতে বি. এ. ডিগ্রির মূল্য যথেষ্ট কিন্তু তা কেবল শিক্ষাব্রতীদের বেলাতে।

সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে যখন পড়তেন তখন লণ্ডনে তিন ভাই মিলে কিছুকাল ছিলেন ড্রুইট সাহেবের মায়ের কাছে, কিন্তু অরবিন্দের মেজো ভাই মনোমোহনের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হওয়াতে তিনি তাদের ত্যাগ করলেন। বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন গোঁড়া খ্রীষ্টান, তিনি বললেন যে এই নাস্তিকের সঙ্গে বাস করলে বাড়িটা তাঁর মাথায় ভেঙে পড়বে। তখন বড়ভাই বিনয়ভূষণের সঙ্গে অরবিন্দ গিয়ে থাকলেন সাউথ কেন্‌সিংটন লিবার‍্যাল ক্লাবের একটা ঘরে। বাংলার ছোটোলাট স্যার হেনরি কটনের ভাই জে. এস্. কটন ছিলেন সেখানকার সেক্রেটারি, বিনয়ভূষণ তাঁর কাজের সহায়তা করতেন। মনোমোহন গিয়ে থাকলেন অন্য বাসায়। এই সময়ে এঁদের দারিদ্র্যের কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল সব চেয়ে বেশি। পরে অরবিন্দও স্বতন্ত্র বাসায় গিয়ে থাকলেন কেম্‌ব্রিজে না যাওয়া পর্যন্ত। লণ্ডনে থাকতে ঐ স্কুলে পড়ার জীবনে অরবিন্দকে যথেষ্টই দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়, কারণ তাঁর পিতা ঠিক সময়ে টাকাকড়ি পাঠাতেন না। সম্পূর্ণ একটা বছর ধরে তিনি সকালে উঠে

মাত্র দুই এক খণ্ড স্যাণ্ডউইচ ও রুটি মাখনের সঙ্গে চা খেয়ে তারপর একেবারে সন্ধ্যায় মাত্র পেনি মূল্যের ঝালযুক্ত সসেজ্ খেয়ে তাঁর দিন কেটেছে।

১৮৯০ সালে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু সিভিলিয়ান হবার দিকে তাঁর মন ছিল না, যদিও তাঁর পরিবারস্থ সকলে সেটাই চেয়েছিল। তাই কৌশলে ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে তিনি ওর থেকে রেহাই পেলেন।

মাত্র এগারো বছর বয়স থেকেই শ্রীঅরবিন্দের অন্তরে এই একটা দৃঢ় প্রত্যয় এসেছিল যে জগতে একটা ব্যাপক পরিবর্তন ও বৈপ্লবিক ওলটপালটের যুগ আসছে, এবং তাঁর নিজেকে তাতে একটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। তাঁর পিতার কাছ থেকে যে-সব চিঠি আসত তাতে ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হৃদয়হীন আচরণের অনেক তিক্ত সংবাদ থাকত। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের উপর যে-সকল অন্যায় অত্যাচার করতো তার কথা সেখানকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেই তিনি তার থেকে কাটিং কেটে ছেলের কাছে পাঠাতেন। এর ফলে এবং আরো নানা কারণে ভারতের পরাধীন অবস্থার হীনতা সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা বিরাগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু দেশকে যে সেই পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে তাঁর নিজেকেই নিয়োগ করতে হবে এ সংকল্প এসেছিল কয়েক বছর পরে। কেম্‌ব্রিজে থাকাকালে তিনি সেখানকার ভারতীয় মজলিসের একজন সভ্য ও পরে সেক্রেটারি হয়েছিলেন, সেই সময় তিনি সেখানে অনেক বিপ্লবসূচক বক্তৃতা দিতেন। পরে তাও তাঁর ভারতীয় সিভিলিয়ানের চাকরি না পাবার অন্যতম একটা কারণ। লণ্ডনে ফিরে এসে তিনি ও তাঁর ভাইরা সেখানকার ভারতীয়দের একত্রে জুটিয়ে ছোটো একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী স্থাপিত করেন। তাঁরা দাদাভাই নওরোজীর নেতৃত্বে নরমপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি ও বিদ্রোহ প্রকাশ করতেন। ইংলণ্ডে অবস্থানের শেষের দিকে লণ্ডনে এক গুপ্ত সভাতে ভারতীয়েরা "Lotus and Dagger" (কমল ও কৃপাণ) নামে এক গুপ্ত সমিতির স্থাপনা করে, তাতে প্রত্যেক সভ্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে দেশমুক্তির জন্য প্রত্যেকে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ ক'রে কাজ করবে। কিন্তু সে সমিতি তার পরেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, পুনরায় আর তারা কখনো মিলিত হয় নি; কিন্তু কেউ কেউ তাদের সে প্রতিজ্ঞা স্মরণ রেখেছিল, শ্রীঅরবিন্দ তার মধ্যে একজন।

শ্রীঅরবিন্দ যখন সিভিল সার্ভিসে অকৃতকার্যতা বরণ করলেন তখন বরোদা রাজ্যের গাইকোয়াড় ছিলেন লণ্ডনে। স্যার হেনরি কটনের ভাই তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াতে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা রাজ্যের চাকরি নিয়ে ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইংলণ্ড ত্যাগ ক'রে দেশে ফিরলেন।

*   *   *   *

২

বরোদায় অবস্থান—ভারতীয় জ্ঞানচর্চা

বরোদার চাকরিতে শ্রীঅরবিন্দ তেরো বছর নিযুক্ত থাকেন ১৮৯৩ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত। প্রথমে ছিলেন রাজস্ব বিভাগে, আর মহারাজার সেক্রেটারি রূপে। তারপরে বরোদা কলেজের প্রফেসর হয়ে ও শেষে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হয়ে। এই কয় বছর চলেছিল তাঁর আত্মোৎকর্ষের ও সাহিত্যচর্চার যুগ—কারণ পরবর্তীকালে পণ্ডিচেরি থেকে যে তাঁর লেখা কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তা ঐ সময়ে রচিত—আর সবিশেষ ভবিষ্যৎ কর্মের জন্যও তিনি ঐ সময় প্রস্তত হচ্ছিলেন। ইংলণ্ডে থাকার সময় পিতার কড়া নির্দেশে তাঁর কেবল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাই লাভ হয়েছিল। প্রাচ্যের ও ভারতের জ্ঞান ও ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনো সংস্রবই তাঁর ছিল না। এই বরোদায় অবস্থানকালে সেই ত্রুটি তিনি সংশোধন ক'রে নিলেন। তিনি শিখলেন সংস্কৃত এবং আরো কয়েকটি দেশীয় ভাষা, বিশেষত মারাঠী ও গুজরাটি, যেহেতু এগুলি ছিল বরোদা রাজ্যের সরকারী ভাষা। বাংলা ভাষা তিনি খুবই শীঘ্র অনেকটা নিজের থেকেই শিখে নিলেন (দীনেন্দ্রকুমার রায় কিছুকাল সঙ্গে থেকে এতে সাহায্য করেছিলেন এবং বাংলা কথা বলা অভ্যাস করিয়েছিলেন)। শেষের দিকে নীরব ধরণের রাজনৈতিক কাজগুলি করবার সুবিধার জন্য অনেক সময় ছুটিতেই থাকতেন, কারণ রাজ্যের কাজে নিযুক্ত থেকে সেরূপ কিছু করা নিষিদ্ধ ছিল। ১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে যখন প্রবল আন্দোলন শুরু হয় তখন সেই সুযোগে তিনি বরোদার চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে প্রকাশ্যভাবে এই আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৬ সালে তিনি বরোদা ত্যাগ ক'রে কলকাতায় আসেন ও নবপ্রতিষ্ঠিত ন্যাশন্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করেন।

৩

বাংলায় অবস্থান—নবীন ভারত

[এখানে জেনে রাখা দরকার যে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের প্রথম দিকের চৌদ্দ বছর কাল ইংলণ্ডে কেটেছে পাশ্চাত্ত্য জগতের বিদ্যা ও জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে এবং সেখানকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগধর্মের ভিতরের কথা জানতে, এবং তার পরের তেরো বছর বরোদায় কেটেছে তাঁর বিরাট স্বদেশসেবার জন্য পুরোপুরি ভাবে প্রস্তুত হতে এবং ভারতের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের মূলে গিয়ে পৌঁছে তার ভবিষ্যৎ ইতিহাসের মর্ম উপলব্ধি করতে। অতঃপর যখন তিনি বাংলায় এসে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন তখন অন্যান্য গতানুগতিক রাজনৈতিকদের মতো কথা বলতে ও লিখতে থাকার পরিবর্তে তিনি যা বলতে শুরু করলেন তা একজন দেশপ্রেমিক কবি ও দেশাত্মবোধের অনন্য-সাধারণ দিব্যদ্রষ্টার মতো। ভারত আত্মাকে তিনি দেখলেন চিরন্তন জননীরূপে, যে মাতা কেবল ভারতের মানুষকেই জাগিয়ে তুলতে চান না, যিনি চান সমগ্র জগতের মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করতে। তাঁর দেশপ্রেমও ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, তাঁর জাতীয়তাবাদও ছিল না নির্দিষ্ট একটি জাতির মধ্যে সীমায়িত। তিনি তাঁর এই মাকে ডাক দিয়ে আহ্বান করে বললেন যে তিনি তাঁর সমগ্র জগতের সকল সন্তানকেই আলোর দিকে নিয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে অমরত্ব লাভের মতো দৃষ্টিশক্তি দান করুন। এই কথাই তিনি মনেও ভেবেছেন আর এর জন্যই সংগ্রামও করেছেন। জগতের মধ্যে ও মানবজাতির মধ্যে যেন ভগবানের প্রকাশ হয়। এটা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় যে ১৯০৬-৭-৮ সালের বাংলার আন্দোলনের অগ্নিযুগে তিনি যে ধরণের কথাগুলি তখন বলতেন, বহুকালের পরবর্তী পণ্ডিচেরির যোগজীবনের চূড়ান্ত অবস্থায় যখন তিনি দিব্যজ্যোতিকে বা বিজ্ঞানশক্তিকে বা অতিমানসকে পার্থিব জগতে নামিয়ে এনে নব জগতের অভ্যুদয় ও মানবের মধ্যে নবজাতির সৃষ্টি করবার প্রয়াসে নিযুক্ত, তখনও তিনি ঠিক ঐ একই ধরণের কথা বলেছেন। স্বদেশী যুগের গরমপন্থী দেশপ্রেমিকের কণ্ঠে যে জ্বলন্ত বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, তার মধ্যে তখনই পাওয়া গিয়েছিল পরবর্তী যুগের দিব্যজীবনের অগ্রদূতের সুনিশ্চিত নির্ঘোষের সুস্পষ্ট আভাষ। ভারতের পুনরভ্যুত্থান ও সেই সঙ্গে তার সক্রিয়

আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে সমগ্র মানবজাতির রূপান্তর ও সারা পৃথিবীর বুকে ভগবৎ অভিব্যক্তি—বরাবরই এই আকাঙ্খার কথাই তিনি মানবজাতির মধ্যে প্রচার ক'রে এসেছেন তারই পূর্বপ্রস্তুতির জন্য দরকার ছিল ভারতের অধীনতা মোচন ও রাজনৈতিক মুক্তি। আমরা এর পর দেখতেই পাবো যে জননেতা হবার প্রথম থেকেই তিনি তাঁর এই মূলসূত্র ধরেই বরাবর এই কথা বলে গেছেন—ভারত জাগছে তার নিজের জন্য নয়, কিন্তু ভগবানের জন্য, সমগ্র মানবের ভিতরকার পরমাত্মার জন্য।]

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক তৎপরতার তিনটি দিক ছিল। প্রথম যা নিয়ে তিনি শুরু করেন তা হলো এক বিপ্লবী দল গঠন, যার মূল উদ্দেশ্য হবে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হওয়া। দ্বিতীয়ত, সমগ্র জাতির জনগণের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের মনোভাব ও ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলা, যা তখনকার দিনে অধিকাংশ লোকের মধ্যে অসম্ভব কথা ও পাগলের প্রলাপ বলেই একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল। তখন সবাই জানতো যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সর্বশক্তিমান, ভারত তার কাছে নিতান্তই দুর্বল, শক্তিহীন ও অস্ত্রহীন, সুতরাং ওরূপ কোনো ইচ্ছা কল্পনার মধ্যেই আনা যায় না। তৃতীয়ত জনগণকে এমন ভাবে জাগিয়ে তোলা যাতে তাদের সমবেত অসহযোগ ও শান্তিপূর্ণ বিরুদ্ধতার দ্বারা বিদেশীদের এখানে থেকে রাজত্ব করা অচল হয়ে ওঠে।

"বন্দে মাতরম্" পত্রিকাতে তিনি অসহযোগ সম্পর্কে এই কথাই লিখেছিলেন :—

আমাদের সর্বদাই এটা মনে রাখা উচিত যে বিদেশীদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব নির্ভর করছে নিতান্ত অসহায়ভাবে আমাদেরই সায় দেওয়া সহযোগিতার উপর। কিন্তু এই সহযোগিতা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তা'হলেই ওদের অবাধ প্রভুত্ব ভেঙে একেবারে খসে পড়ে যাবে তাসের ঘরের মতো। এ-যুক্তি নতুন নয়, খুবই পুরানো, কিন্তু ভারত কেবল সম্প্রতিই এর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করেছে। রাজ্যশাসকদের পক্ষে এই স্থানীয় সাহায্য ও সহযোগের প্রয়োজন এত অধিক বলেই হয়তো ভারতের পক্ষে বিনা রক্তপাতে মুক্তিলাভ করা খুব সম্ভব হবে। প্রত্যেক ভারতীয় যদি তার আপন জন্মভূমিতে বিদেশীর এরূপ যথেচ্ছ শাসনে অসহিষ্ণু হয়ে তা মানতে অস্বীকার করে, তা'হলে ওদের অবাধ প্রভুত্ব একদিনেই ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। যিনি দেশের মুক্তির আদর্শ প্রচার করতে চান তিনি আগে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে

উত্তমরূপে পরীক্ষা করে দেখুন, তবেই এর ব্যর্থতার কথা বলতে পারবেন। যাঁরা লিখতে পারেন ও বলতে পারেন তাঁরা দেশের লোকের কাছে নিত্য নিত্য এ সম্ভাবনার কথা স্পষ্টভাবে শোনাতে থাকুন।

তখনকার দিনে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যের যুদ্ধপ্রণালী এখনকার মতো সর্ববিধ্বংসী এবং অমোঘ ছিলনা। তখনও রাইফেলই ছিল লড়াইএর প্রধান অস্ত্র, বিমানশক্তির তখনও আবিষ্কার হয়নি, আর কামানের ধ্বংসশক্তিও পরবর্তীকালের মতো খুব বেশি প্রবল ছিল না। ভারতবাসীদের যদিও নিরস্ত্র করা হয়েছিল, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন যে বাইরের থেকে সাহায্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করলে সে অভাব মিটে যেতে পারে, আর ভারতের মতো একটা এত বড়ো দেশে, যেখানে খাঁটী ব্রিটিশ সৈন্যবল রয়েছে মুষ্টিমেয়, সেখানে সাধারণ লোকের মধ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি ক'রে কেবল গেরিলা যুদ্ধের দ্বারাই যথেষ্ট কাজ হতে পারে। তা ছাড়া ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আর ব্রিটিশ জাতের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক মতিগতির ধারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেও তিনি যা দেখেছেন তাতে এই বুঝেছেন যে ভারতের লোকেরা আত্মমুক্তি লাভের কোনো চেষ্টা করতে গেলে তারা যদিও তাতে বাধা দেবে আর ধীরে ধীরে শাসন-রীতির মধ্যে এমন সংস্কার আনবে যাতে মূল শাসনযন্ত্র তাদের হাতছাড়া না হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বজ্রকামড় দিয়ে তারা মরিয়া হবার মতো নয়; যদি দেখে যে বিরোধ ও বিদ্রোহ নিতান্ত অদম্য হয়ে উঠেছে তখন আপোষ নিষ্পত্তির দ্বারা সাম্রাজ্য রক্ষা করতে চেষ্টা করবে এবং স্বেচ্ছায় স্বাধীনতাও দেবে, যাতে এখান থেকে তাদের বাধ্য হয়ে একেবারে বিতাড়িত হতে না হয়।

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সম্বন্ধে একদল লোকের ধারণা এই যে তিনি ছিলেন পুরোপুরি শান্তিবাদী ও সন্ত্রাসবাদের বিরোধী, কারণ প্রাণঘাতী রকমের রাজদ্রোহিতা হিন্দুধর্মের আদর্শমতে নিষিদ্ধ। এমন কথাও বলা হয়েছে যে তিনি ছিলেন অহিংসা নীতির প্রথম প্রবর্তক। কিন্তু এ-কথা ভুল, শ্রীঅরবিন্দ নিষ্ক্রিয় নীতিবাদীও নন বা দুর্বল শান্তিবাদীও নন।

রাজনৈতিক আন্দোলনকে তখনকার দিনের জাতীয় মনোভাবের অবস্থায় নিষ্ক্রিয় বিরোধিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন ছিল বলেই তা করা হয়েছিল, অহিংসাবাদ বা শান্তিবাদের আদর্শ হিসাবে নয়। শান্তি যদিও সর্বোচ্চ আদর্শের অন্তর্গত, কিন্তু তা হলো আধ্যাত্মিক শান্তি মনস্তত্ত্বের

ভিত্তিতে ; মানব প্রকৃতির পরিবর্তন ব্যতীত তা সঠিকভাবে আসতে পারে না। যদি অহিংসা নীতির বা অন্য কিছুর ভিত্তিতে তার জন্য প্রচেষ্টা করা হয় তাহলে তা ব্যর্থ হবে এবং তার ফল আরো খারাপ হবে। আন্তর্জাতিক আপোষ ও আন্তর্জাতিক শক্তির সাহায্যে যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টা করার তিনি সপক্ষে, যা এখন "নব রীতিতে" প্রয়াস করা হচ্ছে ; সেটা অহিংসা হলো না, তা হলো ন্যায়ের শক্তিতে অন্যায়ের শক্তিকে দমন করা, এবং তাও স্থায়ী হতে পারে কিনা সন্দেহ। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই ধরণের শান্তি স্থাপিত করা হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে মাঝে মাঝে অন্তর্বিদ্রোহ, রাজনৈতিক গণ্ডগোল ও দমননীতি নিবৃত্ত হয়নি, কখনো বা রক্তপাতও ঘটেছে। সর্বজাগতিক শান্তি স্থাপনার মধ্যে তেমন ব্যাপারও ঘটতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্যভাবেই বলেছেন যে প্রয়োজন হলে এবং অন্য কোনো উপায় না থাকলে কোনো জাতি স্বাধীন হবার জন্য সন্ত্রাসের সাহায্যও নিতে পারে ; তা কোনো নৈতিক বিচারের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে কোনটা তার পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপায় তারই উপর। এ বিষয়ে তিনি তিলক ও অন্যান্য গরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে একমত ছিলেন, কেউই তাঁরা সেরূপ শান্তিবাদী বা অহিংসাবাদী ছিলেন না।

ভারতে এসে কয়েক বছর পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক তৎপরতা হতে নিবৃত্ত থেকে (কেবল 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকাতে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা ছাড়া) দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন যাতে একটা পাকা রকমের উপায় নির্ধারণ করতে পারেন। অতঃপর তিনি প্রথমে যতীন ব্যানার্জি নামক একজন বরোদা রাজ্যের সৈনিক যুবককে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে বাংলা দেশে পাঠালেন সেখানকার লোকদের যথোচিত ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তোলার ব্যবস্থাদি বলে দিয়ে, এবং তাঁর ধারণা ছিল যে এই প্রচেষ্টার ফল পেতে মোট প্রায় ত্রিশ বছর সময় লাগবে। বস্তুত অধীনতা মুক্তির আন্দোলন তখন থেকে শুরু ক'রে তার সম্পূর্ণ সাফল্য ঘটতে সময় লেগেছিল ৫০ বছর।

মতলব ছিল এই যে, গোপনেই হোক বা দৃশ্যতঃ কোনোরূপ নিরীহ ব্যাপারের ছদ্ম আকারেই হোক, সারা বাংলা জুড়ে বিপ্লবের প্রচার করা ও বিপ্লবী দল গঠন করা চাই। দেশের নবীন যুবকদের সংগ্রহ ক'রে এ কাজ করতে হবে, আর বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের মনোভাব উন্নত ধরণের ও যাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করা যায় তাদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিতে হবে ও

অন্যান্য বিষয়ে নানারূপ সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক শহরে এর এক একটি কেন্দ্র স্থাপিত হবে এবং অবশেষে প্রত্যেক গ্রামেও তাই হবে। সাংস্কৃতিক সামাজিক বা নৈতিক উদ্দেশ্য প্রকাশ্যভাবে সামনে রেখে যুবকদের দলগুলি গঠিত হবে এবং সকল দলকেই বিপ্লববাদে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা হবে। সেই সব যুবকদের এমন সব শিক্ষা দিতে হবে যাতে পরে তা যুদ্ধের কাজে লাগে, যেমন ঘোড়ায় চড়া, নানারূপ দৈহিক কসরৎ শেখা, কুচকাওয়াজ শেখা, সম্মিলিত ভাবে ক্রিয়া করতে শেখা। এই ভাবধারার নতুন বীজ বপন করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত উন্নতি ঘটতে দেখা গেল; দেশের যুবকদের মধ্যে আগের থেকেই যে-সব ছোটো-খাটো স্থায়ী রকমের জমায়েৎ ছিল অথচ বিপ্লবাত্মক ধরণের কোনো সুস্পষ্ট আদর্শ ছিল না, তারা এই দিকে ঝুঁকে পড়ল, আর যাদের মধ্যে এরূপ কিছু অস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল তারা এই সুনির্দিষ্ট সংগঠনের মধ্যে অনায়াসে যোগ দিলে; ক্রমে অল্প কয়েকটি সংঘ থেকে শুরু ক'রে দেখতে দেখতে তা অনেক হয়ে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে পশ্চিম ভারতে যে এক গুপ্ত-সমিতি ছিল তার সভ্য হয়ে শ্রীঅরবিন্দ সেখানকার শপথ গ্রহণ করলেন এবং বোম্বাইতে তাদের পরিষদে যোগ দিলেন। যদিও তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মধারা সেই পরিষদের নির্দেশের পথে চলেনি, কিন্তু বাংলাদেশে তাদের দলের কোনো সভ্য বা সমর্থক না থাকায় তিনি ভার নিলেন এখানে তাদের উদ্দেশ্যকে সাধারণ ভাবে প্রচারিত করতে। বাংলাতে পি. মিত্র প্রভৃতি যে-সকল বিপ্লববাদী নেতারা ছিলেন তাঁদের কাছে তিনি ঐ সমিতির লক্ষ্যগুলির কথা জানিয়ে দিলেন, এবং তাঁরাও ঐ সমিতির শপথ গ্রহণ ক'রে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশিত পথে কাজে অগ্রসর হতে স্বীকৃত হলেন। পি. মিত্র এখানে লাঠিখেলা শেখানোর আখড়া স্থাপনের অজুহাতে বিশেষ একটি দল গড়ে তুলতে থাকায় শীঘ্রই তা সর্বত্র জনপ্রিয় হয়ে উঠল বাঙালী যুবকদের মধ্যে, সরলা দেবীর অনুপ্রেরণায়; কিন্তু আরো অন্য ভাবে অন্যত্র নানা দল গজিয়ে উঠল। শ্রীঅরবিন্দ যা চেয়েছিলেন সমস্ত দল-গুলিকে একত্রে সংহত ক'রে দেশব্যাপী একটাই বিপ্লবধর্মী জিনিসকে দাঁড় করাতে, তা যদিও সম্ভব হয়নি, কিন্তু আন্দোলনের তাতে ক্ষতি হলো না, কারণ নানাভাবের নানা দলে বিভক্ত থেকেও সকলে মূল উদ্দেশ্যটাকেই প্রধান বলে ধরে নেওয়াতে এই বিপ্লবের মনোভাব ও প্রেরণা সক্রিয় হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এর পরে এলো বঙ্গ বিভাগ, তাতে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষের বহ্নি তীব্রভাবে জলে উঠল, এবং তারই ফলে জাতীয়তাবাদী চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হলো। এতে শ্রীঅরবিন্দের কর্মধারা ক্রমশ সেই দিকেই মোড় নিলে এবং তাঁর পূর্বেকার গুপ্ত ক্রিয়াগুলি অপেক্ষাকৃত ভাবে চাপা পড়ল। কিন্তু তিনি এই স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের ভাবটিকে সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করতে থাকলেন।

বারীন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তিনি প্রকাশ করলেন 'যুগান্তর' পত্রিকা, তাতে প্রকাশ্যভাবেই ব্রিটিশ শাসনকে অস্বীকার ক'রে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করা হতে থাকল এবং গেরিলা যুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখাও হতে লাগল। প্রথম কয়েকটি সংখ্যাতে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই গোড়াকার প্রবন্ধগুলি লিখলেন যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে; স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ছিলেন এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, কিন্তু পুলিসের তল্লাসীতে তিনি নিজেই সম্পাদক বলে পরিচয় দিয়ে শাসনদণ্ডে দণ্ডিত হলেন; অতঃপর শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে 'যুগান্তর' পত্রিকা এই নীতি গ্রহণ করলে যে ব্রিটিশ আদালতে তারা নিজের সপক্ষে কোনোরূপ বাদ-প্রতিবাদে অংশ গ্রহণই করবে না, যেহেতু বিদেশী গভর্ণমেণ্টকে তারা আদৌ স্বীকারই করে না। এতে এই পত্রিকার মর্যাদা ও প্রভাব অনেক বেশি বেড়ে গেল। বাংলার তিনজন ক্ষমতাশালী যুবক লেখক এই পত্রিকার পরিচালনায় নিযুক্ত হওয়াতে সারা দেশ জুড়ে এই কাগজের প্রভাব ও চাহিদা অত্যন্ত বেশি বেড়ে গেল। এখানে বলে রাখা দরকার যে পূর্বোক্ত গুপ্ত-সমিতির কর্মতালিকার মধ্যে সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান ছিল না, কিন্তু তার পরে অত্যধিক দমনের ফলে তার প্রতিক্রিয়ারূপে বাংলা দেশে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হলো।

শ্রীঅরবিন্দ দেশের জন্য তাঁর কাজ প্রথম শুরু করেছিলেন 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকাতে সাতটি প্রবন্ধ লিখে। এগুলি লেখা হয়েছিল তাঁর কেম্‌ব্রিজের বন্ধু দেশপাণ্ডের অনুরোধে, যিনি ছিলেন ঐ পত্রিকার সম্পাদক। সেই প্রবন্ধগুলির শিরোনামা ছিল "পুরানোর স্থানে নূতন আলো" ("New Lamps for Old"), যাতে থাকত নির্ভয় আত্মপ্রচেষ্টার জন্য দেশের নেতাদের সক্রিয় হতে বলা, যা তখনকার কংগ্রেস নীতির একেবারেই বিরোধী। তারা এই স্পষ্টোক্তিতে খুবই চটে গেল, এবং একজন নরমপন্থী নেতা সম্পাদককে শাসিয়ে দেওয়াতে এই প্রবন্ধের ধারাবাহিক ভাবধারার

উক্তি থামিয়ে দেওয়া হলো, এবং তার পরিবর্তে সাধারণভাবে কংগ্রেসের সম্বন্ধে এই বলা হলো যে কেবল উচ্চ ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জনসাধারণকেও যেন তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতঃপর শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্য সকল রকমের ক্রিয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়ে কেবল গুপ্ত ধরণের কাজে নিযুক্ত রইলেন ১৯০৫ সাল পর্যন্ত, কিন্তু তিলকের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং বিপ্লবীদলের নেতা হবার উপযুক্ত জেনে আমেদাবাদ কংগ্রেসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ; তিলক তাঁকে প্যাণ্ডেলের বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে একঘণ্টা যাবৎ তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ ক'রে কংগ্রেসের রিফর্মিষ্ট দলের নিন্দা ক'রে মহারাষ্ট্রে তাঁর নিজের কর্মপদ্ধতির কথা বিশদভাবে জানিয়ে দিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিপ্লবী কর্মধারার মধ্যে একটা জিনিসকে খুব প্রাধান্য দিয়েছিলেন যা পরে জাতীয়তাবাদীদের সাধারণ ক্রিয়ার একটা বিশেষ অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেন্দ্রীয় যুবকদের দ্বারা তিনি স্বদেশী গ্রহণের মনোভাব প্রচার করতে শুরু করেন, যা তখন খুব অল্প কয়েকজনই খেয়াল হিসাবে নিতো। এঁদের দলের মধ্যে সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে একজন তেজস্বী মহারাষ্ট্রীয় ছিলেন যিনি খুব ভালো বাংলা লিখতে পারতেন (বাংলাদেশে তাঁর পরিবার-বর্গ বহুকাল বাস করাতে), তিনি বাংলাতে শিবাজীর এক জীবনী পুস্তিকা লেখেন, তাতেই 'স্বরাজ' কথাটির প্রথম উল্লেখ করেন। পরে জাতীয়তাবাদীর দল স্বাধীনতা অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করতে থাকে—চারটি লক্ষ্যের মধ্যে স্বরাজ ছিল তাদের একটি লক্ষ্য। ইনি পরে "দেশের কথা" নামে একটি পুস্তক রচনা করেন, তাতে বিশদভাবে দেখিয়ে দেন যে শিল্প-বাণিজ্যের দিক দিয়ে ব্রিটিশরা ভারতকে কি ভাবে বঞ্চিত করছে। বাংলাদেশে এতে তুমুল সাড়া পড়ে যায়, বাঙালী যুবকদের মন উদ্দীপিত হয়ে উঠে, স্বদেশী আন্দোলনকে তারা জাগিয়ে তোলার কাজে লেগে যায়। শ্রীঅরবিন্দ নিজেও বরাবর এই কথাই বলতেন যে বিপ্লবের অঙ্গ হিসাবে বিদেশীর উপর নির্ভরতা ছেড়ে দিয়ে ভারতের নিজস্ব শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে উন্নত করে তোলা চাই।

বরোদার চাকরিতে অবস্থান কালে শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ দিতে পারতেন না। তদ্ভিন্ন তিনি নিজেকে আড়ালে রেখে এবং নিজের নাম গোপন রেখে পিছন থেকে কাজ ক'রে যাওয়াই পছন্দ করতেন। কিন্তু "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার সম্পাদক রূপে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট

তাঁকে দণ্ডিত করার ফলেই তাঁর কথা সাধারণের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল। এরপর থেকেই তিনি জাতীয়তাবাদী দলের মূল নেতা রূপে অধিষ্ঠিত হয়ে বাংলার কর্মীদের কর্মনীতি প্রভৃতির পরিচালনা করতে থাকলেন।

দেশের কাজগুলি কোন ধারা অনুযায়ী অগ্রসর করিয়ে নিয়ে যেতে হবে তা শ্রীঅরবিন্দ মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন; তা ছিল অনেকটা আয়র্লণ্ডের সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলনের অনুরূপ; কিন্তু সেটা তিনি আয়র্লণ্ডের অনুকরণে স্থির করেননি, যেমন অনেকে মনে করে; কারণ আইরিশ আন্দোলন যে কেমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা তিনি পণ্ডিচেরিতে যাবার আগে পর্যন্ত জানতেন না। তা ছাড়া একটি বিষয়ে আয়র্লণ্ডের সঙ্গে ভারতের এক মস্ত প্রভেদ ছিল যাতে শ্রীঅরবিন্দের কাজ ছিল আরো দুরূহ; আয়র্লণ্ডের পূর্ব ইতিহাসে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে বরাবরই একটা বিদ্রোহ চলে আসছিল যাতে স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে তাদের একটা স্থায়ী মনোভাব আগের থেকে তৈরি ছিল; ভারতের বেলা তেমন প্রস্তুতি কিছুই ছিল না।

শ্রীঅরবিন্দকে ভারতের সাধারণ জনগণের মনে স্বাধীনতা পাবার ইচ্ছাটি বিশেষরূপে জাগিয়ে তুলতে হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে একটি বিশিষ্ট দলকে ও পরে সমগ্র জাতিকে এমন সনির্বন্ধ রাজনৈতিক তৎপরতায় নিয়োগ করবারও চেষ্টা করতে হয়েছিল যাতে পরিণামে সম্পূর্ণ অধীনতা-মুক্তির লক্ষ্যে গিয়ে পৌছনো যায়। তাঁর মতলব ছিল যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে দখলের মধ্যে এনে যাতে তা বিদেশী সরকারের কাছে খোসামুদির কাঁদুনি গাওয়া এবং কেবল বক্তৃতা করা ও প্রস্তাব পেশ করার পরিবর্তে প্রকৃত বিপ্লবধর্মী তৎপরতার কেন্দ্র স্বরূপ হয়ে ওঠে। আর এই কংগ্রেসকে আয়ত্তাধীন করা যদি সম্ভবপর না হয় তা'হলে এমন এক বিপ্লববাদী কেন্দ্রের সৃষ্টি করা যার দ্বারা আসল কাজগুলি আরম্ভ করা যেতে পারে। তা হবে এই রাজ্যের মধ্যেই একটা আলাদা রাজ্য গড়ে তোলার মতো, যা তার তরফ থেকে দেশের জনগণকে সঠিক নির্দেশ দিতে থাকবে, আর এমন সব সুগঠিত প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাবে যারা হবে প্রকৃত কর্মীর দল। এরা তখন উত্তরোত্তর অসহযোগ ও নীরব বিরোধিতার দ্বারা বিদেশী সরকারের রাজ্যশাসনকে ক্রমশ অসম্ভব ক'রে তুলবে, আর এমন এক সর্বব্যাপী অশান্তির আন্দোলন জাগিয়ে তুলবে যাতে ওদের দমননীতি পঙ্গু হয়ে যায়, এবং প্রয়োজন হলে দেশব্যাপী প্রকাশ্য বিদ্রোহও শুরু হয়ে যায়। তাঁর এই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল ব্রিটিশ ব্যবসায়কে

বয়কট্ করা, সরকারী স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ ক'রে জাতীয় স্কুল-কলেজের স্থাপনা করা, সালিশী বিচারালয়ের সৃষ্টি করা যাতে লোকে মামলা নিষ্পত্তির জন্য সরকারী আদালতে না গিয়ে সেখানেই যায়, অনেক স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তোলা যারা হবে প্রকাশ্য বিদ্রোহের সেনাদল, এবং আরো থাকবে অনেক রকম সক্রিয়তা।

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্য ভাবে খুব কম সময়ের জন্যই নেতৃত্ব করেছিলেন কারণ ১৯১০ সালেই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তিনি পণ্ডিচেরি চলে গেলেন। তাঁর অবর্তমানে তাঁর পরিকল্পিত কর্মধারাও লোপ পেল। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনীতির চেহারাই বদ্‌লে গেছে আর ভারতবাসীদের মনোভাবও বদ্‌লে গেছে, তাদের তখন লক্ষ্য হয়েছে স্বাধীনতা অর্জন করা অসহযোগ ও নিরস্ত্র প্রতিরোধ নীতির দ্বারা, এবং মাঝে মাঝে বিদ্রোহ বহ্নি জ্বালিয়ে বিজয় লাভ নিকটতর ক'রে আনা। পরবর্তী কালের ঘটনাবলী অনেকটা শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পনারই অনুসরণ করেছিল। জাতীয়তাবাদী দলই কংগ্রেস দখল ক'রে পূর্ণ স্বাধীনতাই তাদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলে, সেই অনুযায়ী নিজেদের গঠিত করলে, কতকগুলি মুসলমান ও অনুন্নত জাতির ব্যক্তিরা ছাড়া সকলেই তাদের এই কংগ্রেসের নেতৃত্ব স্বীকার করলে, তার পরে প্রথম জাতীয় গভর্ণমেণ্টের সৃষ্টি ক'রে শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের কাছ থেকে দেশের স্বাধীনতা আদায় ক'রে নিলে।

গোড়ার দিকে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়েছিলেন অন্তরাল থেকে, কারণ বরোদার চাকরি ছেড়ে দেবার কথা তখন ছিল না; কিন্তু বিনা বেতনে তিনি লম্বা ছুটি নিলেন, যার ফলে গুপ্তভাবে তাঁর বিপ্লব সূচক কাজগুলি করা ছাড়াও তিনি বরিশাল সম্মিলনে যোগ দিলেন, যা পুলিস জোর ক'রে ভেঙে দিলে, এবং বিপিন পালের সঙ্গে মিলে সারা পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করলেন ও কংগ্রেসের অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেন। এই সময়েই তিনি বিপিন পালের সঙ্গে মিলে "বন্দেমাতরম্" পত্রিকা প্রকাশ করলেন, বাংলায় নব রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি করলেন, এবং কলিকাতা কংগ্রেসে যোগদান করলেন, যাতে তাঁর চরমপন্থী দল সংখ্যায় কম হলেও তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসকে তাদের কর্মধারার কতকগুলি প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করলে।

বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সেই সুযোগে ঐ কলেজের

প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ ক'রে তিনি বরোদার চাকরি ছেড়ে দিলেন। রাজা সুবোধ মল্লিক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের গুপ্ত-ক্রিয়ার সহকারী ও পরে কংগ্রেসের রাজনীতিতেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন, কলকাতায় অবস্থানকালে যাঁর বাড়িতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ থাকতেন। ইনি ঐ কলেজের স্থাপনার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করলেন এবং এই প্রস্তাব করলেন যে শ্রীঅরবিন্দকে একটি প্রফেসরের পদ দিতে হবে ১৫০৲ টাকা বেতনে; অতএব তিনি এখন মুক্ত ভাবে দেশ সেবার কাজে সব সময়েই নিযুক্ত হতে পারলেন।

বিপিন পাল এ-যাবৎ কাল তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকাতে আত্মনির্ভরতা ও অসহযোগের নীতিই প্রচার ক'রে আসছিলেন, কিন্তু এখন তিনি "বন্দে মাতরম্" নাম দিয়ে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো, কারণ তাঁর পুঁজি ছিল মাত্র ৫০০৲ টাকা, আর ভবিষ্যতে তাঁর কোথাও আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। তিনি তখন শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে এই কাজে যোগ দিতে, আর শ্রীঅরবিন্দ যখন দেখলেন যে তাঁর বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টার দেশব্যাপী প্রচারের পক্ষে এই হলো এক উপযুক্ত উপায় তখন এতে তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন। কংগ্রেসের অগ্রগামী যুবকদের নিয়ে তিনি এক সভা আহ্বান করলেন এবং তাদের নিয়ে এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলেন, যারা মহারাষ্ট্রের অনুরূপ দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিলকের নেতৃত্ব মেনে কাজ করবে, এবং কলিকাতা কংগ্রেসে নরমপন্থী দলের সঙ্গে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সেই সংগ্রামে যোগ দেবে। আর এই "বন্দে মাতরম্" পত্রিকাকেও তাদের দলীয় পত্রিকা রূপে পরিণত করতে ও অর্থ সাহায্য দিতে বন্দে মাতরম্ কোম্পানি নামে একটি সংস্থা তৈরি হলো শ্রীঅরবিন্দের পরিচালনায়, আর বিপিন পালকে পাঠান হলো বিভিন্ন জেলাতে পরিভ্রমণ ক'রে এই নতুন দলের নীতি ও কর্মপদ্ধতি প্রচার করার জন্য। এতে খুব শীঘ্রই সাফল্য দেখা দিল, আর "বন্দে মাতরম্" পত্রিকা ভারতের সর্বত্র গৃহীত হতে থাকল। ঐ কাগজের লেখকদের মধ্যে কেবল শ্রীঅরবিন্দ এবং বিপিন পালই ছিলেন না, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও বিজয় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সুদক্ষ ব্যক্তিরাও ছিলেন। শ্যামসুন্দর ও বিজয় ছিলেন ইংরেজী লেখাতে ধুরন্ধর, ওঁদের নিজস্ব একটা অপূর্ব লেখনভঙ্গী ছিল; শ্যামসুন্দর অনেকটা শ্রীঅরবিন্দের ধারাতেই এমন

প্রবন্ধগুলি লিখতেন যে অনেকে তা শ্রীঅরবিন্দের লেখা বলেই ধরে নিত। কিন্তু কিছুকাল পরে বিপিন পালের সঙ্গে অন্য সকলের মতের গরমিল হতে লাগল, বিশেষত গুপ্ত বিপ্লবের কার্যপ্রণালীকে বিপিন পাল সমর্থন করতেন না। এর ফলে বিপিন পাল এই কাগজেব সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চয়ই তা হতে দিতেন না, কারণ তিনিই ছিলেন "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার প্রধান সহায় স্বরূপ, যদিও তিনি কর্মী ও নেতা হিসাবে তেমন দক্ষ ছিলেন না, কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এবং প্রবন্ধ লেখক ও জনপ্রিয় বাগ্মী-রূপে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তখন দারুণ জ্বরভোগের পরে শরীর সারাবার জন্য অন্যত্র গিয়েছিলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে এই কাণ্ড ঘটে গেল। এমন কি "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁর নামটিও ঘোষিত হয়ে গেল। কিন্তু তা মাত্র একদিনের জন্য। তৎক্ষণাৎ তিনি তা বন্ধ ক'রে দিলেন, কাবণ তখনও তিনি বরোদার চাকরি ছাড়েন নি, আর নিজের নাম সাধারণের মধ্যে ঐভাবে প্রকাশ হতে দিতেও চান না। কিন্তু ঐ সময় থেকেই তিনি "বন্দে মাতরম্" পত্রিকাটিকে এবং বাংলার নবগঠিত দলকে নিজেই পরিচালিত করতে থাকলেন।

বিপিন পাল নবগঠিত দলের লক্ষ্য যে ব্রিটিশ শাসনের বাইরে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করা এই কথাই প্রচার করতেন; কিন্তু নরমপন্থীদের মত অনুসারে এর অর্থ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনও হতে পারে, সেই হিসাবে কলিকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই নওরোজী চরমপন্থীদের 'স্বরাজ' শব্দটিকে গ্রহণ ক'রে ঐ অর্থেই ব্যবহার করলেন। তখন শ্রীঅরবিন্দের প্রথম কাজ হলো তার বদলে ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য যে অবিমিশ্র পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা এই কথাই মুক্তভাবে প্রচার করা এবং তাঁর পত্রিকাতে পুনঃপুনঃ এই লক্ষ্যের উপরেই জোর দিতে থাকা; ভারতের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি নির্ভয়ে এ কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতে থাকলেন এবং তৎক্ষণাৎ তার ফলও হতে দেখা গেল। দলের সকলেই বলতে থাকল স্বরাজ মানে দাসত্বমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সর্বত্রই তা প্রচার হয়ে গেল; এর অনেক পরে করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন যখন বসেছিল জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বে, তখন পূর্ণ স্বাধীনতাই যে কংগ্রেসের কাম্য এই কথাই ঘোষিত হয়েছিল।

দেশের পক্ষে জাতীয়তাবাদী দলের কার্যক্রম কি কি হবে তা এই পত্রিকাতে যথারীতি ঘোষিত হতে থাকল—অসহযোগ, নিরস্ত্র প্রতিরোধ,

স্বদেশী গ্রহণ, বিদেশী বর্জন, জাতীয় শিক্ষাবিধি, আদালতে না গিয়ে নিজেদের মধ্যে আপোষে মামলার নিষ্পত্তি, এবং শ্রীঅরবিন্দের আরো অন্যান্য পরিকল্পনা। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পত্রিকাতে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধে, বিপ্লববাদের তত্ত্বাদি সম্বন্ধে, এবং নরমপন্থীদের যে ব্রিটিশ ন্যায়বিচারের প্রতি অন্ধবিশ্বাস, বিদেশী গভর্ণমেণ্ট ভারতের কত উপকার করেছে, তাদের আইন আদালত কত ন্যায়পরায়ণ এবং তাদের স্কুল-কলেজগুলি যে কত ভাল শিক্ষা দিচ্ছে—তাদের এই সকল যুক্তির বুলিকে খণ্ডবিখণ্ড ক'রে তিনি সুস্পষ্ট ও তেজস্বী ভাষায় দেখিয়ে দিতে থাকলেন যে ওদের প্রভাবের চাপে দেশের লোক কত বেকার ও হীনবীর্য হয়ে পড়েছে, তাদের উন্নতি অবরুদ্ধ হয়ে গেছে, দেশের লোকের দারিদ্র্য এসে গেছে, অর্থের জন্য তাদের দাসত্ব করতে হচ্ছে, দেশীয় শিল্পক্রিয়া সব থেমে গেছে; তিনি আরো জোর দিয়ে এই কথা বলতে থাকলেন যে বিদেশীর শাসন যদি আপাতত উন্নতিকারক ও উপকারীও হয়, তথাপি মুক্ত ও স্বাধীন রকমের জাতীয় জীবনের সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে না। এই সকল প্রচারের ফলে চরমপন্থীদের মতবাদ সর্বত্রই স্বীকৃত হলো, বিশেষত পাঞ্জাবে যেখানে নরমপন্থীদেরই প্রাধান্য ছিল।

সাংবাদিক ইতিহাসের দিক থেকে "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার স্থান এখানে অতুলনীয়। কারণ এই পত্রিকাই প্রথমে দেশের লোকের মনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ক'রে তুলেছিল। কিন্তু এর দৌর্বল্য ছিল অর্থের দিক দিয়ে, কারণ চরমপন্থীর দলের সকলেই গরিব। যতদিন শ্রীঅরবিন্দ এর পরিচালনা করছিলেন ততদিন তিনি কোনো গতিকে কাজ চালিয়ে সাধারণের সহানুভূতি আকৃষ্ট করছিলেন, কিন্তু ইচ্ছামত কাগজটিকে বাড়াতে পারছিলেন না। তারপর যখন তিনি বন্দী হয়ে এক বৎসর যাবৎ জেলে রইলেন, তখন "বন্দে মাতরম্" কাগজের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল; অবশেষে এই স্থির করা হলো যে কাগজটিকে অর্থাভাবে মরতে দেওয়ার পরিবর্তে তার গৌরবময় মৃত্যু ঘটুক, বিজয় চট্টোপাধ্যায় এমন এক প্রবল রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধ লিখুন যাতে বৃটিশ সরকার জোর ক'রে কাগজটিকে বন্ধ ক'রে দেয়। শ্রীঅরবিন্দ হেতেই "বন্দে মাতরম্" পত্রিকাতে যে সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন তা এমন শ্যামসুন্দরের সঙ্গে লেখা হতো যাতে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে অপূর্ব লেখনভঙ্গিত্ব না লোপ পায়; "স্টেট্‌সম্যান" পত্রিকার সম্পাদক তখন

এই মন্তব্যই করেছিল যে কাগজটির ছত্রে ছত্রে সুস্পষ্ট রাজদ্রোহের ইঙ্গিত ফুটে বেরুচ্ছে, কিন্তু এমন কৌশল সহকারে তা লেখা যে ওর বিরুদ্ধে কোনো আইনগত অভিযোগ করা যায় না। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের অনুপস্থিতিতে তেমন কাজই করা হলো, যার ফলে "বন্দে মাতরম্" কাগজের পরমায়ু শেষ হলো।

এই "বন্দে মাতরম্" পত্রিকাতে শ্রীঅরবিন্দের যে সকল প্রবন্ধ ও ভাষণগুলি প্রকাশিত হতো, তার নিম্নলিখিত কিছু কিছু উদ্ধৃতি হতে মোটামুটি ভাবে বোঝা যাবে যে তাঁর রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদ কোন সূত্র ধরে ও কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রকাশ পেতো :—

"আমরা স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করতে চাই এই কারণে যে প্রথমত জাতীয় জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার দাসত্বমুক্তি দরকার ; দ্বিতীয়ত, জাতির উন্নতির পক্ষে তার মুক্তি অপরিহার্য ; তৃতীয়ত, এর পরে মানবজাতির যে মহা উন্নতির যুগ আসছে তা কোনো পার্থিব সমৃদ্ধির ব্যাপার নয়, তা হলো আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক উন্নতির ব্যাপার, যার পথপ্রদর্শক হবে মুক্ত এশিয়া ও তার মধ্যে বিশেষত মুক্তভারত, এবং জগতের সেরূপ মঙ্গলের জন্যই আমাদের মুক্তিপ্রয়াস এত জরুরী। ভারতকে বাঁচতে হলে এবং ভালো ভাবে সুখে বেঁচে থাকতে হলে তার পক্ষে স্বরাজ নিশ্চয়ই চাই ; জগতের জন্যই তাকে বাঁচতে হবে, দাসরূপে নয়—কিন্তু স্বাধীন দেশ রূপে, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য।

* * * *

হে ভারতবাসীগণ, ভারতের আধ্যাত্মিকতা, ভারতের সাধনা, তার তপস্যা, জ্ঞান, শক্তি, এর দ্বারাই আমরা মুক্ত ও মহৎ হতে পারি।

* * * *

মুক্ত ও সম্মিলিত ভারতের ভাবমূর্তি তার পূর্ণ মহিমাতে জন্মগ্রহণ করেছে ঋষিদের পুণ্যভূমিতে, এবং তা এখনই পূর্ণ আকৃতি পেয়েছে, জগতের বিশেষ প্রয়োজনে যে আসন্ন মহা সভ্যতার অধ্যাত্ম তেজ সঞ্চিত হচ্ছে, তা ওরই পশ্চাতে তলে তলে জমে উঠছে।"

* * * *

আধ্যাত্মিকতা ও জাতীয়তা

"...ভারতে যে বহু দীর্ঘকালের জন্য কঠোর শিক্ষা গ্রহণের নিদারুণ পালা চলে আসছিল, তার মেয়াদ এখন শেষ হয়ে আসছে। পূর্ব গগণে এবার দেখা যাচ্ছে এক বিরাট রকমের উষার আলোর উদ্গম, যে আলোর প্রথম পূর্বাভাস এখনই দিগন্তের কোলে উদ্ভাসিত; নতুন একটা দিন এবার আসন্ন, সে দিন হবে এমনই গৌরবান্বিত যে জগতের শেষ অবতারের এখানে প্রত্যক্ষ আবির্ভাবও তার যথেষ্ট প্রমাণ নয়, যদিও তিনি না এলে এটা হতে পারত না। হিন্দু আধ্যাত্মিকতার যে তখন পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল, তাতেই ছিল প্রাচ্যের আসন্ন পুনরভ্যুত্থানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। জগতের মানবজাতি এতকাল যাবৎ বহু রকমের চিন্তাধারা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে দেখেছে, কত রকমের নীতিবাদ গড়েছে, স্থূল পার্থিব কত উপায় অবলম্বন ক'রে জগতে পূর্ণতার অবস্থা এনে ফেলার কতই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে, কত ত্রুটিশূন্য মানবতা স্থাপনের ও সহস্র বৎসরের রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠার অসম্ভব নানারূপ আশা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকৃত জীবন রহস্যের সঠিক কিনারা করতে কোনোটাই কৃতকার্য হয়নি। সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনো পরিকল্পনাই মানব জীবনকে দুঃখ দুর্গতি, দারিদ্র্য ও কলহ, অস্বস্তি ও অসন্তোষ থেকে নিষ্কৃতি দিতে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারেনি; কারণ স্থূল উপায়ের দ্বারা কোনো কিছু ফল হবে না, যে কেউ সেদিক দিয়ে চেষ্টা করতে যাবে সেই তাতে বিফল হবে। কেবল প্রাচ্যই জানে সত্যের কিছু সন্ধান, প্রাচ্যই সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে পাশ্চাত্ত্যকে, এই প্রাচ্যই পারে মানবজাতিকে ধ্বংস হতে রক্ষা করতে। বহু যুগ থেকে এশিয়া খোঁজ ক'রে আসছে ভিতরকার আসল আলোটিকে, যখনই যেখানে তার কিছু আভাস পাবার সৌভাগ্য হয়েছে, তখনই সেখানে গড়ে উঠেছে এক এক বিরাট ধর্মপন্থা,—বৌদ্ধধর্ম, কনফুসিয়ান ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, মুসলমান ধর্ম, এবং এগুলির অন্তর্গত অসংখ্য সম্প্রদায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনাক্রিয়ার ও আত্মার অনুসন্ধানের চরম কর্মশালা ও পরীক্ষাগার হলো এই ভারতভূমি, যেখানে প্রতি যুগে যুগে শত সহস্র মহান আত্মা জন্মগ্রহণ ক'রে নীরবে কাজ ক'রে গেছেন তাঁদের অন্তরলোকে, এবং পূর্ণজ্ঞান লাভ ক'রে তাঁদের কয়েকজন শিষ্যকে তার উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন, যাতে পরবর্তীগণ এসে তা আরো সম্পূর্ণতর ক'রে তোলে। তাঁরা দেশের সকলকে

দীক্ষিত করবার জন্য বা নিজেদেরকে প্রচারিত করবার জন্য কোনো ইচ্ছা বা চেষ্টাই করেন নি, কেবল নিজেদের কাজের ও অভিজ্ঞতার অংশটুকু জ্ঞান ভাণ্ডারে যোগ করে দিয়ে যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই ফিরে গেছেন। এই যে আত্মদমন, যার ফলে আধ্যাত্মিক শক্তি বিপুলভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠত, তার প্রভাবেই এখানে অবতারগণ জন্মগ্রহণ করতেন। তাঁরা ভগবৎ সত্তায় এমন পরিপূর্ণ হয়ে আসতেন যে ঋষিদের মতো নীরব আনন্দে নিমগ্ন থাকাই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট হতোনা, তাঁরা সে আনন্দের ধারা মুক্তভাবে ঢেলে জগতের মধ্যে প্রবাহিত ক'রে দিতেন। কাউকে দীক্ষিত ক'রে নেবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, নিজেদের উপলব্ধির আনন্দবার্তা তাঁরা জগতের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন যাতে পূর্বতপস্যাহেতু বা আগ্রহের বিশুদ্ধতা হেতু উপযুক্ত জনেরা সকলেই সে বার্তা গ্রহণ করতে পারে। সেই সব অবতারগণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ অন্যান্য জনেরা যেখানে ভগবানের সীমাবদ্ধ একটা দিকেরই মাত্র সন্ধান পেয়েছিলেন, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানকে দেখেছিলেন সীমাছাড়া সর্ববিধ দিক দিয়ে, অনন্তরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ একত্বের মধ্যে। পূর্বকালের লক্ষ লক্ষ সাধুসন্তদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি একত্রীভূত হয়ে তাঁর মধ্যে নতুন ক'রে প্রকাশ পেয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এসে জগতের কাছে ভারতের হিন্দুত্বের চরম মর্মকথা শুনিয়ে দিলেন। তাঁর জন্ম হতে জগতে সেই নবযুগের সূচনা হলো, যে যুগে পৃথিবীর মানুষরা ভগবানের সান্নিধ্যের আভাস পাবে এবং মানবের জীবনে আধ্যাত্মিকতাই সর্বপ্রধান বস্তু হয়ে উঠবে। খ্রীষ্টধর্ম যা করতে গিয়ে বিফল হয়েছিল, মুসলমানধর্ম যা করতে চেয়েছিল অনুপযুক্ত কালে, বৌদ্ধধর্ম যাতে কিছুকালের জন্য অর্ধ-সাফল্য মাত্র লাভ করেছিল কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিদের মধ্যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এই সর্বসমন্বয়ী হিন্দুত্ব এবার সারা জগতের মধ্যে সেই কাজকে সফল ক'রে তুলতে প্রয়াসী হবে। ভারতের পুনরভ্যুত্থানের এই হলো প্রকৃত কারণ, সেই কারণেই ভগবান আবার এখানে নতুন ক'রে প্রাণসঞ্চার করেছেন, সেই কারণেই মহান আত্মারা এ দেশের মুক্তি আনতে সচেষ্ট হয়েছেন, সেই কারণেই ভারত সন্তানদের হৃদয়ে হঠাৎ এক নব পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাচ্ছে। যে ক্রিয়ার প্রথম সূত্রপাত হয়েছে এক রাজনৈতিক আন্দোলনরূপে, তাই শেষে আধ্যাত্মিক সাফল্য নিয়ে সম্পূর্ণ হবে।"

নূতন আদর্শ

"…ভারত যে অঘটন ঘটাতে পারে, অপরিহার্য দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে, পৃথিবীর মাটিতে ভগবানকে নামিয়ে আনতে পারে, এ কথায় সে আলৌকিকভাবে আপন পুণ্য তেজে বিশ্বাসী। ভারতের অন্তরে যেমন প্রবল ইচ্ছাশক্তি লুকিয়ে আছে তেমন জগতের অন্য কোনো জাতির মধ্যেই নেই। সেই বিশ্বাসকে, সেই ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে দরকার কেবল এক আদর্শ, যার জোরে সে সকল রকমের প্রয়াসই করতে পারে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এখন সেই আদর্শকে প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছেন তাঁর প্রত্যেকটি বক্তৃতার মধ্যে। এমন সুন্দর ভাবযুক্ত ও ঐকান্তিকতাপূর্ণ উত্তপ্ত বাণী আর ইতিপূর্বে কখনই উচ্চারিত হয়নি, যেমন হয়েছিল গত রবিবারে উত্তরপাড়াতে, যখন তিনি উত্তরপাড়ার লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে এক জনসভাতে ভাষণ দিচ্ছিলেন। সে আদর্শ হলো ভারতের প্রাচীন সনাতন ধর্মের আদর্শ যে, ভগবানের মধ্যেই মানবতা আর মানবতার মধ্যেই ভগবান বিরাজ করেন। কিন্তু এরূপ আদর্শ ইতিপূর্বে কোনো রাজনৈতিক সমস্যা ও জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে কখনই প্রযুক্ত হয়নি। এই আদর্শের উপলব্ধি করা ও জগৎকে তা বিতরণ করা, এই হলো ভারতের উদ্দিষ্ট কর্ম। ভারত এমন এক ধর্মের উদ্ভাবনা করেছে যা মানুষের হৃদয় মস্তিষ্ক ও ব্যবহারিক বুদ্ধির সকল অভীপ্সাকে সার্থক করতে পারে, কিন্তু আধুনিক রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে তার প্রয়োগ এখনও পর্যন্ত ঘটেনি। সেই কাজটাই তাকে এবার করতে হবে, তবেই সে মানবজাতির সহায়ক হতে পারবে; এই কাজ করবার জন্যই তার পক্ষে প্রয়োজন আপন পূর্ণমুক্তি লাভ করা, মানুষের জগৎকে বাঁচাবার জন্য আগে তার নিজেকে বাঁচাবার এই মহা প্রেরণাই এনে দেবে তার মধ্যে তার নিজস্ব তেজ ও শক্তি ও জ্বলন্ত আগ্রহ, যার ফলে সে তার নিয়তিকে নিশ্চিতরূপে সফল ক'রে তুলবে। কয়েক বছরের মধ্যে যে দুর্দান্ত পরীক্ষার সম্মুখীন তাকে হতে হবে, অন্য কোনোরূপ ছোটোখাটো আদর্শই তাকে ওর ভিতর দিয়ে অতিক্রম করাতে সক্ষম হবেনা। বিপ্লবের সংঘর্ষকালে যে সকল নীতিভ্রষ্টতা এসে পড়ে, অতিরাগের উদ্রেক, চূড়ান্ত স্বার্থপরতা, মারাত্মক ঘৃণা, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা, স্খলন, মানুষের মধ্যে যে বাঘ লুকিয়ে থাকে তার নির্লজ্জ প্রকাশ, এই সকল বিড়ম্বনা হতে অন্য কোনো অবিশুদ্ধ আশাই তাকে রক্ষা করতে পারবেনা।"

আমাদের কাজের নতুন শর্ত

"গত তিন বছরে আমরা যা কিছু করেছি তার অধিকাংশই ছিল প্রস্তুতির কাজ। জাতির মনকে তৈরি ক'রে তোলাই ছিল প্রথম প্রয়োজন। পুরাণো রাজনৈতিক দলেরা তাদের ভ্রান্ত পন্থায় দেশের লোককে প্ররোচিত ক'রে সেইরূপ ধরণের চেষ্টা দ্বারা যথেষ্টই প্রমাণ দেখিয়ে দিয়েছে যে সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ। এই ভুল প্রচেষ্টার পথে জাতিকে জাগিয়ে তুলে কিছুকাল যাবৎ জাতির মনে আবার এক নতুন ভুল ধারণা এসে গেছে যে অন্যান্য জাতির ইতিহাসে যেমন বলেছে যে সমুচিত সাফল্য আনতে জীবন উৎসর্গ করতে হয়, এখানে তা না করেই একটা বড়ো রকমের রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। সংগ্রামের সমূহ বিপদকে এড়িয়ে চলার মতো একটা সাধারণ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। যত কম ত্যাগস্বীকার ক'রে একাজ সমাধা হতে পারে তাই যেন সকলের ইচ্ছা, যত সস্তা মূল্যে স্বাধীনতার অমূল্য সম্পদটি কিনতে পারা যায়। প্রকৃত সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্বন্ধে এই দ্বিধাসংকোচ, এরও প্রয়োজন ছিল আন্দোলনের বর্তমান অবস্থায়, কারণ এজাতি শত বৎসরের পরনির্ভরতা ও উদাসীনতার ফলে হীনবীর্য হয়ে চরিত্রতেজ হারিয়েছে, তাই হঠাৎ একেবারে প্রকৃত সংগ্রামের জন্য জীবনপণ করার উপযোগী অবস্থাতে এরা ছিলনা। কিন্তু এখন যে নতুন অবস্থা দেখা দিয়েছে তাতে ঐ সব দ্বিধাকে এবার দূর করতে হবে। কোনো জাতির পক্ষেই ভাগ্যবিধাতার সঙ্গে দর কষাকষি ক'রে যত সস্তায় সম্ভব স্বাধীনতা কিনে নেবার চেষ্টা করতে যাওয়া চলেনা। এখন যত শীঘ্র সম্ভব উন্নয়নশক্তি ও অপরের দমনশক্তির মধ্যে সংগ্রাম শুরু ক'রে দিয়ে ভারতের ভাগ্য ফিরিয়ে আনা যায় ততই তা ভারতের পক্ষে ও সারা জগতের পক্ষে মঙ্গলজনক। যত বিলম্ব করা যাবে ততই আমাদের শক্তিক্ষয় হবে এবং শত্রুকে সুযোগ দেওয়া হবে। এখন এমন এক দল মানুষ চাই যারা দেশের জন্য সব কিছু ছাড়তে প্রস্তুত, যাদের একমাত্র চিন্তা ও কাজ হবে যখন যেমন সময় ও সুযোগ হবে তাই বুঝে যে-কোনো উপায়ে আন্দোলনকে বাড়িয়ে তোলা। এমন একটি দলকে যদি একত্রিত করা যায় তবেই কেবল প্রস্তুতির কাজের পরিবর্তে আসল কাজের কাজ সম্ভব হতে পারে; দেশেব মুক্তি আনা কেবল আমাদের অবসর মুহূর্তের উদ্বৃত্ত শক্তিটুকু দিয়ে বা আপন জীবনের স্বার্থকে বজায় রেখে বাকী যেটুকু পড়ে থাকে সেইটুকুর দ্বারা সাধ্য হতে পারেনা।

এমন অনুরক্ত ও উৎসর্গীকৃত ভারত-সেবকের দল চাই যারা কোনো পুরস্কার চায়না, কোনো আরাম বিরাম চায়না, কোনো বাহুল্য চায়না, কেবল মাথার উপর আচ্ছাদন রেখে প্রাণরক্ষার মতো আহার্য পেলেই দেশের সেবার কাজে যারা লেগে থাকতে পারে। সাফল্য লাভের প্রথম শর্তই হলো এমনি সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের মনোভাব গ্রহণ করা। দেশের প্রকৃত সেবক যে হবে তার নিষ্ঠার বিশেষ লক্ষণ হবে কঠোর সন্ন্যাস গ্রহণ, অকুণ্ঠ ও নির্মম ত্যাগ, জ্বলন্ত অনির্বাণ মুমুক্ষুত্ব। পাণ্ডিত্য লাভ, তর্কশক্তিকে শান দেওয়া, সমস্যাদি নিয়ে সমাধান করতে বসা, বাড়িতে বসে আরাম করা ও বাইরে আপন পছন্দমত ধীরেসুস্থে কাজ করা, এসব এখনকার যুগের পক্ষে এ দেশের জন্য নয়। এখন এক অভাবনীয় রকমের বিরাট বিপ্লবের দিন এসে গেছে। তাদের অস্ত্রগুলিও হবে তেমনি বিপুল আস্পৃহাপূর্ণ, তাদের আত্মবলিদানও হবে তেমনি হিসাব বহির্ভূত। দিতে হবে এমন জ্বলন্ত যজ্ঞাহুতি যার তুলনায় আগেকার সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞও হয়ে যাবে ছায়ার মতো নিষ্প্রভ, আর সে যজ্ঞের হোতা হবো ও আহুতি হবো আমরা নিজেরাই। আমাদের জীবন, আমাদের আশাভরসা, আমাদের সকল উচ্চাকাঙ্খা, যা কিছু ভগবানের জিনিস নয় কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জিনিস, যা-কিছুকে আমরা দেশের সেবাতে না লাগিয়ে আমাদের নিজেদের স্বার্থে লাগাই, সমস্তকেই সেই যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হবে।

যজ্ঞের যিনি দেবতা তিনি চান আমাদের ভিতরকার শ্রেষ্ঠ জনদের বলি, তবেই তিনি খুশী হবেন। যে কেউ নিজের সম্বন্ধে ভীত হবে, নিজের সম্পত্তি হারাবার ভয় করবে, নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের হারাবার ভয় করবে, নিজের গৌরব, স্বার্থ, সুনাম, সুখ স্বাধীনতা হারাবার ভয় করবে, তাদের পক্ষে এর থেকে সরে দাঁড়ানোই উচিত, কারণ যে কোনো মুহূর্তে বলির মঞ্চে সব কিছু সমর্পণের জন্য ডাক এসে পড়তে পারে। তখন যদি সে তাতে অস্বীকৃত হয়, তাহলে নিরাপদে থাকার জন্য যারা পলাতক তাদের চেয়েও তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে, কারণ আজ্ঞার অমান্যকারীর মতো নিষ্ফলে সকল কষ্ট ভোগ ক'রে নিতান্ত অগৌরবে তার মারাত্মক পতন ঘটবে।

এখনই সময় ঘনীভূত হয়ে আসছে, মহা অন্ধকার প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের ভাঙন, সুরাটে যার সূচনা হয়ে এলাহাবাদে সমাপ্তি ঘটল, এই হলো আসন্ন মহা ঝড়ের তাণ্ডবলীলার পূর্ব সূচনা। সুরাটের ঐতিহাসিক সংঘর্ষের মধ্যে যে চূড়ান্ত বিদ্রোহের সূত্র ছিল তার সম্বন্ধে উপস্থিত ব্যক্তিরা কেউই

কিছু জানতে পারেনি। কেবল ভবিষ্যৎই বিস্ময়ের সঙ্গে জানবে তার ফলাফলের কথা, যখন দেখবে যে এককালে যে জগৎকম্পনকারী ভূমিকম্প ঘটেছিল, ঐ নির্দিষ্ট দিনটিতে শান্ত ভূমির উপর সামান্য একটু কম্পনের চিহ্ন দেখা দেবার সময় হ'তেই তার সূত্রপাত। যে শক্তি ঐ সামান্য কম্পনটুকু পৃথিবীর গর্ভ হতে উপরে পাঠিয়ে অল্প একটু নাড়া দিয়েছে, তা এখনও বর্তমান রাজনৈতিকদের নজরের বাইরে, কিংবা কেউ কেউ হয়তো তার অস্পষ্ট আভাস মাত্রই পেয়েছে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তার স্পষ্ট জানাজানি হয়ে যাবে। তখন যারা ভেবেছিল যে প্রাণহীন মানুষগুলিকে নিয়ে তারা চাতুর্যের সঙ্গে পুতুল নাচের খেলা খেলছে, তারা অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে। যে নিগূঢ় শক্তি তলে তলে কাজ করছিল তা তখন পুরানো রাজনৈতিক ইমারতের ভিৎ পর্যন্ত ফাটিয়ে চুরমার ক'রে দিয়ে বাইরে মুক্ত ভাবে বেরিয়ে পড়বে। পুরাণো কংগ্রেসকে দুই দলে ভাগ ক'রে নিয়ে যে তাকে একটা নতুন দলীয় গঠন দেবার চেষ্টা চলছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে, কারণ ভিতরকার প্রাণশক্তি কিছু না থাকায় গোটা নরমপন্থী সম্প্রদায়টাই নস্যাৎ হয়ে যাবে, আর নতুন জাতীয়তাবাদীদের যে কংগ্রেস গড়ে উঠবে তার শ্রেষ্ঠ নিয়তি যাই থাক, অভাবনীয় শক্তিতে সহজ হয়ে হয়তো তা বিপ্লবেরই খেলা খেলতে শুরু করবে। পুরাণো কংগ্রেসের অপসরণের দ্বারাই ঘোষিত হচ্ছে যে এই জিনিসের প্রস্তুতির কাল পূর্ণ হয়েছে, এর পর বিপরীত শক্তির প্রথম সংঘর্ষে একটা বিপর্যয়ের অবস্থা এসে পড়বে। সুশৃঙ্খলে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার যে আশাতে নব আন্দোলন উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল, তা চিরদিনের জন্য লোপ পেয়ে গেছে। নগ্ন বিপ্লবই এখন তার যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করছে, সুশৃঙ্খল ভাবে বৃহৎ অবলুপ্তির পরে বৃহৎ এক নব-সৃষ্টির জন্য যে তোড়জোড় হচ্ছিল তা সকলই ওর দ্বারা বিদলিত হয়ে যাচ্ছে। এরূপ না হয়ে অন্যরূপই হয়তো আমরা চাইতাম, কিন্তু ভগবানের যা ইচ্ছা তাইতো হবে।”

(“বন্দে মাতরম্” পত্রিকা)

এশিয়ার ভূমিকা

“…ইউরোপের মানুষরা পার্থিব জীবনের চূড়ান্ত বিকাশ ও বিস্তার ঘটিয়েছে, পার্থিব অস্তিত্বের বিজ্ঞানকে পরিণতির পূর্ণতায় এনে ফেলেছে, কিন্তু তারা

এমন সব রোগে ভুগতে শুরু করেছে যা তাদের বিজ্ঞান আরোগ্য করতে অক্ষম। ইংলণ্ডের ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রাখর্য, ফ্রান্সের সুবিচারী স্বচ্ছ মস্তিষ্ক, জার্মনির উদ্ভাবনী প্রতিভা, রাশিয়ার ভাবপ্রবল প্রাণশক্তি, আমেরিকার বাণিজ্যিক তৎপরতা মানুষের যতখানি উন্নতি ঘটানো সম্ভব তা ঘটিয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকেই আপন আপন নির্দিষ্ট শক্তির সীমায় এসে থেমে গেছে। এখন এমন কিছুর অভাব রয়ে গেছে যা ইউরোপ পূরণ করতে পারেনা। বর্তমানের এই অবস্থাতেই এশিয়া উঠেছে এবার জেগে, কারণ সারা জগতের এবার তাকেই প্রয়োজন হয়েছে। জগতের মানসিক শান্তির প্রবর্তক হলো এশিয়া, ইউরোপ থেকে যে ব্যাধিগুলি জন্মায় তার চিকিৎসক এই এশিয়া। যুগযুগান্ত হতে এশিয়াকে তার আত্মনিমগ্নতা ও স্বয়ম্ভুত্ব হতে জাগিয়ে তুলে কিছুকালের জন্য তাকে জগৎ নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়ে আসছে, যাতে জগতের মানুষ তার পদপ্রান্তে বসে সেই সব গুহ্যশিক্ষা লাভ করতে পারে যা কেবল এশিয়ারই অধিগত। ইউরোপের অস্থির আত্মা যখন পার্থিব জীবনের বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির পথে আরো নব নব আবিষ্কার যোগ ক'রে চলেছে, যখন সে রাজনীতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছে, সমাজের ভিত্তি নূতন ক'রে গড়েছে, আইনের নব গঠন করেছে, বিজ্ঞানের পুনরাবিষ্কার ঘটিয়েছে,—এশিয়ার শান্ত সমাহিত ও সংযত আত্মা তখন ইউরোপের এই সকল আবিষ্কারের ভিতর থেকে আপন সহজাত প্রজ্ঞার দ্বারা ও আধ্যাত্মিক আলোকের দ্বারা তার যা কিছু অতিবাহুল্য ও বক্রতাকে বার বার সংশোধন ক'রে দিয়েছে, কারণ সেই কেবল জগতের উপর তেমন সঙ্গতির আলোকপাত করতে পারে।

…বাইরের অন্যান্য দেশের মানুষরা যা কিছু অবদান এর কাছে আনে, এশিয়া সেগুলিকে উপাদান স্বরূপ করে নিয়ে আপন প্রগাঢ় সৃষ্টিশক্তির কাজে লাগায়। ইংলণ্ডকে সেই ভারই দেওয়া হয়েছিল ঐ সকল উপাদান ভারতের কাছে পৌছে দেবার, কিন্তু সে আপন পার্থিব সাফল্যের মদগর্বে এখানে শিক্ষাগুরু হয়ে এসেছে ভেবে ভারতের মানুষকে কতকটা ধরে নিলে অর্বাচীন শিশুর মতো, আর কতকটা ধরে নিলে কুলি ক্রীতদাসের মতো, যাদের ঘাড়ে ধরে শিখিয়ে নিতে হবে কেমন ক'রে প্রভুদের সেবা করতে হয়। কিন্তু সেই প্রহসনের পালা এবার ফুরোলো। ভারতে ইংলণ্ডের যা দেবার কাজ ছিল তার মেয়াদ এবার ফুরিয়েছে, যতদিন পর্যন্ত তার এখানে থাকার কথা ছিল তার বেশি আর থাকা চলবেনা একথা তার এখন বোঝবার সময় এসেছে।

ভগবানের যখন ইচ্ছা হয়েছিল যে ভারতকে সে অধিকার করবে, তখন জগতের লোক আশ্চর্য হয়ে দেখলে যে ভোজবাজির মতো কত সহজে ভারত জয় করা হয়ে গেল, এই দেখে সকলে ইংরেজ জাতির প্রতিভা ও গুণাবলীর কত বাহবা দিলে, আর সেই দম্ভের উপরেই ওরা শতাব্দী কালের উপর এখানে পরম সুখে রাজত্ব করলে।

…ইংলণ্ডের উদ্দিষ্ট কর্ম এখন সমাপ্ত, ভগবানের প্রেরিত যে দূত এতকাল তার পাশে দাঁড়িয়ে হাতের আড়াল দিয়ে তাকে সকল বিপদ এবং বৈরিতার আক্রমণ থেকে রক্ষা করছিল, সে আর তা করবেনা। ভারতের নিয়তির জন্য যতদিন প্রয়োজন ততদিন পর্যন্ত সে থাকবে, তারপর আর একদিনের জন্যও থাকবেনা। কারণ সে তার নিজের জোরে এতদিন পর্যন্ত থাকেনি, আর এর পরে নিজের জোরেও টিঁকে থাকতে পারবেনা। ভারতের পুনরভ্যুত্থানের কাজ শুরু হয়ে গেছে, এখন ইচ্ছাতে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাকে এবিষয়ে সাহায্য করতে হবে, কিংবা বিরুদ্ধতা করতে গেলেও তাতে আর কোনো ফল হবেনা।" ("বন্দেমাতরম্" পত্রিকা)

বর্তমান পরিস্থিতি

"…বাংলার এই যে জাতীয়তার আন্দোলন এ কোনো স্বার্থঘটিত ব্যাপার নয়; এর হৃদয়ের ভিতরকার কথা তাই নয়। কতক লোকের যাই কেন মনে হোক, ভিতরের দিক থেকে দেখলে আমরা কোনো রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য একাজে নামিনি, এ একটা ধর্মকে আমরা অনুসরণ করছি। এ এমন এক ধর্ম যার দ্বারা আমরা আমাদের জাতির মধ্যে, আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে সর্বনিয়ন্তা ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাইছি। আমরা চাইছি আমাদের ত্রিশকোটি ভারতবাসীর মধ্যে তাঁকে পেতে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সচেতনে আর কেউ কেউ বা অচেতনে যে কাজ করছি তা আদৌ নিজেদের স্বার্থে নয়, বস্তুত অন্যদের জন্যই আমরা কাজ করতে ও মরতে চাই। বাংলার তরুণ কর্মীকে জেলে যেতে হয়, নিদারুণ কষ্ট সইতে হয়, সে তাতে কোনো ভয় পায়না, তাতে তার কোনো ব্যথাই লাগেনা। আনন্দের সঙ্গে সে বিপদের দিকে অবলীলাক্রমে এগিয়ে যায়। সে বলে, 'আমার উৎসর্গের সময় এবার এসে গেছে, ভগবানের যজ্ঞবেদিতে এই যে আমার আত্মবলি দেবার সময় এসে

পড়ল, আমার দেশের লোকদের জন্য কষ্টবরণ করতে এই যে আমি নির্বাচিত হয়েছি, এর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এইতো আমার জীবনের সব চেয়ে আনন্দের, পরমতম সাফল্যের সময়।' এই হলো আমাদের বিশিষ্ট ধর্মের দ্বিতীয় দিক, আমাদের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র সত্তার ভাবটিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া, ত্রিশকোটি মানুষের মধ্যে যেখানে ভগবান বাস করছেন সেখানে সবের মধ্যে আপন উচ্চতর শাশ্বত সত্তাকে অনুভব করা।

...বাংলা থেকেই আসছে জাতীয়তাবাদের এই সব আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। যে বাংলাকে ভারতে সকল প্রদেশের মধ্যে দুর্বল ও হীনবীর্য বলে হেয় জ্ঞান করা হতো, সেই বাংলা এই তিন বছরের মধ্যে এতখানি বদ্‌লে গেল, তার একমাত্র কারণ এই যে এখানকার যাদের বলা হলো ভগবানকে নিজেদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে তারা তাইই করলে, আর সেই শক্তির মধ্যে অবস্থান করে তারই জোরে সব কিছু অনায়াসে সহ্য করতে পারলে ও সেই শক্তিকে প্রকাশ করতে পারলে। এর জন্যই সমগ্র বাঙালী সম্প্রদায় এমনই বদ্‌লে গেছে যে অবাক হয়ে বলতে হয়, 'বাংলাতে এখন এ কী কাণ্ড হচ্ছে?' এখানে এমন আন্দোলন চলেছে যাকে কোনো বাধাই থামাতে পারছেনা, এমন উন্নতি চলেছে যাকে কোনো শক্তিই প্রতিরোধ করতে পারছেনা, জাতির মধ্যে এখানেই অবতার জন্মাতে দেখা যাচ্ছে—আর তোমরাও যদি ভগবানকে নিজেব মধ্যে গ্রহণ করে অন্তরে তাঁর শক্তি অনুভব করো, তাহলে দেখবে যে এবার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ভারতের বাকী সকল অংশকে এমনি বদলে দেবেন, কারণ তাঁর শক্তি বেরিয়ে পড়েছে নিজেকে ব্যক্ত করতে, এবং একবার যখন তা ব্যক্ত হয়েছে তখন উত্তরোত্তর খুব তাড়াতাড়ি সে তার কাজ ক'রে যাবে। পূর্ণ ভগবৎ শক্তিতে সে এমন কাজ করবে যা দেখে সমগ্র জগৎ তাঁকে স্বীকার করবে,—শ্রীকৃষ্ণ যিনি গোকুলে লুকিয়ে থাকেন, তিনি এখন জগতের সকল নিঃস্ব ও পতিত জনদের মধ্যে আর বৃন্দাবনের সকল রাখালদের মধ্যে এসে নেমেছেন, যার ফলে তাঁর জয় ঘোষিত হবে এবং সমগ্র জাতি ও এই মহাদেশের সমগ্র মানুষ উঠবে জেগে। তারা সেই সর্বশক্তিমানের দিব্য শক্তির প্রেরণাতে এমন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে যে পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাদের থামাতে পারবেনা, কোনো বাধাবিপত্তিই তাদের অগ্রগতিকে রোধ করতে পারবেনা। কারণ স্বয়ং ভগবান রয়েছেন পিছনে, আর এ হলো তাঁরই কাজ, আমাদেব দিয়ে তিনি কিছু করাতে চান। এই প্রাচীন মহাজাতির জন্য তাঁর কিছু

করবার আছে। সেই জন্যই তিনি আবার এখানে জন্ম নিয়েছেন, সেই জন্যই তিনি তোমাদের মধ্যে এমন ভাবে প্রকাশ পেয়েছেন যাতে তোমরা অন্য জাতিদের মতো হয়ে না পড়ো, এমন না হয় যাতে তোমরা জেগে উঠে গায়ের জোর বাড়িয়ে দুর্বল জাতিদের এইরূপ ক'রে পায়ের তলায় দাবাতে থাকো, কারণ তোমাদের ভিতর থেকে এমন কিছু জিনিস বেরিয়ে আসবে যার দ্বারা সারা জগৎ রক্ষা পাবে। সে জিনিসের কথা জানতেন প্রাচীন ঋষিরা এবং তা তাঁরা ব্যক্তও করেছিলেন, সেই জিনিসকেই আজ আবার জানতে ও পুনর্ব্যক্ত করতে হবে, সমগ্র জগতের কাছে তা জানিয়ে দিতে হবে, যাতে তিনি জগতের মধ্যে স্বপ্রকাশ হতে পারেন। প্রথমে তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে তোমাদের নিজেদের মধ্যে, তোমাদের জীবনকে সেই ভাবে গড়ে তুলতে হবে, আর এই মহাজাতির জীবনকে সেই ভাবে গড়ে তুলবে যাতে তিনি উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়ে প্রকাশ হতে পারেন। তবেই তোমাদের কর্তব্য সম্পূর্ণ হবে। তোমরা বুঝবে যে আজ তোমরা যে কাজে নেমেছ তা রাজনৈতিক বিদ্রোহ নয় বা শুধু রাজনৈতিক একটা পরিবর্তনের চেষ্টা নয়, তোমরা আদিষ্ট হয়েছ ভগবানের কাজ করবার জন্য।"

ন্যাশন্যাল কলেজের ছাত্রদের প্রতি

"…এখন আমি তোমাদের একমাত্র এই উপদেশই দেবো—তোমরা নিজেদের কাজ ক'রে যাও, যে ব্রত নিয়ে এই কলেজ সৃষ্ট হয়েছিল সেই ব্রত পালন ক'রে যাও। নিঃসন্দেহে এখন সবাই তোমরা জানো কী সেই ব্রত। আমরা যখন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে, জীবনের সমস্ত সুযোগ পরিত্যাগ ক'রে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য জীবন উৎসর্গ করি, তখন এই আশা নিয়ে তা করেছিলাম যে এখানে এক নবজাতির, এক নতুন ভারতের ভিত্তিকেন্দ্র স্থাপিত হবে, সে এখনকার এই দুঃখ দুর্ভোগের রাত্রি কাটিয়ে এবার এক গৌরব ও মহিমার দিবালোকে গিয়ে পৌঁছবে, সেদিন এই ভারত সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারবে। এখানে আমরা তোমাদের শুধু একটু বিদ্যা শেখাতে আসিনি, শুধু কোনো জীবিকা অর্জনের পথ খুলে দিতেও নয়, আমরা চেয়েছি তোমাদেব মাতৃভূমির উপযুক্ত সন্তান ক'রে গড়ে তুলতে, যাতে তোমরা তাঁর সেবাতে সকল কষ্ট অনায়াসে বরণ ক'রে নাও। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা

এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করি, আব আমি চাই যে ভবিষ্যতে তোমবা সেই সেবাব কাজেই আত্মনিয়োগ করো। আমবা যে কাজ অসম্পূর্ণ ভাবে শুরু করেছিলাম, তোমবাই এবাব তাকে সম্পূর্ণ ও সুপবিণত করে তোলো। আমি যখন ফিবে আসব তখন যেন দেখি যে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই সম্পদে প্রকৃত সম্পদবান হয়েছ, যে সম্পদ নিজেকে ধনী কবেনা কিন্তু মাতৃভূমিকে সমৃদ্ধ করে। আমি দেখতে চাই যে কেউ কেউ তোমরা প্রকৃতই বড়ো হয়ে উঠেছ, সে বড়ো হওয়া আপন আত্মসম্ভ্রম ও আত্মগর্ব বাড়াবার জন্য নয়, কিন্তু দেশকে বড়ো করবাব জন্য, যাতে এই ভারত পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে নিজেব মাথা তুলে দাঁড়াতে পাবে, অতীত কালেও যেমন ছিল যখন সারা জগৎ আলো পাবাব জন্য এরই মুখের দিকে চেয়ে থাকত। আব যারা থাকবে দরিদ্র ও অজ্ঞাত হয়ে, আমি চাই যে তারাও যেন সেই দরিদ্র ও অজানিতেব অবস্থাকেই তাদের মাতৃভূমিব সেবায় নিবেদিত করে, জাতির ইতিহাসে এমন এক এক সময় আসে যখন ভগবান তার সামনে ধবে দেন একমাত্র কাজ ও একমাত্র লক্ষ্য, যার জন্য বাকী সব কিছুকেই বিসর্জন দিতে হয়, তা যতই উচ্চ ও যতই মহৎ হোক। আমাদের মাতৃভূমির জন্য সেই সময়ই এখন এসে পড়েছে, যখন তাঁব সেবায় নিযুক্ত হওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুই কাম্য নয়, সব কিছুকেই লাগাতে হবে ঐ একটি মাত্র লক্ষ্যেব দিকে। যদি লেখাপডা করতে চাও, তাও কববে তাঁরই জন্য, যদি দেহ মন ও আত্মার উন্নতি কবো তাও নিযুক্ত করবে তাঁরই সেবাতে। জীবিকা অর্জন করো, যাতে তাঁকে সেবা কববার জন্যই তুমি বাঁচতে পাবো। বিদেশে যদি শিক্ষা নিতে যাও, তাতেও যেন ফিবে এসে সেই লব্ধ জ্ঞানকে আপন দেশেব কাজে লাগাতে পাবো। কাজ কবো তাঁরই উন্নতির জন্য, দুঃখ ববণ কবো তাঁবই আনন্দের জন্য। ঐ একটি উপদেশেব মধ্যেই সব কিছু বলা হলো। আমার শেষ কথা এই যে আমার জন্য যদি তোমাদের কিছু সহানুভূতি জেগে থাকে, তা যেন একটা ব্যক্তিগত জিনিস না হয়, আমি যে কাজ করছি তারই জন্য যেন তা অনুভূত হয়। সে সহানুভূতি যেন কাজে পর্যবসিত হয়, আর ভবিষ্যতে-আমি যখন তোমাদের সেই গৌরবজনক কাজগুলি করতে দেখব তখন যেন এই কথা স্মরণ ক'রে আমি গর্ববোধ করি যে আমার দ্বারাই তার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল।”

* * *

—এইভাবে জাতীয়তার কাজের আংশিক গোড়াপত্তন হতে না হতে ইংরেজ শাসকদের তীব্র দমনের ফলে তা তখনকার মতো ভেঙে যায়। তার সব চেয়ে বাস্তব প্রতিক্রিয়ার দিকটা ছিল স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বয়কট; স্বদেশী প্রচারের জন্য সাধারণ ভাবে অনেক কিছুই করা হয়েছিল এবং অন্যান্য কাজও কিছু কিছু শুরু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার পূর্ণতর সাফল্য ঘটেছিল কালক্রমে। শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন যে এটা যেন কেবল বাক্যেই প্রচার করা না হয়, ষ্ট সক্রিয়ভাবে যেন স্বদেশীর দিকটা বাস্তবরূপে সুপ্রতিষ্ঠ করা হয়। বরোদা থেকে তিনি লিখে পাঠালেন যে শিল্পপতি ও কারখানাওয়ালাদের দলে নিয়ে ও ধনী জমিদারদের আর্থিক সাহায্য নিয়ে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলো যেখানে কেবল রাজনৈতিক কর্মীরা নয়, কিন্তু শিল্পদক্ষ ও কারবারী অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিরাও তাতে যোগ দিয়ে স্বদেশীকে সার্থক ক'রে তোলার উপায় অবলম্বন করতে পারে; কিন্তু তাঁর কাছে এই জবাব গেল যে তা করতে পারা অসম্ভব, কারণ শিল্পপতি ও জমিদারেরা এ আন্দোলনে আদৌ যোগ দিতে ভয় পাচ্ছে, আর বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা বিলাতী জিনিসের আমদানি থেকেই লাভবান হয়, সুতরাং তারা সেটাকেই ধরে থাকবে; অতএব স্বদেশী ও বয়কটকে দেশে প্রচলিত করবার পরিকল্পনা উপস্থিত তাঁকে ত্যাগ করতে হবে।

তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ দুজনেই ছিলেন বিলাতীদ্রব্য বর্জনের পক্ষপাতী—কিন্তু তা কেবল ব্রিটিশের প্রস্তুত জিনিসের সম্পর্কে। সকল বিদেশী জিনিসকেই বর্জন করা যায় এমন উপায় ছিল না, কারণ দেশে খুব কম জিনিসই তৈরি হতো; তাই এঁরা বললেন যে তোমরা ব্রিটিশের বদলে জার্মানি অষ্ট্রিয়া ও আমেরিকার প্রস্তুত জিনিস ব্যবহার করতে থাকো, যাতে ইংলণ্ডেরই উপর পুরোপুরি রকমের চাপ পড়ে। এই বয়কট হবে একটা রাজনৈতিক অস্ত্র স্বরূপ, কেবল স্বদেশীর উন্নতির জন্য নয়; সকল রকমের বিদেশী বর্জন করা অসাধ্য, আর কংগ্রেসে যে সীমাবদ্ধভাবের সংকল্প অনুমোদিত হয়েছে তাতে রাজনৈতিক সাফল্য সামান্যই হতে পারে। এঁরা চেয়েছিলেন যে বড়ো বড়ো মোটা শিল্পগুলিতে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠুক, ভারতে যে সব প্রাকৃতিক উপাদান আছে তার থেকেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যথাসম্ভব প্রস্তুত করা হোক, কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরতা সম্ভবও নয় আর বাঞ্ছনীয়ও নয়, কারণ স্বাধীন ভারতকেও জিনিসপত্রের আমদানি ও রপ্তানি করতেই হবে এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনও বজায় রাখতে হবে। কিন্তু দেশের লোক হঠাৎ

সম্পূর্ণ বিদেশী বর্জনে অধিকাংশই উৎসাহিত হয়ে উঠল আর নেতারাও তাতে সায় দিলে, যাতে সম্পূর্ণ এবং খাঁটী স্বদেশীর মনোভাবটা আরো বেড়ে যায়।

জাতীয় ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকেও শ্রীঅরবিন্দ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এখানকাব স্কুল কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ব্রিটিশ ধরণের শিক্ষাবিধি প্রবর্তিত হয়েছিল, এবং ববোদা কলেজেব অধ্যাপক রূপে নিজেও তার যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, তাতে তিনি খুবই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি দেখলেন যে ওর ফলে ভারতীয় ছাত্রদের তীক্ষ্ণ ও নমনীয় সহজ বুদ্ধিবৃত্তিকে ভোঁতা ও সংকীর্ণ ক'রে বদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়, বুদ্ধি বিচারের দিক দিয়ে তাদের নানা মন্দ অভ্যাস শেখানো হয়, আব পুঁথিগত সংকীর্ণ শিক্ষার দ্বারা তাদের নিজস্ব মৌলিক বিশেষত্ব ও সৃজন গুণকে নষ্ট করা হয়। জাতীয় শিক্ষাব আন্দোলন বেশ ভালো ভাবেই শুরু হয়েছিল, বাংলাদেশে অনেক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হলো এবং ভালো ভালো শিক্ষকও তাতে যোগ দিলে, কিন্তু তথাপি আশানুরূপ উন্নতি ঘটল না এবং স্কুলগুলির আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং এর মধ্যে নেমে পড়ে দেখতে চাইলেন যে এর ভিত্তিকে আরো সুদৃঢ় ও প্রসারিত করা যায় কিনা, কিন্তু বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হওয়াতে সে কল্পনা নির্মূল হয়ে গেল। সমূহ দমননীতির ফলে যে সাধারণ অবসাদ এসে পড়ল তাতে অধিকাংশ স্কুলই টিঁকে থাকতে পারল না। কিন্তু ওর ভাবটা এখনও টিঁকে আছে, একদিন হয়তো উপযুক্ত আকারে তা প্রকাশ পাবে। জনগণের নিজেদের সালিশী আদালত স্থাপনের কল্পনাও কোনো কোনো জেলাতে রূপ গ্রহণ করেছিল এবং সেখানে সাফল্যের সঙ্গে কিছু কাজও হচ্ছিল, কিন্তু ঝড়ের মুখে পড়ে তাও ভেঙে গেল। স্বেচ্ছাসেবকের বাহিনী গড়ে তোলা খুবই উৎসাহের সঙ্গে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল এবং তা সর্বত্রই বেড়ে চলেছিল, তার কর্মীরা মুক্তিসংগ্রামে নেমে মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ ক্রিয়াও ঘটাচ্ছিল। জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যে এই জিনিসটাই সব চেয়ে বেশি টিঁকে ছিল, দমন ও পীড়নের প্রত্যেক তরঙ্গাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে নতুন জীবনের উদ্দীপনা পেয়ে মুক্তি সংগ্রামের ক্রিয়াগুলি আরো জোরদার হয়ে উঠত, এবং এই ব্যাপার প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছিল।

কিন্তু ঐ কয়েক বছরে সব চেয়ে বড়ো কাজ হয়েছিল দেশের মধ্যে এক নতুন প্রাণশক্তির সৃষ্টি। চারিদিক থেকে বহু কণ্ঠে বেজে উঠত "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি, আর তৎক্ষণাৎ সর্বত্রই একটা উদ্দীপনার তরঙ্গ বয়ে যেতো, লোকে

সাহস ক'রে এই ধ্বনিতে যোগ দিয়ে একত্রে কাজ করাতে ও একত্রে আশা করাতে একটা গৌরব অনুভব করত; আগেকার দিনের সেই ভীরুতা ও শিথিলতা গেল ঘুচে, তার বদলে এমন এক তেজ দেখা দিল যা কিছুতেই দমবার নয়। তরঙ্গের পর তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে সেই তেজ অবশেষে ভারতকে তার পূর্ণবিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এনে হাজির করে দিলে।

"বন্দে মাতরম্" পত্রিকার মামলাটির পরে শ্রীঅরবিন্দই দাঁড়ালেন বাংলার জাতীয়বাদীদের নেতা হয়ে। সেই দলকে নিয়ে তিনি মেদিনীপুরে প্রকাশ্য ভাবে প্রাদেশিক সম্মেলনে গিয়ে যোগ দিলেন, সেখানে দুই দলের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বেধে গেল। এই প্রথম তিনি সাধারণ মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন, আর সুরাটে অনেক বড়ো বড়ো অধিবেশনে ভাষণ দিলেন, এবং তথাকার জাতীয়তাবাদী দলের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন। কলকাতায় ফিরবার পথে তাঁকে অনেক স্থানে নেমে ভাষণ দিতে হয়েছিল, তাই শুনবার জন্য অনেক বড়ো বড়ো সভাব আয়োজন করা হয়েছিল। হুগলির প্রাদেশিক সম্মেলনেও তিনি দলের নেতা হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেই প্রথম জানা গেল যে জাতীয়বাদের প্রভাব ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, অধিকাংশ সদস্যই এ দলের প্রস্তাব সমর্থন করলে, আর বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে নরমপন্থীদের বিধান-সংশোধনের প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ অযোগ্য ও অবাস্তব বলে ভোটাধিক্যে নাকচ ক'রে দিয়ে তিনি নিজের প্রস্তাবকেই বহাল করলেন। নরমপন্থী নেতারা এতে সম্মেলন থেকে বেরিয়ে যাবার ভয় দেখানোতে তিনি তখন তাদের প্রস্তাবকেই মঞ্জুর ক'রে নিলেন, আর সাধারণ অধিবেশনে জাতীয়তাবাদীদের অনুরোধ করলেন তাতেই রাজী হয়ে যেতে, যাতে বাংলার রাজনৈতিক শক্তির অবিভক্ত ঐক্য বজায় থাকে। জাতীয়তাবাদী সদস্যেরা প্রথমে হৈ চৈ করে উঠলেও শ্রীঅরবিন্দের আদেশক্রমে তারা নিঃশব্দে সভাগৃহ ত্যাগ ক'রে চলে গেল, নরমপন্থীদের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো ভোট দিলেনা। এতে নরমপন্থী নেতারা আশ্চর্য হয়ে ও ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে যে এখন লোকে তাদের পুরানো বিশ্বস্ত নেতাদের আর মানতে চায়না, রাজনীতির ক্ষেত্রে কোথা থেকে নতুন আমদানি এক ছোকরার কথায় সবাই একযোগে চুপচাপ বেরিয়ে চলে গেল।

অতঃপর এই সময় শ্রীঅরবিন্দ "নবশক্তি" নামক বাংলা দৈনিকের ভার গ্রহণ ক'রে তাঁর পূর্বেকার স্কট্‌স্ লেনের বাসা পরিত্যাগ ক'রে তাঁর স্ত্রী ও

ভগ্নীকে নিয়ে ঐ পত্রিকার অফিসের বাড়িতে উঠে এলেন। এখানে এসে কাজ শুরু করবার আগেই একদিন ভোরের সময় যখন তিনি নিদ্রিত, তখন একদল পুলিস রিভলভার হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করলে। তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো, সেখান থেকে আলিপুর জেলে তাঁকে রাখা হলো। এই জেলে তিনি এক বৎসর কাল রইলেন, তার মধ্যে তল্লাসী ও আলিপুর সেশন কোর্টের বিচার চলতে থাকল। প্রথমে তাঁকে নির্জন কারাতে রাখা হয়েছিল, তার পর একটি বড়ো হলঘরের মধ্যে ঐ মামলার অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে তাঁকে রাখা হলো; পরে যখন জেলের মধ্যে স্বীকারোক্তিকারীকে হত্যা করা হলো, তখন সকলকেই পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন কুঠরিতে রাখবার ব্যবস্থা হলো। কেবল আদালতের মধ্যে আর ব্যায়ামের স্থানে তাদের সাক্ষাৎ হতো, কিন্তু কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। ঐ মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

জেলে থাকা কালে তিনি প্রায় সব সময়েই গীতা ও উপনিষদ অধ্যয়ন নিয়ে থাকতেন, আর ধ্যানে ডুবে থাকতেন ও যোগ অভ্যাস করতেন। মধ্যবর্তী কালে যখন তিনি সকলেব মধ্যে থাকতেন তখনও তাই করতেন। সকলের নানারূপ হাসিঠাট্টার মধ্যে থেকেও তিনি যোগ করার অভ্যাস করে নিয়েছিলেন, যদিও তখন অন্যান্য সকলে খেলা করত ও যথেষ্ট সোরগোল করত; প্রথম ও তৃতীয় পর্বে নির্জন বাসের সময়ে তিনি এর পুরোপুরি সুযোগ পেয়েছিলেন ও তার সদ্ব্যবহার করেছিলেন। সেশন কোর্টে সকলকে একটা বন্দীদের খাঁচার মধ্যে ভরে রাখা হতো, সেখানেও তিনি সারাদিন তাঁর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন, বিচারের কথা ও সাক্ষী সাবুদের কথা খুব কমই শুনতেন। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার সি. আর. দাশ জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন, তিনি বিপুল পসার পরিত্যাগ করে মাসের পর মাস শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে নিযুক্ত থাকলেন, আর শ্রীঅরবিন্দও তাঁর হাতে সব কিছু ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত রইলেন; আর অন্তর থেকেও তিনি জানতেন যে তিনি ছাড়া পাবেন।

এই সময়টির মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বদলে গেল; প্রথমে তিনি যোগের পথ নিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে ওতে আধ্যাত্মিক শক্তি ও তেজ মিলবে ও তাঁর জীবনের উদ্দিষ্ট কর্মে এর দ্বারা ভগবৎ সহায়তা লাভ করবেন। কিন্তু ক্রমশ তাঁর আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি উত্তরোত্তর বাড়তে বাড়তে এমনই বিশ্বব্যাপকতায় গিয়ে পৌছল যে সেই বৃহত্তর

অবস্থান্তরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে চলে যাওয়াতে তাঁর প্রারব্ধ কর্ম ওর আংশিক বস্তু মাত্র হয়ে দাঁড়াল, তা ছাড়া তাঁর দেশের মুক্তির কাজকে ছাপিয়ে এখন তাঁর কাজের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল জগৎব্যাপী, যার কিছু আভাসমাত্র তিনি পূর্বেই পেয়েছিলেন, যে কাজ অতঃপর হবে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ মুক্তির সম্পর্কে।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্‌টে গেছে ; জাতীয়তাবাদী নেতারা অধিকাংশই গেছেন জেলে কিংবা দেশান্তরে গাঢাকা দিয়েছেন, চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে নিরুৎসাহ ও হতাশার লক্ষণ, যদিও দেশের ভিতরকার মনোভাব নির্বাপিত হয়নি, বরং দমনের ফলে আরো উগ্র হয়ে উঠেছে। তিনি বেরিয়ে এসে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সংকল্প করলেন ; প্রতি সপ্তাহে সভা করতে থাকলেন ; কিন্তু পূর্বে যেখানে হাজার হাজার উন্মুখ শ্রোতা এসে জুটত, সেখানে মাত্র কয়েক শত লোক এসে জমা হতো এবং তাদের মধ্যেও তেমন প্রাণ বা তেজ ছিলনা। তিনি বিভিন্ন জেলাতে গিয়ে ভাষণ দিলেন, তার মধ্যে উত্তরপাড়াতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানেই প্রথম তিনি প্রকাশ্যভাবে তাঁর যোগের কথা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা জ্ঞাপন করলেন।

উত্তরপাড়ার ভাষণ

"...বিপিনচন্দ্র পাল বক্সার জেলে যে ভগবৎ নির্দেশ পেয়েছিলেন, আমি ভগবানের সেই নির্দেশ পেলাম আলিপুর জেলের মধ্যে। আমার বারো মাস কারাবাসের মধ্যে দিনের পর দিন তিনি আমাকে সেই জ্ঞান দান করলেন, আর এখন বেরিয়ে আসার পরে তারই সম্বন্ধে তোমাদের কাছে বলতে তিনিই আদেশ করেছেন।

আমি জানতাম যে আমি নিশ্চয় ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসব। কেবল শিক্ষা দেবার জন্যই অমন ক'রে আমাকে একটি বছর নিতান্ত নির্জনে আবদ্ধ কারাতে রাখা হয়েছিল। ভগবানের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যতদিন আমার জেলে থাকা দরকার ছিল তার চেয়ে বেশিদিন কে আমাকে আটকাতে পারে? তিনি এখন আমাকে দিয়েছেন একটি কথা বলতে ও একটি কাজ করতে, আর যতদিন পর্যন্ত সে কথাটি বলা না হবে ততদিন পর্যন্ত কেউ আমার মুখ বন্ধ

করতে পারবেনা, যতদিন পর্যন্ত সেই কাজটি করা না হবে ততদিন পর্যন্ত মানুষের কোনো শক্তিই ভগবানেব এই যন্ত্রকে থামাতে পারবেনা, সে যন্ত্র যতই কেন দুর্বল হোক বা ক্ষুদ্র হোক। এখন আমি বাইরে এসেছি, আর এই কয়েকটি মিনিটের মধ্যেই আমার মুখের গোড়ায় সেই কথাগুলি জুগিয়ে দেওয়া হচ্ছে যা বলবাব কোনো ইচ্ছাই আমাব নিজেব ছিলনা। বস্তুত যে কথা বলব মনে ক'রে আজ আমি এসেছিলাম, ভগবান যেন সেগুলিকে বাতিল ক'বে দিলেন, এবাব যা বলতে যাচ্ছি তা কেবল তাঁবই প্রেবণাতে বাধ্য হয়ে, তিনি যা বলাচ্ছেন তাই বলছি।

বন্দী ক'বে যখন আমাকে লালবাজারেব হাজতে নিয়ে যাওয়া হলো তখন আমার মনেব বিশ্বাস কিছুক্ষণের জন্য টলেছিল, কারণ আমি তাঁর মতলবটা তখন অন্তরে বোধ করতে পারিনি। সেইজন্য তখন একটু বেসামাল হয়ে মনে মনে তাঁকে ডেকে বললাম, 'এটা আমাব কী হলো? আমি জানতাম যে আমার দেশেব জন্য আমাকে কিছু কাজ করতে দেওয়া হয়েছে, আব যতকাল সে কাজ সম্পন্ন না হয় ততকাল পর্যন্ত তুমি আমাকে রক্ষা করবে। তাহলে আমার নামে এমন একটা অভিযোগ এনে কেন আমাকে এখানে নিয়ে আসা হলো?' এক দিন কেটে গেল, দুদিন কেটে গেল, তৃতীয় দিনে আমার অন্তরেব মধ্যে একটি সাড়া শুনতে পেলাম 'অপেক্ষা ক'রে দেখ।' তখন আমি শান্ত হয়ে অপেক্ষাই করতে থাকলাম। লালবাজার থেকে আলিপুবে নিয়ে গিয়ে আমাকে সকলের সঙ্গ থেকে পৃথক ক'রে একটি নির্জন কারাগৃহের মধ্যে রাখা হলো। অন্তরে আবার ভগবানের সাড়া পাবার জন্য আমি দিবারাত্র অপেক্ষাই ক'রে থাকলাম, তিনি কী বলতে চান আর কী আমাকে করতে হবে তাই আমি জানতে চাই।

এই নির্জনবাসের মধ্যে থাকতে থাকতে একদিন আমার মধ্যে প্রথম চেতনা আর প্রথম উপলব্ধিটা এসে গেল। তখন মনে পড়ল যে, আমার কয়েদ হবার প্রায় মাসাধিক কাল আগে আমি একটা নির্দেশ পেয়েছিলাম যে আমাকে সব কিছু কাজ ছেড়ে দিয়ে নির্জনে গিয়ে নিজের ভিতরের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, যাতে আমি ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করি। অন্তরে দুর্বল থাকায় সে নির্দেশ তখন আমি মানিনি। আমার কাজটাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল এবং অন্তরের গর্বে এই কথা আমি ভাবতাম যে আমি না থাকলে একাজ হতেই পারবে না, সব কিছু ব্যর্থ হয়ে থেমে যাবে, তাই এ কাজ ছাড়া আমার চলবে

না। আমার ঐ সময়ে মনে হলো যে আবার তাই তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, 'যে বন্ধন তুমি নিয়েছিলে তা ভাঙবার শক্তি তোমার ছিল না, তাই আমি তোমার সেটা ভেঙে দিলাম, কারণ এমন ইচ্ছা আমার ছিল না যে ঐ কাজই তুমি ক'রে যেতে থাকো। তোমার জন্যে আমি অন্য একটি কাজ রেখেছি, আর সেই কারণেই তোমাকে এখানে এনেছি, যে শিক্ষা তুমি নিজে নিতে পারতে না সেই শিক্ষা তোমাকে দিয়ে আমার সেই কাজের উপযুক্ত ক'রে তুলতে।' তারপর তিনি আমার হাতে একখানি গীতা আনিয়ে দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করায় আমি গীতার সাধনা শুরু ক'রে দিলাম। কেবল বুদ্ধির দ্বারা গীতার অর্থ গ্রহণ করা নয়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়ে যা করাতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর কাজ করতে যারা আগ্রহী তাদের দিয়ে যা করাতে চান সেই জিনিসকে উপলব্ধি করা, অর্থাৎ কোনো বিরাগও থাকবে না, অনুরাগও থাকবে না, কোনো ফলের প্রত্যাশা না ক'রে তাঁর কাজ ক'রে যেতে হবে, আত্ম-ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে কেবল তাঁর হাতের সম্পূর্ণ বাধ্য যন্ত্র মাত্র হয়ে থাকতে হবে, উচ্চ-নীচকে সমান অন্তরের সঙ্গে দেখতে হবে, বন্ধু ও শত্রু, জয় ও পরাজয় সবই সমান হবে, অথচ তাঁর কাজে কোনো কিছু অবহেলা হবে না। তখন আমি বুঝলাম হিন্দুধর্মের অর্থ কি। আমরা প্রায়ই বলে থাকি হিন্দুর সনাতন ধর্মের কথা, কিন্তু সে ধর্ম যে কি তা খুব কম লোকেই আমরা জানি। অন্যান্য সব ধর্ম প্রধানত শ্রদ্ধাভক্তির ও আনুষ্ঠানিকের ধর্ম, কিন্তু সনাতন ধর্ম প্রত্যক্ষভাবে জীবনেরই ধর্ম; এখানে কেবল বিশ্বাসের কথা নয়, কিন্তু জীবনের মধ্যে খাঁটী উপলব্ধির কথা। মানুষের মুক্তির জন্য ভারতের এই প্রান্তভূমির নির্জনে বহু প্রাচীনকাল হতেই এই ধর্মের অনুশীলন হয়ে আসছে। জগৎকে এই ধর্ম দেবার জন্যই ভারত আবার জাগছে। অন্যান্য দেশের মতো এ দেশ নিজের স্বার্থের জন্য জাগছে না, কিংবা প্রবল হয়ে উঠে দুর্বলকে দমন করবার জন্যও নয়। সে জাগছে যে শাশ্বত আলোকের সে অধিকারী সেই আলোককে জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্য। ভারত চিরদিনই চেয়েছে সমগ্র মানব জাতিকে, কেবল নিজেকে নয়, এবং নিজের জন্য নয় কিন্তু মানব জাতির সকলের জন্যই তার বড়ো হয়ে ওঠা দরকার।

তাই এই কথাটাই অতঃপর ভগবান আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, হিন্দু ধর্মের মূল সত্যটি তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন। জেলের প্রহরীদের হৃদয়কে তিনি আমার দিকে ফেরালেন, তখন তারা জেলের ইংরেজ অধ্যক্ষকে বললে, 'এই

লোকটি নির্জনে আবদ্ধ থেকে অসুস্থ হচ্ছে, একে সকালে সন্ধ্যায় অন্তত আধ ঘণ্টার জন্য কুঠরির বাইরে বেড়াতে দেওয়া হোক।' সেই ব্যবস্থাই হলো, এবং চলাফেরা করতে গিয়ে আবার তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল। আমি জেলের অবরোধ ঘেরা উচ্চ প্রাচীরের দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখলাম, কিন্তু তখনই স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে এ তো অবরোধের প্রাচীর নয়, স্বয়ং বাসুদেবই আমাকে এমনি ক'রে ঘিরে আছেন। আমার কুঠরির সামনেব গাছটির শাখা-প্রশাখার তলা দিয়ে যখন চললাম তখন দেখি এ তো গাছ নয়, এ যে সেই বাসুদেব, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন দাঁড়িয়ে আমার মাথার উপর তাঁব স্নেহের ছায়ার আচ্ছাদন দিয়ে। আর আমার কুঠরিটার গরাদেগুলির দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি, যা আমাকে আবদ্ধ দরজার মতো আড়াল ক'রে রেখেছিল, কিন্তু না, সেখানেও সেই বাসুদেব, স্বয়ং নারায়ণই ঐভাবে আমার প্রহরায় দাঁড়িয়ে আছেন। আবার যখন আমি শুতে দেওয়া রুক্ষ কম্বলটার উপর গিয়ে শুলাম, তখন দেখি পরম বন্ধু ও পরম প্রেমিকের মতো শ্রীকৃষ্ণই তাঁর হাত দুটি দিয়ে অমন ক'রে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি আমাকে দিলেন এই হলো তার প্রথম ক্রিয়া। জেলের অন্যান্য সব কয়েদীদেব দিকে চাই, তারা সব যত খুনী, চোর, জোচ্চোর প্রভৃতি, তাদের মধ্যেও দেখি সেই বাসুদেব, ঐ সব তামসিক আত্মা ও অত্যাচারী দেহের আধারের মধ্যেও নারায়ণ রয়েছেন। এই সব চোর ডাকাতদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিল, ঐরূপ দুর্ভোগের অবস্থার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও যাদের মানবোচিত দয়া মায়া ও সহানুভূতির কাজ দেখে আমি লজ্জা পেতাম। ওদের মধ্যে বিশেষ ক'বে একজনকে দেখলাম যাকে প্রকৃত সাধু বলেই আমার মনে হলো। লোকটি আমাদের দেশেরই একজন নিরক্ষর চাষা, ডাকাতি করার অভিযোগে তাকে দশ বছরের জন্যে সশ্রম কারাবাস দেওয়া হয়েছে, আমরা নিজেদের সভ্যতার গর্বে যাদের ছোটোলোক বলে থাকি তাদেরই একজন। ভগবান তাদের দিকে দেখিয়ে আবার আমাকে বললেন, 'দেখ চেয়ে কাদের মধ্যে আমার কিছু কাজ করবার জন্যে তোমাকে এখানে এনেছি। দেখ এই হলো এই জাতির প্রকৃতি, যাদের আমি উপরে তুলতে চাই, আর জেনে রাখো যে কোন কারণে এদের আমি তুলতে চাইছি।'

মামলা শুরু হতে যখন নিম্ন আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো তখনও আমার সেই অন্তর্দৃষ্টি চলতে থাকল। ভগবান আমাকে

বললেন, 'তোমায় যখন জেলে ভরা হয়েছিল, তখন তোমার বুক ফাটা কান্না কেঁদে আমাকে বলোনি যে কই তুমি আমাকে রক্ষা করলে? এখন একবার চেয়ে দেখ ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে, ঐ তোমার বিপক্ষের উকিলের দিকে।' তখন দেখলাম ঐ বেঞ্চে যে বসেছে সে তো ম্যাজিষ্ট্রেট নয়, সেও নারায়ণ। আমার বিপক্ষের উকিলের দিকে চেয়ে দেখি, যে বসে আছে সে তো উকিল নয়, সেও আমার সেই বন্ধু ও প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ, হেসে হেসে তিনি আমাকে বলছেন, 'আর কি তোমার কিছু ভয় হচ্ছে?' তিনি আমাকে শুনিয়ে বললেন, 'আমিই রয়েছি সকল মানুষের মধ্যে, আমিই তাদের দিয়ে সবরকম কাজ করাই ও কথা বলাই। তুমি এখনও রয়েছ আমারই আশ্রয়ে, ভয় করবার কিছু নেই। তোমার বিরুদ্ধে এই যে মামলা চলছে এর সমস্ত ভার তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও। তোমার এতে কিছুই হবেনা। এই মামলার জন্যে তোমাকে এখানে আনা হয়নি, আনা হয়েছে অন্য কারণে। এই মামলা আমার সেই কাজের একটা নিমিত্ত মাত্র, তাছাড়া আর কিছু নয়।' তারপরে সেই মামলা যখন সেশন কোর্টে উঠল, আমি তখন আমার তরফের উকিলকে অনেক কিছু নির্দেশ দেবার জন্যে লিখতে বসলাম যে আমার বিরুদ্ধে কোন কোন অভিযোগ মিথ্যা আর কি কি বিষয়ে সাক্ষীদের জবানবন্দী করতে হবে। তখন এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটল। আমার সপক্ষে জবাব দাখিল করবার যা কিছু ব্যবস্থা হয়েছিল সমস্তই হঠাৎ পাল্‌টে গিয়ে আমার পূর্ব উকিলের স্থানে অন্য এক ব্যারিষ্টার আমার পক্ষ নিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি আমার এক বন্ধু, কিন্তু আমার অজ্ঞাতে তিনি নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই এসে আমার পক্ষ নিলেন। তিনি নিজের প্র্যাকটিস ছেড়ে আর অন্য কাজ ও অন্য সকল চিন্তা ত্যাগ ক'রে মাসের পর মাস প্রত্যহ মধ্যরাত্র পর্যন্ত জেগে আমাকে বাঁচাবার জন্য খেটে নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গ করলেন—তোমরা সকলেই তাঁকে চেনো, তিনি হলেন শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস। তাঁকে দেখে আমি খুবই খুশী হলাম, কিন্তু তথাপি ভাবলাম তাঁকে আমার উপদেশগুলি লিখে জানিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু তার থেকে আমাকে নিবৃত্ত ক'রে ভিতর থেকে নির্দেশ এলো, 'এই লোকটি তোমার পায়ের শৃঙ্খল মোচন ক'রে দিয়ে তোমাকে রক্ষা করবে। ওসব কাগজপত্র ফেলে দাও। তোমাকে কিছুই শেখাতে হবেনা, যা কিছু শেখাবার তা আমিই ওকে শিখিয়ে দেবো।' তখন থেকে আমার সমর্থক ব্যারিষ্টারকে আর আমি

একটি কথাও বলিনি কিংবা একটিও উপদেশ জানাইনি, আর দেখলাম আমাকে প্রশ্ন করলে আমি যা উত্তর দিতাম তাতে বিশেষ কিছু সাহায্য হতোনা। আমি সব কিছু ওঁর হাতেই ছেড়ে দিলাম। তার কি ফল হলো তোমরা তা জানো। আমি বরাবরই জানছিলাম যে আমার সম্বন্ধে তাঁর কি অভিপ্রায়, কারণ আমি পুনঃ পুনঃ সর্বদাই শুনছিলাম অন্তরের মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর, তিনি বলছেন: 'আমিই নিজে এ কাজ চালাচ্ছি, স্নতরাং তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি তোমার আপন কাজ ক'রে যাও, যে জন্যে তোমাকে জেলে এনে রেখেছি। তারপর যখন এখান থেকে বেরিয়ে যাবে তখন মনে রেখো, ভয় করা, বা ইতস্তত করা আর চলবেনা। একথা মনে রেখো যে যা কিছু কাজ আমিই করছি, তুমিও নয় বা অন্য কেউই নয়। স্নতরাং কালো মেঘ বা ঝড়ঝাপটা, বিপদ বা কষ্টভোগ বা বিঘ্ন বিপত্তি যাই কেন আস্নক, অসম্ভব বলে যা কিছুই মনে হোক, বস্তুত অসম্ভব কিছুই নয়, অসাধ্য কিছুই নয়। আমিই নারায়ণ, আমিই বাস্নদেব, আমিই রয়েছি এই জাতির উত্থানের মধ্যে, আর আমার যা ইচ্ছা তাই হবে, অন্য কারো ইচ্ছাতে কিছু হবেনা। আমি যা এখানে আনতে চাই, কোনো শক্তিই তা ঠেকাতে পারবেনা।'

ইতিমধ্যে নির্জনবাস থেকে তিনি আমাকে এনে রাখলেন আমার সঙ্গে অভিযুক্ত অন্যান্য কয়েদীদের মধ্যে। আজ তোমরা আমার দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ সম্বন্ধে অনেক কথাই বললে। জেল থেকে বেরোবার পর হতে এই রকম কথাই সর্বত্র শুনছি, এতে আমি খুব অপ্রস্তুত বোধ করছি ও মনে ব্যথা পাচ্ছি। কারণ আমি নিজে জানি আমার দুর্বলতার কথা, আমার দোষ ও ত্রুটি পতনাদির কথা; আগেও আমি সে সম্বন্ধে অন্ধ ছিলাম না, আর নির্জনবাসের কালে সেগুলিকে আরো বেশি জাজ্জ্বল্যমান রূপে অনুভব করলাম। তখন আমি জানলাম যে আমি কত দৌর্বল্যে ভরা নানা ত্রুটিপূর্ণ এক অপূর্ণ যন্ত্র, কেবল উচ্চতর শক্তি যখন এসে আমার মধ্যে প্রবেশ করে তখনই আমি খুব সবল হয়ে উঠি। তারপরে সেখানে দেখলাম সেই সব তরুণ যুবকদের, যাদের অনেকেরই মধ্যে রয়েছে এত অদম্য সাহস ও আত্ম-লোপের শক্তি যার তুলনায় আমি তাদের কাছে কিছুই নই। দু' একজনকে দেখলাম যারা কেবল তেজে ও চরিত্রে আমার চেয়ে শুধু বড়োই নয়—তেমন তো অনেকেই ছিল—কিন্তু যে বুদ্ধিমত্তার আমি গর্ব করতাম তার

সম্ভাবনাও তাদের মধ্যে আমার চেয়ে অনেক বেশি। ভগবান তাদের দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'এই হলো তরুণ যুগের দল, আমার আদেশে এই নতুন মহাজাতি এমনি ক'রে এদের ভিতর দিয়ে জাগছে। তোমার চেয়ে এরা অনেক বড়ো। তাহলে তোমার ভয় করার কি রইল? তুমি যদি সরে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে, তবুও এ কাজ ঠিকই করা হতো। কাল যদি তোমাকে দূর ক'রে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন এইসব যুবকেরা তোমার কাজের ভার নিয়ে তোমার চেয়ে ভালোই কাজ করবে। তোমাকে আমি এই জাতির কাছে কেবল কিছু বলবার শক্তি দিয়েছি, যা এই জাতিকে তুলে দিতে সাহায্য করবে।' এই সব কথাই তিনি অতঃপর আমাকে বললেন।

তার পরে হঠাৎ এমন এক ঘটনা ঘটল যাতে তৎক্ষণাৎ আমাকে আবার নির্জন কুঠরির মধ্যে পুরে দেওয়া হলো। সেই নির্জন অবস্থানকালের মধ্যে আমার কি হলো তা আমি বলতে চাইনা, কিন্তু দিনের পর দিন তিনি তাঁর পরম বিস্ময়গুলি আমাকে দেখাতে থাকলেন, এবং হিন্দু ধর্মের চরম সত্যকে উপলব্ধি করাতে থাকলেন। ইংলণ্ডে বিজাতীয় মনোভাব ও সম্পূর্ণ বিজাতীয় আবহাওয়ার মধ্যে থেকে আমি মানুষ হয়েছি। হিন্দুত্বের অনেক কিছুকেই আমি একসময় কল্পনা বলে ভাবতাম, মনে করতাম যে ওর মধ্যে অনেক কিছুই স্বপ্ন এবং মিথ্যা মায়া মরীচিকা। কিন্তু এখন আমি হৃদয়ে ও মনে ও দেহের মধ্যেও হিন্দুধর্মের সত্যকে উপলব্ধি করতে লাগলাম। সেগুলির বাস্তব অনুভূতি আমার কাছে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল, আর আমার চোখের সামনে এমন সব জিনিস উদ্ঘাটিত হতে থাকল যার ব্যাখ্যা কোনো পদার্থ-বিজ্ঞান দিতে পারে না। যখন প্রথম আমি তাঁর দিকে ফিরি তখন ভক্ত হয়েও নয়, জ্ঞানী হয়েও নয়। বর্তমান স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার ও দেশের কাজে নামবার অনেক আগে বরোদাতে থাকতে আমি তাঁর দিকে ফিরেছিলাম।

সে সময়ে তাঁর উপর আমার এমন কিছু জীবন্ত বিশ্বাস ছিল না। আমার মধ্যে ছিল অজ্ঞাবাদ, নাস্তিকতা, সন্দেহ, ভগবান প্রকৃতপক্ষে আছেন কিনা সে সম্বন্ধেই নিশ্চিত ছিলাম না। তাঁর উপস্থিতি আমি আদৌ অনুভবই করিনি। তথাপি কোনো কারণে বেদের ও গীতার ও হিন্দুধর্মের সত্যের দিকে আমাকে টানল। আমার মনে হলো যে এই যোগের মধ্যে, এই বেদান্তভিত্তিক ধর্মের মধ্যে নিশ্চয় কিছু একটা মহৎ সত্য আছে। সুতরাং

তখন যে আমি যোগের দিকে ঝুঁকেছিলাম সেটা বাস্তবে পরীক্ষা ক'রে দেখতে যে আমি যা ভাবছি তা ঠিক কিনা, আর সেই ভাবেই তাঁর কাছে প্রার্থনাও করলাম, 'তুমি যদি বাস্তবিকই থাকো, তাহলে তুমি জানো আমাব হৃদয়ের কথা। তুমি জানো যে আমি মুক্তি চাইনা। অন্যেরা যা চেয়ে থাকে তাব কোনো কিছুই আমি চাইনা। আমি চাই কেবল এই জাতিকে তুলতে পারার শক্তি, আমি চাই কেবল এদেরই জন্যে বাঁচতে আর কাজ করতে, এদেরই আমি ভালোবাসি আর প্রার্থনা করি যেন এদের জন্যই জীবন দিতে পারি।' এই ভাব নিয়ে আমি অনেককাল পর্যন্ত যোগ করেছিলাম, আর তার কিছু ফলও পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি যা বিশেষ ক'বে চেয়েছিলাম সে উদ্দেশ্য আমার মেটেনি। তার পর জেলের ঐ নির্জনবাসে থাকার সময় আবার আমি সেই জিনিস চাইলাম। ভগবানকে ডেকে বললাম, 'তুমি আমাকে দাও তোমার আদেশ। কি কাজ আমাকে করতে হবে আর কেমন ক'রে করতে হবে তার কিছুই আমি জানিনা। আমাকে তুমি বলে দাও।' যোগের মিলনের অবস্থার মধ্যে দুটি বাণী এলো। প্রথমটিতে শুনলাম, 'তোমাকে আমি কাজ দিয়েছি এই জাতিকে তুলে দেবার জন্য সাহায্য করতে। অনতিকাল পরেই একদিন তুমি জেল থেকে বেরোবে; কারণ এবার আমার ইচ্ছা নয় যে তুমি বিচারে শাস্তি পাও বা অন্যান্যদের মতো দেশের জন্য কষ্ট ভোগ করতে থাকো। তোমাকে কাজের জন্যে ডেকেছি, এই হলো আমার আদেশ, যা তুমি শুনতে চাইছ। আমি আদেশ দিচ্ছি যে তুমি আমার কাজ নিয়ে আরো অধিক অগ্রসর হও।' দ্বিতীয় বাণী আমাকে বললে, 'এই এক বছরের নির্জনবাসের মধ্যে তোমাকে কিছু দেখিয়ে দেওয়া হলো, যে সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ ছিল, আর এই হলো হিন্দুধর্মের সত্য। এই ধর্মকেই আমি জগতের সামনে তুলে ধরতে চাই, যে ধর্মকে আমি ঋষিদের ও সাধুসন্তদের ও অবতারদের ভিতর দিয়ে সব চেয়ে সম্পূর্ণ ও খাঁটী ক'রে তুলেছি, এর পর এই ধর্মই সকল জাতির মধ্যে আমার কাজকে সম্পূর্ণ করবে। এই হলো শাশ্বত ও সনাতন ধর্ম, যার কথা আগে তুমি ঠিকভাবে জানতে না, এখন তোমাকে জানিয়ে দিলাম। তোমার নাস্তিকতা ও সন্দেহ এখন ঘুচিয়ে দেওয়া হলো, কারণ ভিতরে ও বাইরে, ভাবে ও বাস্তবে তোমাকে অনেক প্রমাণ দেখিয়ে দিলাম, এখন তুমি বুঝতে পেরেছ। বাইরে বেরিয়ে গিয়ে তোমার জাতির লোকদের কাছে এই কথাই

বলবে, যে এই সনাতন ধর্মের জন্যই তাদের তুলে দেওয়া হচ্ছে, এটা তাদের নিজেদের জন্য নয়, কিন্তু জগতের জন্য। জগতের কাজে লাগবার জন্যই আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি। সুতরাং ভারতের উত্থান হবে মানেই এই সনাতন ধর্মের উত্থান হবে। ভারত বড়ো হয়ে উঠবে, তার মানে এই সনাতন ধর্মই বড়ো হয়ে উঠবে। ···আমি তোমাকে দেখিয়ে দিলাম যে আমি সর্বত্র সব মানুষ ও সব জিনিসের মধ্যেই আছি, আর আমি এই আন্দোলনের মধ্যেও আছি, যারা দেশের জন্য কাজ করছে আমি কেবল তাদের মধ্যেই নেই, কিন্তু যারা বিরুদ্ধাচরণ ক'রে তাতে বাধা দিচ্ছে আমি তাদের মধ্যেও আছি। আমি আমার কাজ ক'রে যাচ্ছি সকলেরই মধ্যে, সুতরাং যে যাই ভাবুক আর যে যাই করুক, তাতে আমার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজই করা হচ্ছে। তারাও আমারই কাজ করছে, তারা কেউ আমার শত্রু নয়, সকলেই আমার যন্ত্র। তোমাদের সকল কাজে তোমরা নিজেদের অজ্ঞাতে আমার কাজেই অগ্রসর হয়ে যাচ্ছ। তোমরা এক কাজ করতে মনস্থ করছ কিন্তু অন্য কাজ ক'রে ফেলছ। তোমরা একরকম ফল পেতে চাইছ কিন্তু তোমাদের চেষ্টার ফল তার বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। এটা ভাগবতী শক্তির কাজ, সেই শক্তি সকলের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আমি অনেক কাল আগের থেকেই এর প্রস্তুতি ঘটাচ্ছিলাম, এখন উপযুক্ত সময় হয়েছে, এবার আমি তাকে সম্পূর্ণ সফল ক'রে আনব।'

···এই কথাই আজ তিনি আমার মুখ দিয়ে তোমাদের কাছে বলালেন। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম সে কথা যখন এই ভাবে বাতিল ক'রে দেওয়া হলো, তখন আমাকে যা বলতে দেওয়া হয়েছে তা ছাড়া আর কিছুই এখন বলবার নেই।···"

[জেল থেকে বেরোবার পরে শ্রীঅরবিন্দ দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন, একটি ইংরেজীতে "কর্মযোগীন্" ও একটি বাংলাতে "ধর্ম" নামে। এগুলির সহজেই খুব কাটতি হয়েছিল, সুতরাং পত্রিকা দুটি আত্মনির্ভর হতে পেরেছিল। "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার মতো অবস্থা হয়নি। "কর্মযোগীন্" থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হলো।]

কর্মযোগিন্‌এর আদর্শ

"আজ ভারতে জগতের সকলের চোখের সামনে এক নবজাতি গড়ে উঠেছে এত দ্রুত ও সুস্পষ্ট রূপে যে সেই গঠন সকলের কাছেই লক্ষ্যণীয়, আর যারা সহানুভূতি ও বোধিসম্পন্ন তারা দেখতে পাবে যে কোন শক্তি এখানে কাজ করছে, কোন উপাদান ব্যবহার করছে ও কোন দিব্য স্থাপত্যের পদ্ধতিতে। এ জাতি কিন্তু নতুন নয়, প্রকৃতিব কারখানাতে বর্তমান ঘটনানুযায়ী এর নতুন সৃষ্টি ঘটছেনা। পৃথিবীর মধ্যে এ জাতি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সভ্যতায় এজাতি সর্বাগ্রগণ্য, প্রাণশক্তিতে সবচেয়ে অদম্য, মহত্ব বিকাশে সবচেয়ে উর্বর, প্রাণের গভীরতায় ও স্থিতিশীলতায় পরমাশ্চর্য এজাতি এখন বিদেশী রক্ত থেকে ও অন্যান্য রকমেব সভ্যতা থেকে নানারূপ শক্তি সংগ্রহ ক'রে নবরূপে এক স্থায়ী জাতি বিশেষে নিজেকে জগতের সামনে তুলে ধরতে চাইছে। পূর্বে এজাতি একই জীবনধাবা ও একই সংস্কৃতি নিয়ে একত্বের বিধানে বাঁধা থেকেও আপন উর্বর প্রকৃতির কারণে বহু ভাবে ও বহু ধাবাতে নিজেদের মধ্যে জাতি বিভাগের বাহুল্য ঘটিয়েছিল, তাই একটা মহাদেশে দাঁড় করাবার পক্ষে যে অলঙ্ঘনীয় বাধা ছিল তা কোনোকালে স্থায়ী ভাবে ঘোচাতে পারেনি। এখন সময় এসেছে সেই সকল বাধাকে ঘুচিয়ে দেবার। আমাদের এই জাতি তার সুদীর্ঘ ইতিহাসের কালে যে প্রচেষ্টা করে এসেছিল, এখন সেই চেষ্টা আবার নতুন অবস্থানুযায়ী নতুন ক'রে করবে। কোনো তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক এর নিশ্চিত সাফল্য অনুমান ক'রে নিতে পারবে, কারণ এর বড়ো বড়ো বাধাগুলো একে একে দূর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা তাব চেয়েও নিশ্চিত ক'রে বলতে পাবি যে সেই সাফল্য আসবেই, কারণ সারা জগতেরই পক্ষে এখন দরকার হয়েছে ভারতের মুক্তি লাভ ও তার মহত্বের ও ঐক্যের সম্যক বিকাশ। এই বিশ্বাসকে ধরেই এই 'কর্মযোগীন্' তার হাত লাগিয়ে কাজ ক'রে যাবে, যতই কেন কঠিন বাধা ও অলঙ্ঘ্য বিপত্তি এসে উপস্থিত হোক তাতে সে নিরুৎসাহ হবেনা। আমরা এটা বিশ্বাস করি যে ভগবান রয়েছেন আমাদের সহায় আব সেই বিশ্বাসেই আমরা জয়ী হতে পারব। আমরা এটা বিশ্বাস করি যে জগতের মানব জাতি আমাদের কাজ চাইছে, আর আমাদের সেই মানবপ্রেম, দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম ও ধর্মপ্রীতিই আমাদের কাছে কাজ চাইছে, আর আমাদের সেই মানবপ্রেম, দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম ও ধর্মপ্রীতিই আমাদের হৃদয়কে নির্মল ক'রে এই সংগ্রামে আমাদের সার্থক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে।

যে কাজ আমরা হাতে নিয়েছি তা হলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ধরণের কাজ, কোনো স্থূল পার্থিব ক্রিয়ার ব্যাপার নয়। রাজ্য শাসনকে পাল্‌টে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা চাই জাতিকে গড়ে তুলতে। তার মধ্যে রাজনীতির কিছু অংশ অবশ্য আছে, কিন্তু তা কেবল অংশমাত্র। আমরা রাজনীতি বা সামাজিক প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করবনা, কিংবা শুধু ধর্মশাস্ত্র বা দর্শন বা সাহিত্য বা বিজ্ঞানেব আলোচনাতেই আবদ্ধ থাকবনা। কিন্তু সব মিলিয়ে যে জিনিসকে সব চেয়ে বড়ো মনে করি তারই অনুসরণ করব,—তা হলো ধর্ম।...জীবনের একটা মস্ত নিয়ম বাঁধা আছে, মানুষের ক্রমিক বিবর্তনের একটা বিরাট ধারা আছে, তার মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অনুভূতির একটা বিশেষ সূত্র আছে, নিয়তি কর্তৃক এই ভারত হলো তাবই রক্ষক, নির্দেশক ও প্রচারক। সেই হলো প্রকৃত সনাতন ধর্ম, যা শাশ্বত ধর্ম। বিদেশী প্রভাবের চাপে তার সেই ধর্মের কাঠামো বিশেষ নষ্ট হয়নি, কেবল তার জীবন্ত বাস্তবতা লোপ পেয়েছে। কারণ ভারতের সে ধর্ম যদি জীবনের মধ্যে না প্রবেশ করে তাহলে তা কিছুই নয়। সে ধর্ম কেবল জীবনের সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই প্রযুজ্য নয়, সমগ্র জীবনের মধ্যেই হবে তার স্থান; তারই মূল মর্মটি আমাদের সমাজ ও রাজনীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, ও ব্যক্তিগত চরিত্র ও ভাব ও অভীপ্সার মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে প্রবেশ করা চাই। এই ধর্মের মর্ম বোঝা, একে পরম এক সত্য বলে অনুভব করা, এর থেকে যে উচ্চ ভাব জেগে ওঠে তাকে জীবনের মধ্যে বাস্তবে অভিব্যক্ত করা, একেই আমরা বলি কর্মযোগ। আমাদের বিশ্বাস এই কর্মযোগকে মানব জীবনের আদর্শ করবার জন্যই আজ ভারতের উত্থান হচ্ছে; এই যোগের দ্বারা শক্তি সঞ্চয় ক'রে ভারত সার্থক করবে তার মুক্তি ও ঐক্য ও মহত্ব এবং এই যোগের শক্তির দ্বারাই সে তা রক্ষাও করবে। এ হলো এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব, যার ছায়া ও প্রতিক্রিয়া মাত্রই আপাতত দেখা যাচ্ছে বাস্তবে।

ইউরোপের লোকেরা যন্ত্রকেই সব চেয়ে বড়ো স্থান দেয়। মানব জাতিকে তারা উদ্ধার করতে চায় যত সামাজিক ও প্রশাসনিক পরিকল্পনার দ্বারা, পার্লামেন্টের বিধানের জোরে চায় স্বর্গরাজ্য এনে ফেলতে। যন্ত্রের মূল্য যথেষ্টই বটে, কিন্তু তা অন্তরস্থ শক্তির ক্রিয়ামাধ্যম হিসাবেই। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত প্রত্যাশা করেছিল যে রাজনৈতিক মুক্তির দ্বারা সামাজিক সংস্কার, ধর্মদৃষ্টি দান ও পুনর্জন্ম এনে ফেলবে, কিন্তু সে প্রত্যাশা ব্যর্থ হলো

কারণ এরা চলেছিল পাশ্চাত্ত্য রীতিতে পাশ্চাত্ত্যের লক্ষ্য অনুসারে; নিজেদের জাতির ইতিহাস ও নিয়তি ও নিজস্ব মর্মকে এরা অবহেলা করেছিল। এরা ভেবেছিল যে ইউরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ ক'রে, ইউরোপীয় যন্ত্র ব্যবহার ক'রে, ইউরোপের মালমশলা দিয়ে গঠনের দ্বারা আমরা আমাদের মধ্যে ইউরোপের মতোই সম্পদ ও শক্তি ও উন্নতির অবতারণা ঘটাব। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর ভারতবাসী আমরা সেই ইউরোপের ধার করা লক্ষ্য ও আদর্শ ও পদ্ধতিকে বর্জন করছি, উনবিংশ শতাব্দীর ব্যর্থতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে। বর্তমানকেই আমরা পূজ্যবিগ্রহ ক'রে তুলতে চাইনা; আমরা দেখি অতীতকে ও ভবিষ্যৎকে, অতীতের সুমহান ইতিহাস যা ছিল ও ভবিষ্যতের যে অতুলনীয় ইতিহাসকে নিয়তি এর জন্য প্রস্তুত ক'রে আনছে, সেই দিকেই রয়েছে আমাদের দৃষ্টি।

এ-কথা আমরা বিশ্বাস করি না যে সংখ্যা বাড়িয়ে শাসন পরিষদকে বড়ো ক'রে, নতুন নির্বাচন রীতির অবতারণা ক'রে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এনে, বা অন্য কোনোরূপ ইউরোপীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা আমাদের মুক্তি মিলবে। এগুলির মধ্যে কতক কতক জিনিস যে সংগ্রামের অস্ত্র রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে সে কথা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমরা বলি যে যন্ত্র বা আদর্শ রূপেও তা যথেষ্ট নয়, এবং শেষ পর্যন্ত তার ফল সামান্য মাত্র ব্যতীত বিশেষ কিছু হবেনা। আমাদের অন্তিম নিয়তি যদি হতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটা প্রতিপালিত দেশ মাত্র হয়ে থাকা, কিংবা ইউরোপীয় সভ্যতার মুখ চাওয়া তাঁবেদার হয়ে থাকা, তাহলে ওতেই যথেষ্ট হতে পারত। কিন্তু ঐরূপ কোনো ভবিষ্যতের জন্য এত ত্যাগ স্বীকারের কিছু মূল্য আছে বলে আমরা মনে করি না। অপর পক্ষে আমরা এই কথা বিশ্বাস করি যে ভারত তার নিজস্ব স্বাধীন জীবনকে ও নিজস্ব সভ্যতাকে পুনর্বিকশিত ক'রে সারা জগতের অগ্রণী হয়ে—ইউরোপ আজ পর্যন্ত যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ও নৈতিক সমস্যার সমাধান করতে অসমর্থ হয়েছে সে তার সার্থক সমাধান ঘটাবে, ইউরোপ তার আপন ব্যগ্রতায় প্রচেষ্টার পর প্রচেষ্টা ক'রে ও পরীক্ষার পর পরীক্ষা ক'রে ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা এনে যাকে বলে উন্নতি, তার পরিবর্তে প্রকৃত উন্নতির পথ সে দেখাবে। আমাদের লক্ষ্যও যত বড়ো সে লক্ষ্যে পৌছবার উপায়ও তত বড়ো হওয়া চাই, এবং সে উপায়কে আবিষ্কার করতে ও যথোচিত ভাবে প্রয়োগ করতে হলে

আমাদের নিজেদের মধ্যে যে শক্তির শাশ্বত উৎস রয়েছে তাকে খুঁজে বের করা চাই।

এখন আমাদের মনে হয়না যে দেশের চলতি মেশিনকে পাল্‌টে দিয়ে আমাদের সমাজকে ইউরোপের নকলে দাঁড় করাতে পারলেই সামাজিক নবসংস্কার ঘটে যাবে। সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, বর্ণপার্থক্যের বদলে ছোটো বড়োর স্তরভেদ এনে ফেলা, বেশি বয়সে বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের প্রবর্তন করা, জাতিভেদ না মেনে একত্রে আহার করা প্রভৃতি যে সব জিনিস সমাজ সংস্কারকরা এখানে আনতে চাইছে, তা কেবল বাহ্যিক ও যন্ত্রবৎ পরিবর্তন মাত্র, তার দোষ বা গুণ যাই কেন থাক, তাতে জাতির আত্মাকেও বাঁচাতে পারবেনা বা তার অবনতি ও পতনও থামাতে পারবেনা। হৃদয়ের তেজই কেবল বাঁচাতে পারে, হৃদয়ে যদি আমরা মুক্ত ও বৃহৎ হতে পারি তবেই রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়েও মুক্ত ও বৃহৎ হতে পারব।

পাশ্চাত্ত্য হতে আমদানি সংকীর্ণ ও নীচু দরের ধর্মভাবকে নিয়ে তারই আওতাতে নতুন নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করার দ্বারা, কিংবা অপর পক্ষে হিন্দুত্বের বাহ্য চেহারা ও বাহ্য পোষাককেই প্রাধান্য দেবার দ্বারা আমরা আমাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য ও শক্তি ও মহিমাকে ফিরিয়ে আনতে পারবনা। জগৎ চলেছে এক নির্বাধ চিন্তা ও বস্তুতান্ত্রিকতার অপরিহার্য ধারাকে অতিক্রম ক'রে ধর্মচিন্তা ও ধর্মানুভূতির এক নবতর সংশ্লেষণের দিকে, এমন এক নতুন উদার ও সর্বগ্রাহ্য জাগতিক শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতাপূর্ণ ধর্মজীবনের দিকে, যা সকল ধর্মকেই সমান বলে মেনে নেবে, কারণ সবের মধ্যেই রয়েছে সেই অদ্বিতীয় একের উপর আস্থা। জগতের আত্মা সেই ধর্মের দিকেই যেতে চাইছে যার মধ্যে বিজ্ঞানও থাকবে বিশ্বাসও থাকবে, ঈশ্বরবাদও থাকবে, খ্রীষ্টধর্ম ও মুসলমান ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মও থাকবে, অথচ তার মধ্যে বিশেষ ক'রে কোনোটাই নয়।...এই সনাতন ধর্মে রয়েছে অনেক শাস্ত্রাদি, বেদ, বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, আর বাইবেলকে বা কোরাণকেও তা প্রত্যাখ্যান করে না ; কিন্তু প্রকৃত ও সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র রয়েছে হৃদয়ের মধ্যে, যেখানে এক শাশ্বত স্বয়ং অধিষ্ঠান করেন। আমাদের নিজেদের আভ্যন্তর আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্যেই জগতের সকল শাস্ত্রের প্রমাণ ও উৎসের সন্ধান পাবো, আমরা সেখানেই পাবো জ্ঞানের ও প্রেমের ও আচরণের বিধান, তাই হবে কর্মযোগের ভিত্তি ও প্রেরণা।

সুতরাং আমাদের লক্ষ্য হলো সমগ্র মানবজাতির জন্যই ভারতকে গড়ে তোলা—এই হলো আমাদের জাতীয়তাবাদের মর্ম কথা, আর এই লক্ষ্যকেই আমরা অনুসরণ করছি। মানবজাতিকে সম্বোধন ক'রে আমরা বলতে চাই, 'এবার সেই সময় এসেছে যখন তোমাদের একটা মস্ত ধাপ পার হয়ে এখানকার এই বস্তুসর্বস্ব অস্তিত্বের চেয়ে আরো কিছু উচ্চতর, গভীরতর, উদারতর জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যে সকল সমস্যা মানুষকে নিরন্তর পীড়িত করছে তা কেবল ভিতরের রাজ্যকে জয় করলেই মিটতে পারে, প্রকৃতির শক্তিগুলিকে শুধু স্বার্থের কাজে লাগিয়ে নিজেদেব আরাম ও বিলাস বাড়িয়ে গেলেই তা মিটবেনা, কাজে লাগাতে হবে ভিতরকার বুদ্ধিবৃত্তিকে ও প্রাণশক্তিকে, ভিতরে বাহিরে মানুষের মুক্তিকে মেনে নিয়ে ও ভিতরের দিক থেকে বাহ্য প্রকৃতিকে জয় ক'রে। এই কাজের জন্যেই এশিয়ার পুনরুত্থান প্রয়োজন, তাই এশিয়া এখন উঠছে। এই কাজের জন্যই ভারতের মুক্তি ও মহত্ত্বের বিকাশ অপরিহার্য, সেই কারণেই ভারত চাইছে তার অভীপ্সিত মুক্তি ও মহত্ব, এবং তা কেবল সমগ্র মানব জগতের কারণেই, ইংলণ্ডও তার থেকে বাদ নয়। সেইজন্যই তার এই দাবির সে সম্পূর্ণরূপে পূরণ চায়।"

আর আমরা আমাদের নিজেদের জাতিকেও এই কথা বলি, 'ভগবানের ইচ্ছা যে আমরা হবো আমরাই, আমরা যেন ইউরোপ না হই। এ-যাবৎ আমরা জীবনে বাঁচতে চেয়েছি অন্যের জীবনের ধারাতে, নিজেদের ধারাতে নয়। জীবনের উৎসকে ও শক্তিকে ফিরে পেতে আমাদের নিজেদের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। জানতে হবে আমাদের অতীতকে, তাকে আবিষ্কার করতে হবে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য। আমাদের কাজ হলো আগে নিজেদেরকে উপলব্ধি করা এবং সব কিছুকেই ভারতের চিরন্তন জীবনের ও প্রকৃতির ছাঁচে গড়ে আনা। সুতরাং কর্মযোগ-এর উদ্দেশ্য হবে আমাদের ধর্মের, সমাজের, দর্শনের, রাজনীতির, সাহিত্যের, ললিতকলার, আইনবিধির, বিজ্ঞানের, সব কিছুই যা ছিল এবং আছে তার হৃদয়ে প্রবেশ ক'রে তাকে অধ্যয়ন করা, যাতে আমরা নিজেদের দেশের সকলকে বলতে পারি, 'এই হলো আমাদের ধর্ম।' ইউরোপীয় সভ্যতাকে আমরা যাচাই করব সম্পূর্ণ ভারতীয় চিন্তা ও জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, পাশ্চাত্যের কর্তৃত্বজাত প্রভাবকে দূর ক'রে ; ওদের থেকে যা নেবার তা ভারতীয় হয়েই নেবো, আর ধর্মকে আবিষ্কার ক'রে কেবল তা মুখেই ব্যক্ত করবনা কিন্তু নিজেদের জীবনের

মধ্যেও গ্রহণ করব, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেতে, সামাজিক জীবনেতে, এবং রাজনৈতিক প্রচেষ্টাতেও।'

প্রত্যেক ব্যক্তিকে ও বিশেষত নবোত্থিত তরুণ যুবকদের আমরা বলি, ভারতের কাজ করো, জগতের কাজ করো, ভগবানের কাজ করো: 'যদি তোমরা নিজেদের মনকে ইউরোপীয় ভাবাপন্ন ক'রে রাখো আর জীবনকে দেখ বস্তুতন্ত্রের দৃষ্টিতে, তাহলে ঐরূপ আদর্শ তোমরা রক্ষা করতে পারবেনা। বাস্তবের দিক থেকে তোমরা কিছুই নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিকের দিক থেকে সব কিছু।......আগে তাহলে হয়ে যাও ভারতীয়। পূর্বপুরুষদের সম্পদকে উদ্ধার করো। আর্য চিন্তা, আর্য-আচরণ, আর্য-চরিত্র, আর্য-জীবনকে ফিরিয়ে আনো। বেদান্তকে, গীতাকে, যোগকে পুনরুদ্ধার করো, কেবল বুদ্ধি বা ভাবের দিক দিয়ে নয়, কিন্তু আপন জীবনের মধ্যে। জীবনের মধ্যে তা গ্রহণ করলে তখন তোমরা হয়ে দাঁড়াবে মহৎ ও তেজস্বী, শক্তিমান ও অজেয়, সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত। জীবন বা মৃত্যু কোনোটাকেই আর ভয় করবেনা। কঠিন কথা বা অসম্ভব কথা,—এগুলো তোমাদের ভাষা থেকেই মুছে যাবে। কারণ প্রাণশক্তি চিরন্তন হয়ে আছে তোমাদের আত্মার মধ্যে, তোমাদের নিজেদের সেই আভ্যন্তরীণ স্বরাজ ফিরে পাওয়া চাই, তবেই তারপরে বাইরের সাম্রাজ্য ফিরে পাবে। সেখানেই বিরাজ করছেন ভারতমাতা, তিনি অপেক্ষা করছেন তোমাদের পূজা নিতে, যাতে তোমাদের মধ্যে শক্তি প্রেরণ করতে পারেন। তাঁর উপর আস্থা রাখো, তাঁর সেবায় লাগো, নিজেদের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার মধ্যে ডুবিয়ে দাও, নিজেদের অস্তিত্বকে দেশের বৃহত্তর অস্তিত্বের মধ্যে, নিজেদের স্বতন্ত্র স্বার্থকে মানব জাতির সেবার মধ্যে উৎসর্গ ক'রে দাও। শক্তির মূলকে নিজেদের মধ্যে আবিষ্কার করো, তখন সব কিছুই মিলবে; সামাজিক স্থিতি, বুদ্ধির দীপ্তি, রাজনৈতিক মুক্তি, চিন্তার উপর দখল, জগতের মনুষ্যোচিত গুণগুলি কোনো কিছুই বাদ যাবেনা।'"

কর্মযোগ

"কর্মযোগ অর্থে আমরা বলি বেদান্তকে ও যোগকে জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। যারা হিন্দুত্বের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করেছে পরের মুখে শুনে, তাদের কাছে এই সংজ্ঞা ঠিক নয় বলে সন্দেহ হতে পারে। "ব্যবহারিক"-প্রকৃতির

মন যাদের তারা বলবে যে বেদান্তকে জীবনের পরিচালক করা ও যোগকে আধ্যাত্মিক মিলন লাভের উপায় বলে গ্রহণ করা খুবই বিপজ্জনক, কারণ ওতে মানুষকে সকল কর্ম থেকে নৈষ্কর্ম্যের দিকেই নিয়ে যায়। যারা এই সকল বিশ্বাসকে বলে ধোঁয়াতত্ত্ব, আত্মমোহ বা বুজরুকি, তাদের কথা বাদই দিলাম; কিন্তু যাদের মধ্যে ভক্তি আছে ও হিন্দুত্বের উচ্চ তত্ত্বগুলিকে যারা বিশ্বাসও করে, তাদের মধ্যেও এই ধারণা রয়েছে যে আধ্যাত্মিক জীবনে যেতে হলে মানবীয় সকল কাজকর্মকে একেবারে ছেড়ে চলে আসতে হবে। অথচ আধ্যাত্মিক জীবন সব চেয়ে সার্থক ভাবে প্রকাশ পেতে পারে সেই মানুষেরই মধ্যে যে যোগের শক্তি নিয়ে ও বেদান্তকে অনুসরণ ক'রে নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতোই জীবন যাপন করছে। আভ্যন্তরীণ জীবন ও বাহ্য জীবনের এমনি সংযোগের ফলেই মানুষ শেষ পর্যন্ত পরম শক্তিমান ও দিব্য হয়ে উঠবে। এ কথা মনে করা খুবই ভুল যে বেদান্তে জীবনের কোনো প্রেরণা নেই বা জীবন যাপনের কোনো বিধি নেই, তা কেবলই আধ্যাত্মিক মার্গের ও নীরবতা সাধনের জিনিস। তৎপরিবর্তে বরং উপনিষদে ও গীতাতে যে সব শিক্ষা রয়েছে তার মধ্যে মানুষের সাধ্য সর্বোচ্চ নীতিগুলিরই ভিত্তি ও যুক্তি মিলবে। গীতায় যে বিশেষ রকমের ধর্মের প্রচার করা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে জীবনের ধর্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়, আর বেদান্ততেও জীবনেরই প্রস্তুতির কথা রয়েছে, কারণ কেবল জীবনের ভিতর দিযেই অমরত্ব লাভ করা যায়। এর বিরুদ্ধ মতটা যে এমন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা আমাদের জাতির পূর্ব ইতিহাস ও সেই দিকে প্রবণতা থাকাব কারণে। আমাদের ধর্মের শেষ লক্ষ্য হলো বস্তুপ্রকৃতির বন্ধন থেকে ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি, আর সর্বোচ্চ স্তরের আত্মারা খুব শীঘ্র সেই লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবার জন্য পরম শুদ্ধি লাভ করতে জীবন থেকে এবং দৈহিক সকল ক্রিয়াকলাপ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতেন। সাধারণ স্তরের উপরে উঠে পর্বতশৃঙ্গের চূড়াতে দাঁড়িয়ে তাঁরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, সকলেই তাই এটা ধরে নিয়েছিল যে এমনি সর্বকর্ম নিবৃত্ত হয়ে থাকাই বুঝি হিন্দুধর্মের চূড়ান্ত আদর্শ। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ যোগী বলেছেন তাকেই যে তার আপন প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পরেও জীবনে মনুষ্যোচিত সকল কাজে রত থাকবে, যাতে লোকে অন্যরূপ দৃষ্টান্ত দেখে তাকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা ভেবে নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে গণ্ডগোল না পাকায়। আদর্শ যোগী আপন শক্তিকে নিবৃত্ত ক'রে চুপ ক'রে বসে থাকবেনা। সে

তার দিব্য শক্তিকে জগতে সঞ্চালিত ক'রে দেবে অথবা মানবজাতির অগ্রণী নেতাস্বরূপ হয়ে তাদের জীবন সংগ্রামে প্রেরণা দেবে, কিন্তু নিজে সকল কর্মের বন্ধন হতে বিমুক্ত থাকবে এবং ব্যক্তি-অহং-এর উর্ধ্বে উঠে যাবে।

আর বেদান্ত বলতে নিছক অদ্বৈতবাদ বলেই জানা আছে এবং চূড়ান্ত সন্ন্যাসী শঙ্কর আপন তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে এর ভাষ্যের দ্বারা এর থেকে এক অদ্ভুত মায়াবাদ প্রচার করেছেন। কিন্তু শঙ্করের সেই ভাষ্য বা ব্যাখ্যা নিয়ে এখানে কথা নয়। বৈদান্তিকের পক্ষে প্রকৃত শাস্ত্র হলো মূল উপনিষদগুলি। শঙ্কর উপনিষদের যে সংশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন তা খুব যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য হলেও তথাপি তা অস্থায়ী জিনিস মাত্র। তাঁর পূর্বে অনেকেই এমন অনেকরূপ ব্যাখ্যা করেছিলেন যার দ্বারা জাতির মন যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল, এবং ভবিষ্যতেও যে ওর অপেক্ষা আরো ভালো ব্যাখ্যা মিলবেনা এমন কথা বলা যায় না। জীবনের কাজগুলিকে উদারভাবে অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়ে তেমন অন্যরূপ অর্থে সংশ্লেষষেণরই সূত্রপাত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। এখন যে কাজ আভাসে মাত্র শুরু হয়েছে, তা হলো সেই আগেকার কালে বুদ্ধ যখন ভারতে আর্য জাতিদের কাছে তাঁর দর্শন ও নীতির অনুশাসন প্রচার করেছিলেন এবং ছোট ছোট সমস্যার সমাধানের দিক দিয়ে তা সর্বত্র খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়েছিল, তারই ব্যাপক পুনরাবর্তন। তখনও তেমনি মানবরূপী ভগবানের কোনো পূর্ণ অবতার বা দিব্য শক্তির প্রবল অভিব্যক্তি স্বরূপ কোনো বিভূতি মানবজাতির মধ্যে নেমে এসে তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়ার সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যেই এনে দিয়েছেন পরম আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও প্রাণশক্তি। কিন্তু এখন আর তা সেই বৌদ্ধযুগের মতো কোনো একটা সুদিব্য অংশমাত্র নয়, সম্পূর্ণ আলোটাই এসে বৈদান্তিক নীতিবাদটাকেই ব্যক্ত করছে, কিন্তু বেদান্তের মূল সত্যটাকে বাদ না দিয়ে। তার ফলে তখনও যেমন হয়েছিল এখনও তেমনি হবে, অর্থাৎ জগতে এমন এক রাজনৈতিক ও সামাজিক ও নৈতিক বিপ্লব দেখা দেবে যাতে ভারতই হয়ে দাঁড়াবে সকল জাতির গুরু, এবং সে তার এই আলো সভ্য জগতের সর্বত্র বিতরণ করে জগতের চিন্তা ও ভাবরাজ্যকে তারই ছাঁচে গড়ে তুলবে এক জীবন্ত শক্তির প্রকাশরূপে। বেদান্ত ও যোগ ইতিমধ্যেই এশিয়া মহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে আমেরিকা ও ইউরোপের জীবন ও কর্মধারাকে প্রভাবিত করছে, আর অনেককাল থেকেই শত শত পরোক্ষ উপায়ে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার মধ্যে

তা অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু তথাপি তা কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্তঃশীলা প্রবাহিনীর ক্রিয়া মাত্র। জগৎ অপেক্ষা ক'রে আছে ভারতেব পুনরুত্থানেব জন্য, যাতে এই দিব্য জ্ঞানধারা তার পূর্ণ প্লাবনে জগৎ জুড়ে প্রবাহিত হতে পারে।

যোগ মানে ভগবানের সঙ্গে সংযোগ, জ্ঞানের বা প্রেমের বা কর্মের দিক দিয়ে। মানুষের ভিতরে ও বাহিরেও যিনি সর্বজ্ঞাতা ও সর্বশক্তিমানরূপে বিরাজ করেন, যোগী সেই অন্তর্বাসীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করেন। অনন্তের সঙ্গে এক সুরে মিলে গিয়ে তিনি তাঁর আধার মাত্র হয়ে যান, যাতে ভগবানের শক্তিধারা তারই মাধ্যমে জগতে স্নিগ্ধ কৃপারূপে বা সক্রিয় অবদান-রূপে প্রবাহিত হতে পারে। কেউ যখন আমিত্বের পঙ্কবাস পরিত্যাগ ক'বে অন্যেদের সুখদুঃখের দিকে চেয়ে তাদের জন্যই জীবনধারণ করতে শুরু করে—যখন সে পূর্ণ উদ্যমে তার কর্মগুলি নিখুঁতভাবে ও সপ্রেমে ক'রে যায় কোনো ফলের আশা না ক'রে, এবং সাফল্যের জন্য উৎসুক না হয়ে বা ব্যর্থতাকে আশংকা না ক'রে—যখন সে তার সকল কথা ও কাজ ও কর্মকে ভগবানেব বেদীতলে নিবেদন ক'রে দিতে থাকে—যখন ভয়, ঘৃণা, বিরক্তি ও আসক্তিকে বিসর্জন ক'বে প্রকৃতির মতো অবহেলে ও বিনা ব্যতিক্রমে বিনা বিরামে আপন কাজগুলি ক'রে যেতে থাকে—যখন সে আপন দেহ মন বা হৃদয়কে বা ওর সমষ্টিকে 'আমি' ভাবতে থাকার উর্ধ্বে উঠে আপন প্রকৃত আত্মাকে দেখতে পায়—যখন সে মৃত্যুকে মিথ্যা জেনে নিজের অমরত্ব অনুধাবন করে—যখন জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজকে যন্ত্রমাত্র জেনে বুঝতে পারে যে ভগবৎ শক্তিই তার বাক্য মন ও ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়ে অবাধে ক্রিয়া করছে—যখন সে নিজের সর্বস্বকে পরম প্রেমিক ও পরম সহায় ভগবানে একান্তভাবে সমর্পণ ক'রে দিয়ে তাঁরই মধ্যে সর্বক্ষণ অধিষ্ঠান করতে থেকে সকল দুঃখ শোক ও মিথ্যা উদ্বেগাদির অতীতে চলে যায়—তখন তাই হয় আসল যোগ। প্রাণায়াম, আসন, নিদিধ্যাসন, উপাসনা, উৎসব, ধর্মীয় তাবৎ অনুষ্ঠানাদি সব কিছুই কেবল যোগের উপায় মাত্র, কিন্তু তা আসল যোগ নয়। আর যোগের পথও যে খুব কঠিন বা বিপজ্জনক তাও নয়, যে তার আভ্যন্তরীণ গুরুকে আশ্রয় ক'রে থাকে তার কাছে খুবই সহজ ও নিরাপদ। সকল মানুষেরই মধ্যে এর সামর্থ্য অন্তর্নিহিত হয়ে আছে, এমন কেউ নেই যার প্রকৃতিতে সমুচিত সামর্থ্য অথবা বিশ্বাস অথবা প্রেম প্রকট কিংবা অপ্রকট অবস্থায় নেই,

র যোগী হবার পক্ষে এর কোনো একটা থাকলেই যথেষ্ট। সকলেই অবশ্য জন্মের মধ্যে এ পথের চূড়ান্তে গিয়ে পৌছতে পারেনা, কিন্তু অগ্রসর হয়ে তে সকলেই পারে; আর যে যতখানি অগ্রসর হয়ে যায় সেই অনুযায়ী ততখানি শান্তি ও শক্তি ও আনন্দের অধিকারী হয়। আর বিশেষত ধর্মের অল্পমাত্রও কোনো ব্যক্তিকে বা জাতিকে মহাভয় হতে রক্ষা করে, মপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'।

আবার বলি, আধ্যাত্মিকতা যে জীবন থেকে স্বতন্ত্র কিছু, এ কথা মনে াই ভুল। ঈশোপনিষৎ বলেন, 'ত্যাগের দ্বারা সব কিছু উপভোগ করো। র পরের ধনে লোভ কোরো না। জগতে তোমার কাজ ক'রে যাও আর তায়ু হও; এছাড়া কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আর কোনো পথ নেই।' কথা মনে করাই ভুল যে ধর্মের চূড়ায় যেতে হলে সংসারের সংগ্রামকে রিত্যাগ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পুনঃ পুনঃ বলেছিলেন সংগ্রাম রতে, 'যুদ্ধ করো, আর শত্রুর নিপাত করো,' 'আমাকে স্মরণ রেখে যুদ্ধ রে যাও,' "সর্ব কর্ম আমাতে সমর্পণ ক'রে হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতা আনো, ামনাবিহীন ও স্বার্থশূন্য হয়ে যুদ্ধে নামো। তোমার ক্লৈব্য দূর হয়ে যাক।' কথাও মনে করা ভুল যে ধার্মিক ব্যক্তি যদি তার সাধারণ কাজকর্ম ছেড়ে দেয়, তথাপি সে ক্রমশ এমন সাত্ত্বিক সাধু ভক্তিমান বা নির্বিকার হয়ে পড়ে। জগতের রুক্ষ ও কঠোর কর্তব্যগুলি করার পক্ষে সে অনুপযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তাতে একথার সম্পূর্ণ উল্টো রকমের জবাব দেওয়া হয়েছে,—'যে ব্যক্তি াপন মনের ভিতর থেকে অহং ত্যাগ করতে পেরেছে, যে ব্যক্তির অন্তরাত্মায় র কৃতকর্মের কোনো দাগ পড়েনা, সে যদি সমগ্র জগৎকে হনন করে তথাপি হত্যার দোষ তাকে স্পর্শ করেনা এবং কোনো কিছুই তাকে বাঁধতে পারেনা।' কুক্ষেত্রের ধ্বংসলীলার মধ্যে অর্জুনের রথ চালনা করছেন স্বয়ং ভগবৎ সারথী; ই হলো কর্মযোগেরই চিত্রের রূপক বর্ণনা; এখানে দেহ হলো রথ, ইন্দ্রিয়াদি লা রথের অশ্বগুলি, আর তাকে জগতের রক্তাক্ত ও কর্দমাক্ত ক্ষেত্রের ভিতর য়ে সাথীরূপে চালনা ক'রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষের আত্মাকে বৈকুণ্ঠের দিকে য়ে যাচ্ছেন।"

* * *

১৯০৯ সালে শ্রীঅরবিন্দ বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে বক্তৃতা রেন; কারণ হুগলিতে দুই বিরুদ্ধ দলের মধ্যে আপোষ হওয়াতে দুই দলই

ওতে যোগ দিয়েছিল, যদিও কংগ্রেসের স্থান যে কেন্দ্রীয় নরমপন্থীর দ অধিকার করেছিল তার মধ্যে জাতীয়তাবাদীদের কোনো প্রতিনিধি স্থা পায়নি। শ্রীসুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য শ্রীঅরবিন্দকে এবং আরো দু একজ জাতীয়তাবাদীকে নিয়ে ইতিপূর্বে বারানসীর ঘরোয়া বৈঠকে চেষ্টা করেছিলে দুই দলের মিলন ঘটাতে, যাতে নরমপন্থীদের প্রতাপান্বিত দক্ষিণ জোটে বিরুদ্ধে তিনি এরূপ মিলিত ভাবে লড়তে পারেন; কারণ তিনি চাইছিলে যে চরমপন্থীদের ডান হাত স্বরূপ ক'রে নিয়ে আবার তিনি যুক্ত বাংলা নেতা হয়ে দাঁড়ান; কিন্তু তার জন্য বাংলার নরমপন্থীদের পক্ষ থেকেই চরমপন্থ প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া এবং সুরাট কংগ্রেসের নির্দেশ মেনে নেও দরকার। শ্রীঅরবিন্দ এতে রাজী হলেন না; তিনি বললেন যে কংগ্রেসে সংবিধান বদলানো হোক, যাতে জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীন ভাবে নিজেবা তাদের প্রতিনিধি বেছে সর্বভারতীয় সম্মেলনে পাঠাতে পারে। এতেই বৈঠ ব্যর্থ হয়ে ভেঙে গেল। শ্রীঅরবিন্দ তখন চেষ্টা শুরু করলেন কেমন ক'রে এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতীয়তার আন্দোলন পুনরায় উজ্জীবিত ক'রে তোল যায়। তিনি আনি বেসান্তের 'হোম রুল' আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছিলে কারণ সরকারের তরফ থেকে বেসান্তকে দমন করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু তা পরে বেসান্ত নিজেও বুঝেছিলেন যে ওতে প্রকৃত স্বাধীনতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে হয়, কাজেই তা বন্ধ ক'রে দিতে হলো। তিনি তীব্রভাবে নিষ্ক্রি প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করার কথাও ভেবে দেখেছিলেন, যে উপায় গান্ধীজ পরে অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভেবে দেখলেন যে নিজে তিনি তা নেতা হতে পারেন না।

তখনকার গভর্ণমেণ্ট যে ফাঁকিদারী শাসন সংস্কার দিতে চেয়েছিল তাকে শ্রীঅরবিন্দ কোনোদিনই সমর্থন করেন নি। চিরদিনই তিনি ঘোষণা ক'রে এসেছেন "আপোষ চলবেনা।" আর এখন তিনি তাঁর "কর্মযোগীন্" পত্রিকাতে দেশের লোকদের জন্য যে খোলা চিঠি প্রকাশ করলেন তাতেও বললে "ক্ষমতার হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত সহযোগিতা কোরোনা।" যদি নির্বাচি বিধানমণ্ডলীর জনপ্রিয় মন্ত্রীদের হাতে প্রকৃত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষমতাগুলি অর্পণ করা হয় তবেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বোঝাপড়া করা চলতে পারে। এর কোনো লক্ষণ কিন্তু দেখা গেলনা, পে মণ্টেগু রিফর্মের প্রস্তাবে প্রথম ঐ ধরণের কিছু সাড়া পাওয়া গেল। তিনি

াগেই জানতেন যে জাতির আস্পৃহা মেটাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে অর্ধেক
থ নেমে আসতেই হবে, কিন্তু তার সময় না আসা পর্যন্ত তিনি তার প্রত্যাশা
রেননি। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরি প্রয়াণের নয় বছর পরে মণ্টেগু রিফর্ম এসে
পস্থিত হলো, কিন্তু তখন তিনি সমস্ত রাজনৈতিক বাহ্যক্রিয়া পরিত্যাগ
রে তাঁর আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে নিযুক্ত হয়েছেন। তখন তিনি ভারতের
াধীনতা প্রচেষ্টার উপর কেবল তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিই প্রয়োগ করছেন,
ার পরে তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সফল হয়ে ক্রিপস্ প্রস্তাবের দ্বারা ব্রিটিশ
ভর্ণমেণ্টের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের প্রথম বোঝাপড়া শুরু হলো এবং তার
রে অন্যান্য সব কিছু এসে পড়ল।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট শ্রীঅরবিন্দকে সরিয়ে দেবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে
ঠ, কারণ তাদের দমন নীতির বিরুদ্ধে তিনিই ছিলেন একমাত্র প্রবল
ধাস্বরূপ। ভগিনী নিবেদিতা একথা জানতে পারেন এবং শ্রীঅরবিন্দকে
ামর্শ দেন ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ ক'রে যেতে, যেহেতু আন্দামানে পাঠাতে না
রে তারা ওঁকে অন্তরীণে পাঠাবার চেষ্টা করছে, তাই তিনি পরামর্শ দেন যে
দর এলাকার বাইরে থেকে কাজ করতে, যাতে কোনো বাধা না ঘটতে
রে। শ্রীঅরবিন্দ তখন নিজের স্বাক্ষর দিয়ে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকাতে
শের জন্য তাঁর 'শেষ উইল' নামক একটি প্রবন্ধ লিখলেন, যার ফলে অন্তরীণে
ঠাবার কোনো প্রশ্নই আর উঠবেনা বলে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু
অবস্থা যখন আর রইলনা, তখন গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা ক'রে সুযোগ খুঁজতে
গল যে কিসে তাঁকে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করা যায়। শুধু
জনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখাতে ওদের হাতে তার উপযুক্ত
যোগ মিলে গেল। সেই প্রবন্ধটি যথেষ্টই নরম ও নির্দোষ ছিল, এবং পরে
কোর্ট থেকে সে অভিযোগ নাকচ ক'রে দিয়ে পত্রিকার মুদ্রাকরকে মুক্তিও
হয়েছিল। একদিন রাত্রে কিন্তু 'কর্মযোগিন্' অফিসে শ্রীঅরবিন্দ খবর
লন যে পত্রিকার অফিস তল্লাসী করা হবে এবং শ্রীঅরবিন্দকে বন্দী করা
তিনি যখন ভাবছিলেন যে অতঃপর কি করা যায়, তখন অকস্মাৎ উপর
ক স্পষ্ট নির্দেশ পেলেন যে তুমি ফরাসী ভারতে চন্দন-নগরে চলে যাও।
ক্ষণাৎ তিনি সে আদেশ পালন করলেন, কারণ এসময়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে
বৎ নির্দেশেই চালিত হচ্ছিলেন, তার থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত হতেন না।
ই তিনি কারো সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে দশ মিনিটের মধ্যে গঙ্গার ঘাটে

গিয়ে ভাড়া করা নৌকাতে উঠে বসলেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চন্দন নগ
পৌঁছে সেখানে সম্পূর্ণ গোপনবাসে রইলেন। যাবার সময় ভগিনী নিবেদিতা
খবর পাঠিয়ে দিলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে যেন তিনি 'কর্মযোগিন্' পরিচালনা
ভার নেন। এইখানেই দুটি পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গে
চন্দননগরে থাকতে তিনি সব কিছু তৎপরতা ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নির্জনে
ধ্যানে মগ্ন রইলেন। তার পরে তাঁর কাছে আবার নির্দেশ এলো, এখান থে
পণ্ডিচেরি চলে যেতে। উত্তর পাড়ার কয়েকজন বিপ্লবী যুবকের দ্বারা এ
নৌকাতে চালিত হয়ে তিনি কলকাতায় এলেন; এখান থেকে 'ডুপ্লে' জাহা
চড়ে তিনি পণ্ডিচেরিতে পৌঁছলেন এপ্রিল ৪, ১৯১০ তারিখে।

৪

পণ্ডিচেরিতে—নূতন জগৎ

এই পণ্ডিচেরিতে এসে তারপর থেকে শ্রীঅরবিন্দের যোগ সাধ
উত্তরোত্তর গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠল। রাজনৈতিক গণআন্দোলনে
সঙ্গে সকল সংস্রবই তিনি পরিত্যাগ করলেন, নবগঠিত জাতীয় কংগ্রেসে
সভাপতিত্ব করার আহ্বান বারে বারে প্রত্যাখ্যান করলেন, এবং দৃঢ়সংক
করলেন যে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ ব্যতীত সাধারণের কাছে কোনো কথাই তি
বলবেন না বা কিছুই লিখবেন না। পরে তিনি "আর্য" পত্রিকাতেই কে
লিখেছিলেন। কয়েক বছর যদিও দুই একজন ব্যক্তির মারফতে বিপ্লবীদে
সঙ্গে কিছু গোপন পত্রালাপ মাত্র করেছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে
ছেড়ে দিলেন। সুতরাং রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপেই ঘুচে গে
তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি যখন ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠল, তখন তিনি দেখলেন
ভগবৎশক্তির ক্রিয়া যেমনভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে ভারতের স্বাধীন
লাভ অবধারিত। ভারতীয় প্রতিরোধের চাপে ও আন্তর্জাতিক ঘটনাব
চাপে ব্রিটেনকে শেষ পর্যন্ত এদের স্বাধীনতা ছেড়ে দিতেই হবে, সে বিষ
অগ্রসর হতে গিয়ে আপাতত যতই গড়িমসি করুক। তিনি এটা বুঝ
পারলেন যে সশস্ত্র বিদ্রোহের আর প্রয়োজন হবে না, এবং তার জন্য
গোপন আয়োজন চলছিল তা এখন থেমে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই, যদি

বিদ্রোহের আবহাওয়াটি বরাবর বজায় রাখতে হবে। সুতরাং এখন তাঁর রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য নয়। তদ্ভিন্ন তাঁর আধ্যাত্মিক কার্যের ক্ষেত্র উত্তরোত্তর প্রসারিত হতে থাকায় তিনি স্পষ্টই অনুভব করলেন যে এখন তাঁর ঐদিকেই পূর্ণরূপে একাগ্র হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। তাই যখন আশ্রমটি স্থাপিত হলো তখন তাকে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক সংস্রব থেকে সম্পূর্ণরূপেই বিমুক্ত রাখলেন; এমন কি পরবর্তী কালে যখন বিশেষ কারণে দুইবার তাঁকে রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করতে হয়েছিল তখন তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবেই তা করেছিলেন, আশ্রমের দিকের কোনো সম্পর্কই তাতে ছিলনা। ব্রিটিশ সরকার এবং আরো অনেকে এটা বিশ্বাসই করেনি যে শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি পরিত্যাগ করেছেন, তারা ধরে নিয়েছিল যে তিনি গোপনে গোপনে বিপ্লবের কাজে লেগে আছেন আর ফরাসী ভারতের আওতার মধ্যে থেকে কোনো গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলছেন। কিন্তু এগুলি সম্পূর্ণ কল্পনাজাত গুজব মাত্র, এর মধ্যে সত্য কিছুই ছিল না। তিনি বাস্তবিকই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সমস্তই ছেড়ে দিয়ে ১৯১০ সাল থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্জনবাসেই সরিয়ে রেখেছিলেন।

কিন্তু তার মানে এই নয়, যেমন অনেকে ভেবেছিল, যে তিনি আধ্যাত্মিক অনুভূতির উচ্চ মার্গে প্রয়াণ ক'রে জগতের অবস্থা ও ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো কিছুই আর গ্রাহ্য করেন না। তাঁর যোগের উদ্দেশ্যই এমন ছিলনা যে কেবল ভগবৎ সিদ্ধিলাভ ক'রে পূর্ণ আধ্যাত্মিক চেতনা অর্জন করাই যথেষ্ট হবে, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যে জীবনের ও জগতের যাবতীয় কর্মকে সেই আধ্যাত্মিক চেতনার অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিতে হবে, এবং সমগ্র জীবনেরই একটা আধ্যাত্মিক সার্থকতা থাকবে। সেই নিরালা আশ্রয়ের মধ্যে থেকে শ্রীঅরবিন্দ সর্বদাই লক্ষ্য করতেন যে ভারতে ও সমগ্র জগতে কোথায় কি ঘটছে, এবং প্রয়োজন হলে আপন নীরব অধ্যাত্ম শক্তিকে সেখানে প্রয়োগও করতেন; কারণ যোগের শক্তিলাভে অনেকটা অগ্রসর যাঁরা হয়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন যে জড়াশ্রিত সাধারণ মন প্রাণ দেহের শক্তি ছাড়াও এমন অনেক রকম শক্তি আছে যা পিছন থেকে ও উপর থেকে ক্রিয়া করতে পারে, এবং বাস্তবিক তা করেও থাকে; অধ্যাত্ম চেতনাতে যাঁরা অগ্রগামী তাঁদের মধ্যে একরূপ সক্রিয় ধরণের আধ্যাত্মিক শক্তি থাকে, যদিও অনেকেই তা অর্জন করতে চায়না, বা সে শক্তি থাকলেও তা প্রয়োগ করতে চায়না, কিন্তু

সে শক্তি অন্যান্য শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশি বলবান ও ফলপ্রদ। এইরূপ গুহ্য শক্তি আয়ত্ত করবামাত্র প্রথমেই তিনি তাকে ছোটোখাটো ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রয়োগ ক'রে দেখলেন, এবং তার যথোচিত ফল পেয়ে তখন তিনি জগতের ব্যাপক শক্তিক্রিয়ার উপরেও তা প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। তার আশানুরূপ ফল পেয়ে তিনি আর অন্য কোনোরূপ চেষ্টার প্রয়োজনই বোধ করতেন না। কেবল দুইবার অবশ্য প্রয়োজন হয়েছিল তার সঙ্গে জনশক্তির ক্রিয়াকে সংযোগ করতে। তার প্রথমটি হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। প্রথমটাতে তিনি নিশ্চেষ্টই ছিলেন, কিন্তু যখন দেখা গেল যে হিটলারের জয়লাভে জগতের সকল শক্তিই বিধ্বস্ত হবে এবং নাৎসিবাদই জগতে প্রভুত্ব করবে, তখন তিনি তাঁর কাজ শুরু করলেন। তিনি প্রকাশ্যেই নিজেকে ঘোষণা করলেন মিত্রশক্তিদের সপক্ষে, কিছু অর্থসাহায্যও প্রেরণ করলেন, এবং যারা যুদ্ধে যোগ দিতে ইচ্ছুক তাদের উৎসাহিত করলেন। আর ডানকার্ক পরাজয়ে যখন সকলেই আশংকা করছিল যে এবার হিটলারের জয় ও ইংলণ্ডের পতন আসন্ন, তখন থেকেই তিনি ভিতরে ভিতরে আপন অধ্যাত্ম শক্তিকে মিত্রশক্তিদের পিছনে প্রয়োগ করতে থাকলেন, এবং তার পর থেকেই দেখা গেল যে জার্মানদের যুদ্ধজয় হওয়া থেমে গেছে আর যুদ্ধের গতিধারা বিপরীত দিকে মোড় নিয়েছে। এটা তিনি করতে বাধ্য হয়েছিলেন এই কারণে যে তিনি দেখলেন হিটলার ও নাৎসিদের পক্ষে রয়েছে ক্রূর আসুরিক শক্তি, এবং তাদের সাফল্যলাভ ঘটলেই সমগ্র মানবজাতিকে তার পদানত হয়ে থাকতে হবে; আর কেবল ইউরোপ নয়, সমগ্র এশিয়াও তার কবলে গিয়ে পড়বে, আর ভারতকে এমন দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে যা তার ইতিহাসে কখনই হয়নি, সুতরাং তার মুক্তির জন্য যা কিছু করা হয়েছে সমস্তই বৃথা হবে। ঠিক এই কারণেই তিনি ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবের সমর্থন ক'রে কংগ্রেস নেতাদের তা গ্রহণ করতে বলেছিলেন। নানা কারণে প্রথমে তিনি জাপানী অভিযানের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেন নি, যতদিন পর্যন্ত তাঁর এটা বোধ হয়নি যে জাপান ভারতকেও আক্রমণ করতে চাইছে। তিনি এই যুদ্ধ সম্বন্ধে আসুরিক শক্তির উল্লেখ ক'রে হিটলারের জয়লাভে কি ফল হবে তার উল্লেখ ক'রে মিত্রশক্তিদের সপক্ষে যে পত্রগুলি লিখেছিলেন তা সাধারণে প্রকাশ হতে দিলেন। ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবকে তিনি সমর্থন করেছিলেন এই কারণে যে তাহলে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারত একত্র হয়ে আসুরিক শক্তির

বিরুদ্ধে লড়তে পারবে এবং তা ভারতের স্বাধীনতা আসার পক্ষেও সহায়ক হবে। কিন্তু যখন সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল তখন শ্রীঅরবিন্দ কেবল তাঁর অধ্যাত্ম শক্তির উপরেই নির্ভর করলেন, এবং তার পরেই দেখতে পেলেন যে জাপানীদের উত্তরোত্তর যুদ্ধ জয় হতে থাকার পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের গতি ঘুরে গিয়ে তাদের সমূহ পরাজয় ঘটল। কিছুকাল পরে তিনি এটাও দেখলেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর পূর্বদৃষ্টিকে সফল ক'রে প্রচুর আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল থাকা সত্ত্বেও অবশেষে ভারত স্বাধীনতা লাভ করল।

সাধনা

শ্রীঅরবিন্দ প্রথম যোগ শুরু করেন ১৯০৪ সালে। তার আগেও কিন্তু তিনি কিছু আধ্যাত্মিক অনুভূতি পেয়েছিলেন, যদিও যোগ সম্বন্ধে তিনি কিছুই তখন জানতেন না, এমন কি যোগ কাকে বলে তাও জানতেন না। যেমন,—বহুকাল বিদেশে থাকার পরে প্রথমে যেমনি তিনি ভারতের মাটিতে পা দিলেন বোম্বাই এপোলো বন্দরে জাহাজ থেকে নেমে, অমনি এক বিশাল স্থিরতা যেন তাঁর উপর নেমে এলো। এই স্থিরতা তাঁকে সর্বক্ষণ ঘিরে রইল কয়েক মাস পর্যন্ত। আবার কাশ্মীরে গিয়ে যখন তিনি তখ্‌ত-ই-সুলেমানের পাড়ে ভ্রমণ করছিলেন তখন পেলেন এক বিরাট মহাশূন্য অনন্তের অনুভূতি। নর্মদা নদীর তীরে এক কালীমন্দিরে গিয়ে দেখলেন জীবন্ত কালীর উপস্থিতি। বরোদায় অবস্থানের প্রথম বৎসরে যখন ঘোড়ার গাড়ি উল্‌টে পড়ে গেলেন সেই বিপদকালে দেখলেন ভিতর থেকে কোনো দেবতা বেরিয়ে এসে তাঁকে রক্ষা করলে, ইত্যাদি। কিন্তু এইসব আভ্যন্তরীণ অনুভূতি আপনা হতেই অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছিল, সাধনার ফলে নয়।

প্রথমে তিনি নিজের থেকেই যোগ শুরু করেন কোনো গুরু না নিয়ে এক বন্ধুর কাছে কিছু নির্দেশ নিয়ে, তিনি ছিলেন গঙ্গামঠের ব্রহ্মানন্দের শিষ্য। প্রথম দিকে তিনি নিরন্তর প্রাণায়াম অভ্যাস করতেন (দিনের মধ্যে এককালীন প্রায় ছয় ঘণ্টা বা তারও বেশি)। তাঁর যোগের সঙ্গে রাজনীতির কোনো বিরোধ ছিলনা; দুই কাজই তিনি একসঙ্গে করতেন, তাতে কোনো বাধা হয়নি। কিন্তু তিনি একজন গুরু খুঁজছিলেন। খুজতে খুঁজতে

পেলেন নাগা সন্ন্যাসীদের এক প্রধান ব্যক্তিকে, তাকে যদিও গুরু করলেন না কিন্তু তার কার্যকলাপ দেখে যোগশক্তি সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস জন্মাল, যখন দেখলেন যে বারীনের প্রচণ্ড জ্বরকে সে একগ্লাস জলের মধ্যে কিছু মন্ত্রের দ্বারা ছুরি চালিয়ে আরোগ্য করে দিলে, আর বারীন সেই জল পান করাতেই জ্বর ছেড়ে গেল।

শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেও বিশেষ আস্থাবান হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যোগের বিষয়ে কোনো গুরু গ্রহণ করেন নি, কেবল বরোদায় লেলের সাক্ষাৎ পেয়ে মাত্র কিছুকালের জন্য তাকে গুরু করেছিলেন। লেলের সঙ্গে মাত্র তিন দিন ধ্যানে বসে তার নির্দেশ অনুযায়ী মনকে চিন্তামুক্ত ক'রে ফাঁকা ক'রে রাখবার সাধনায় তিনি রত হলেন; তাতে তাঁর মন সম্পূর্ণই নীরব হয়ে গেল ও এমন কি সমগ্র চেতনাও স্তব্ধ হয়ে গেল, এবং সেই নীরবতার মধ্যে অকস্মাৎ তিনি অব্যক্ত ব্রহ্মের উপলব্ধি পেয়ে গেলেন, যিনি তৎ ও সৎ, যিনিই কেবল আছেন, এবং তিনি ছাড়া বাকী সমগ্র বিশ্বকেই মনে হলো অবাস্তব মিথ্যা। এইরূপ নীরবতা অনেক মাসের জন্যই ছিল তাঁর ভিতরে ভিতরে; যখন কাজের মধ্যে ফিরে গেলেন তখন সব কাজই তিনি করতেন বাইরে বাইরে, কিন্তু ভিতরের দিকে সমস্তই ছিল স্থির অচঞ্চল। কিন্তু ঐ সময়টিতে এমন কি বাইরেও কোনো কর্মচঞ্চলতা ছিলনা; ছিল কেবল একটা স্থির নিষ্ক্রিয় অনুভূতি, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। কিন্তু লেলে এমন জিনিস চায়নি, সে চেয়েছিল এমন নীরবতা যাতে চিন্তা স্তব্ধ থেকে হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ বাণী শোনা যায়, সুতরাং সে চেষ্টা করেছিল যাতে তিনি এই অদ্বৈত অবস্থা হতে বেরিয়ে আসেন।

বোম্বাইতে এক সভায় লোক জড়ো হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের ভাষণ শুনতে, তিনি তখন লেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কোনো চিন্তাই যখন তাঁর মধ্যে আসছেনা তখন কেমন ক'রে তিনি ভাষণ দেবেন। লেলে তাঁকে বলে দিলে যে একটি নমস্কার ক'রে তিনি শ্রোতাদের সামনে কেবল অপেক্ষা ক'রে থাকবেন, তাহলে তাঁর মন ছাড়া অন্য কোনো স্থান হতে আপনিই বাণী বেরিয়ে আসবে। বাস্তবিকই তাই হলো, সভায় বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে আপনিই কথাগুলি বেরিয়ে এলো। এটা কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে শ্রীঅরবিন্দ কখনই সমাধিস্থ অবস্থায় ছিলেন না। তাঁর ভিতরকার একটা অংশ সব কিছুই দেখছিল এবং কথা বলছিল এবং যা করবার তা ক'রে যাচ্ছিল, কোনো

ব্যক্তিগত ইচ্ছার সম্পর্ক না রেখে বা সেদিক দিয়ে চিন্তামাত্র না ক'রে। এর পর থেকে তাঁর সব কিছু মানসিক কর্ম, বলা কওয়া, লেখা, ভাবা, ইচ্ছা হওয়া, সমস্তই আসছিল মস্তিষ্কগত মনের উপরকার সেই অংশ থেকে; তিনি তখন আধ্যাত্মিক মানসের রাজ্যে প্রবেশ করেছেন, যাকে তিনি পরে বলেছেন 'অধিমানস' চেতনা। এইটিই হলো তাঁর সর্বপ্রথম বড়ো রকমের যোগ উপলব্ধি ও অনুভূতি, এইটিই তাঁর যোগের প্রকৃত মূল ভিত্তির প্রথম সূচনা।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর একটি চিঠিতে এই যোগের সাধনা সম্বন্ধে নিজেই লিখেছিলেন—"আমি প্রথমে বিনা গুরুতে নিজেই যোগ শুরু করি ১৯০৪ সালে; ১৯০৮ সালে এক মহারাষ্ট্রীয় যোগীর কাছে বিশেষ সাহায্য পেয়ে আমার সাধনার মূল সূত্রকে ও ভিত্তিকে আবিষ্কার করি; এবং তখন থেকে যে পর্যন্ত শ্রীমা ভারতে না এসেছেন সেই পর্যন্ত আর কারো কাছে কোনো 'আধ্যাত্মিক সাহায্য পাইনি। আগেও এবং পরেও আমার সাধনা কোনো গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেনি, যা কিছু পেয়েছি তা আমার নিজেরই মধ্যে ভিড় ক'রে আসা ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে। কিন্তু জেলে থাকার সময় আমার কাছে ছিল গীতা এবং উপনিষদ, আমি গীতার নির্দেশমত যোগ অভ্যাস করতাম আর উপনিষদের নির্দেশমত ধ্যান করতাম। এই দুই গ্রন্থ হতেই আমি যা কিছু নির্দেশ পেয়েছিলাম; পণ্ডিচেরিতে আসার অনেক পরে আমি প্রথম বেদ অধ্যয়ন করি, কিন্তু তার থেকে আমার সাধনাতে কোনো সাহায্য নিতে হয়নি, বরং তার সঙ্গে আমার নিজের পাওয়া অনুভূতিগুলি মিলে গিয়ে সেইগুলিই আরো সপ্রমাণ হয়ে গেল। কখনো কখনো যদি কোনো প্রশ্নের বা বিভ্রমের উদয় হতো তখন আলো পাবার জন্য গীতার শরণ নিতাম, আর গীতা থেকেই তখন তার জবাব মিলে যেতো। এ কথা মিথ্যা নয় যে জেলের মধ্যে নির্জন ধ্যানের সময় প্রায় দুই সপ্তাহকাল যাবৎ আমি বিবেকানন্দের উপস্থিতি নিত্যই বোধ করতাম এবং তাঁর কণ্ঠস্বর সর্বক্ষণই শুনতাম। তিনি উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি বিশেষ দিক নিয়ে আমাকে কিছু বলতে এসেছিলেন, তাঁর বলার কথাগুলি যখন শেষ হয়ে গেল তারপর তাঁর আসাও বন্ধ হয়ে গেল।"

পণ্ডিচেরিতে আসবার আগেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগের চারটি প্রধান প্রধান উপলব্ধির মধ্যে দুটি উপলব্ধি পূর্ণরূপেই লাভ করেছিলেন। প্রথমটি

তিনি পেয়েছিলেন ১৯০৮ সালে বরোদাতে মহারাষ্ট্রীয় যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলের সঙ্গে যোগে বসার কালে; তা হলো স্থান কালাতীত নীরব ব্রহ্মের উপলব্ধি, যখন তাঁর সমগ্র চেতনা সম্পূর্ণরূপে স্থির ও স্তব্ধ হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে তিনি জগতের অবাস্তবতা ও অনিত্যতাও অনুভব করছিলেন। কিন্তু এ ভাবটি কেটে যায় দ্বিতীয় উপলব্ধির ফলে, আলিপুর জেলে অবস্থান কালে। তখন তিনি এক বিরাট বিশ্বচেতনা পেয়ে দেখলেন যে জগতে যত কেউ এবং যা কিছুই রয়েছে সমস্তই সেই এক ভগবান, সমস্তই তিনি। বাকী দুটি উপলব্ধির মধ্যে যেটি হলো পরমব্রহ্মের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুই দিকেরই অনুভূতি, আর যেটি হলো অতিমানসে উঠে যাবার উচ্চতর স্তরের চেতনা (যাকে বলে ভগবানের বিজ্ঞানময় চেতনা, বেদে বলেছে ঋত-চিৎ),—এই দুই দিক দিয়েই তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন আলিপুর জেলে তাঁর ধ্যানের মধ্যে। তদ্ভিন্ন লেলে তাঁকে যে উপদেশ দিয়েছিল যে তাঁর সাধনার ক্ষেত্রে এবং সকল বাহ্যক্রিয়ার ক্ষেত্রেও কেবল অন্তর্যামী ভগবানেরই উপর নির্ভর করতে, সেই কথা অনুসারেই তিনি সব কিছু করতেন।

অতএব ভারতে ভগবৎ মিলন ও আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের জন্য এখনও যে পন্থা অনুসরণ করা হয় সেই পন্থাতে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সকল দিকের মূল সূত্রগুলিকে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে তিনি পণ্ডিচেরির জীবনে প্রবেশ করলেন, এবং সেখানে গিয়ে সেই উপলব্ধিকে আরো এমন পূর্ণতর ক'রে আনতে চাইলেন যাতে আত্মা এবং বস্তু, চেতনা এবং জড়, সঙ্গতিপূর্ণভাবে একই বলে প্রতীতি হয়। অপিচ প্রায় সকল প্রকার যোগেই জীবনকে উত্তীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত গিয়ে আত্মাতে পৌছনোই হয়ে থাকে চরম লক্ষ্য। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সেই আত্মাতে উঠে গিয়ে সেখানকার আলো এবং শক্তি এবং আনন্দ প্রভৃতি সকল সম্পদকে আয়ত্ত ক'রে জীবনের ক্ষেত্রে পুনরায় নেমে এসে এখানকার জীবনকে রূপান্তরিত করতে চান। তাঁর দৃষ্টিতে মানবের বর্তমান জীবন হলো অজ্ঞানতার জীবন, যার ভিত্তিতে রয়েছে নিশ্চেতনার অবস্থা, কিন্তু সেই আপাত অন্ধকার নিশ্চেতনার মধ্যেও রয়েছে ভগবানের উপস্থিতির ও অভিব্যক্তির সম্ভাবনা। এই সৃষ্ট জগৎ কোনো ভ্রান্তি নয় বা মিথ্যা নয় বা অবাস্তব নয় যে মানবের আত্মাকে এর সংস্রব পরিত্যাগ ক'রে নির্বাণে কিংবা স্বর্গে চলে যেতে হবে, কিন্তু এখানেই হলো আধ্যাত্মিক বিবর্তনের রঙ্গভূমি, যাতে জড়ের নিবর্তিত নিশ্চেতনার ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে দিব্য ভগবৎ চেতনা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে

পারে। ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ হিসাবে যা অভিব্যক্ত হতে পেরেছে তা হলো মন, কিন্তু মনই যে সবচেয়ে চরম জিনিস তা নয়। এরও উপরে রয়েছে অতিমানস বা শাশ্বত ঋত চেতনা, যা হলো ভগবৎ প্রজ্ঞার সর্বজ্ঞ ও স্বতঃস্ফূর্ত আলো এবং শক্তি। মন হলো শুধু সত্যান্বেষী অন্ধ অজ্ঞানতা, কিন্তু তার নিজস্ব জ্ঞানটুকুর মারফতে সেই অজ্ঞানতাই নানা আকারে, নানা ভাবে ক্রিয়া করছে। ওর মধ্যে অতিমানসের অবতরণ ঘটলেই তখন মানব চেতনা সর্বোচ্চে উঠে তার উদ্দিষ্ট পূর্ণতা লাভ করবে। এটা সম্ভব, বৃহত্তর দিব্য চেতনাতে প্রবেশ করে তার আলো ও শক্তি ও আনন্দের উচ্চতায় পৌছে আপন প্রকৃত সত্তাকে আবিষ্কার করা এবং ভগবানের সঙ্গে নিত্য মিলিত হয়ে থেকে তাঁর অতিমানস শক্তিকে নামিয়ে এনে মন-প্রাণ-দেহের রূপান্তর ঘটানো, এটা সম্ভব। এই সম্ভবকে বাস্তবে পরিণত করাই হলো শ্রীঅরবিন্দের যোগের সক্রিয় উদ্দেশ্য।

১৯১০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কাল পণ্ডিচেরিতে থেকে তিনি তাঁর এই একমাত্র আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা ও সাধনাতেই উত্তরোত্তর একাগ্রভাবে সর্বক্ষণ নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

শ্রীমা

[১৯১৪ সালে ২৯ মার্চ তারিখে শ্রীমা ফরাসী দেশ থেকে পণ্ডিচেরিতে এসে প্রথম শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাতের ঠিক পরেই তিনি তাঁর প্রার্থনা পুস্তকে যে কথা লিখে রাখলেন, তার থেকেই এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তাঁর তখনকার মনোভাবের কিছু আভাস পাওয়া যায়:]

"শত শত নরনারী যে এখনও প্রগাঢ় অজ্ঞানতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে, তাতেও কিছু আর যায় আসে না। কাল আমরা যাঁকে দেখলাম তিনি তো এই পৃথিবীতেই রয়েছেন: তাঁর এখানে এই উপস্থিতিই যথেষ্টরূপে প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে যে এমন একদিন আসবে যখন অন্ধকার রূপান্তরিত হবে আলোতে, আর হে পরম প্রভু, তোমার রাজ্যই এখানে নিশ্চয় হবে প্রতিষ্ঠিত।"]

[অতঃপর দেখা গেল যে দুজনেরই আধ্যাত্মিক সাধনা ও অনুভূতির ধারা একই প্রকার, এবং পরস্পরের সহযোগে পৃথিবীতে উদ্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন

করতেই তাঁরা এখানে এসেছেন। তাই চার বছরের নীরব যোগ সাধনার পরে শ্রীমা এসে পড়াতে ১৯১৪ সালের আগষ্ট হতে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দার্শনিক পত্রিকা "আর্য" সাড়ে ছয় বছর পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশ করলেন, পরে ১৯২১ সালে তা বন্ধ হয়ে গেল।

শ্রীঅরবিন্দের যে প্রধান গ্রন্থগুলি রয়েছে, যেমন 'Isha Upanishad' 'Essays on the Gita' 'The Life Divine' 'The Synthesis of Yoja',—এগুলি সবই 'আর্য' পত্রিকাতে ধারাবাহিক ভাবে লেখা হয়েছিল। তাঁর যোগ সাধনার ফলে যা কিছু আভ্যন্তরীণ জ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন তা সমস্তই এই লেখাগুলির মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। আরো যা কিছু তিনি লিখেছিলেন তা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির তাৎপর্য সম্পর্কে, বেদের প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্পর্কে, মানব সমাজের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে, কাব্যের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ স্ফুরণ সম্পর্কে, ও সমগ্র মানব জাতির ঐক্যবিধানের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে। এই সময়ে তিনি ইংলণ্ডে ও বরোদাতে থাকাকালীন যা কিছু কবিতা লিখেছিলেন এবং পরেও তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ও পণ্ডিচেরিতে আসার প্রথম কয়েক বছরে যা কিছু কবিতা লিখেছিলেন তাও ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা হয়।

[১৯২০ সালে ২৪ এপ্রিল তারিখে শ্রীমা আবার ভারতে ফিরে এলেন এবং তখন থেকে এ যাবৎ এখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকলেন।]

পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের নির্জনবাসের প্রথম অবস্থায় তাঁর সঙ্গে চার পাঁচ জন মাত্র সহচর ছিল। তার পরে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার পন্থা অনুসরণ করতে ক্রমে ক্রমে আরো অনেকে এসে জোটাতে শেষে এমন এক সাধক গোষ্ঠী গড়ে উঠল যারা উচ্চতর জীবন লাভের জন্য পার্থিব সব কিছু ত্যাগ ক'রে চলে এসেছে। তখন তাদের আশ্রয় দিয়ে সমুচিত নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন হলো। এর থেকে প্রতিষ্ঠিত হলো শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের ভিত্তি। এ আশ্রমকে ইচ্ছা করে সৃষ্টি করা হয়নি, এটি আপনা হতেই ঐভাবে গড়ে উঠেছিল শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র ক'রে।

[১৯২৬ সালের ২৪ নভেম্বর তারিখটিকে বলা হয় 'সিদ্ধিদিবস', ঐ দিন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অভিপ্সানুযায়ী বিশেষ এক আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভ করেন। তিনি নিজেই তৎসম্বন্ধে এই কথাগুলি বলেছিলেন ১৯৩৫ এর অক্টোবরে :]

"২৪ নভেম্বর ১৯২৬ তারিখে এই স্থূল জগতে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ ঘটেছিল। কৃষ্ণ পরমতম অতিমানস জ্যোতি নন, কিন্তু কৃষ্ণের এখানে অবতরণের এই

র্থ হবে যে অধিমানস লোকের দেবতা নিজে সেই আলো না আনলেও সেই াতিমানসের আলো এবং আনন্দকে এখানে নামিয়ে আনার প্রস্তুতির সূচনা ক'রে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হ'লেন স্বয়ং আনন্দময়; তিনি অধিমানস লোকের ভিতর দিয়ে জগতের ক্রমবিবর্তনকে সমর্থন ক'রে তাকে সেই আনন্দেরই অভিমুখে অগ্রসর ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন।"

[এই সিদ্ধিদিবস থেকে শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণরূপে অন্তরালবর্তী হয়ে রইলেন, এবং আশ্রমের ও সাধকদের সম্বন্ধে সব কিছুর ভার শ্রীমায়ের হাতে সমর্পণ রলেন। এর পর শ্রীমাই সুশৃঙ্খলে ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুললেন আশ্রমটিকে। আশ্রম গঠনের বিভিন্ন বিভাগ ক্রমশই বেড়ে যেতে থাকল এবং আধ্যাত্মিক সাধকদের সংখ্যাও ক্রমশ অনেক বেড়ে গেল। তারা সকলে শ্রীমায়ের হাতেই নিজেদেরকে সমর্পণ ক'রে দিলে এবং তিনিও তাদের সাধনাতে নিত্যই স্বয়ং নির্দেশ দিতে থাকলেন। ভগবানের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হলো শ্রীমায়েরই মাধ্যমে এবং এখনও তাই হচ্ছে। এই শ্রীমায়ের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এক চিঠিতে বিশেষ ক'রে এই কথাগুলি লিখেছেন :]

"আমার চেতনা ও শ্রীমায়ের চেতনা অভিন্ন। দুজনের মধ্যে একই ভগবৎ চেতনা একই রকম ভাবে কাজ করছে, কারণ বর্তমান ক্রিয়ার পক্ষে তাই'ই দরকার। শ্রীমায়ের চেতনার সাহায্য ছাড়া, তাঁর জ্ঞান ও শক্তি ছাড়া কোনো কিছুই হবার নয়—যে কেউ মায়ের চেতনাকে প্রকৃতই অনুভব করবে সে নিশ্চয়ই জানবে যে আমি রয়েছি তার পিছনে, তেমনি যে কেউ আমার চেতনাকে অনুভব করবে সে জানবে যে মা রয়েছেন তার পিছনে।"

মায়ের আলো

শ্রীঅরবিন্দ আরো লিখেছেন :—"মায়ের চেতনা স্বয়ং ভগবৎ চেতনা এবং তার থেকে যে আলো আসে তা স্বয়ং দিব্য সত্যেরই আলো। যে কেউ মায়ের আলো পেয়ে আস্থা সহকারে তার মধ্যে অবস্থান করবে সে মন-প্রাণ-দেহের সকল স্তর থেকেই সত্যকে দেখতে শুরু করবে। অদিব্য জিনিস মাত্রকেই সে বর্জন করবে—যা কিছু মিথ্যা, অজ্ঞানতা, ক্রুর শক্তিদের ভ্রান্ত ক্রিয়া, সমস্তই অদিব্য; যা কিছুই ঘোরালো হয়ে থাকে এবং দিব্য সত্যকে ও তার আলো এবং শক্তিকে মানতে চায়না তা সমস্তই অদিব্য। সুতরাং

মায়ের শক্তিকে ও মায়ের আলোকে যা মানতে চাইছেনা, তাও অদিব্য। তাই আমি সর্বদাই তোমাদের বলি মায়ের সঙ্গে ও তাঁর শক্তি এবং আলোর সঙ্গে একটা সংস্পর্শ বজায় রাখতে, কারণ শুধু এই উপায় অনুসরণ করলেই তোমরা সকল রকম গণ্ডগোল ও জটিলতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে উপর থেকে নেমে আসা সত্যকে গ্রহণ করতে পারবে।

আমরা যখন বিশেষভাবে বলি মায়ের আলো কিংবা আমার আলো সম্বন্ধে কিছু কথা, তখন নিশ্চয় জেনো যে তা বলছি এক বিশেষ রকমের গুহ্যক্রিয়ার দ্বারা স্বয়ং অতিমানস থেকে আমাদের মধ্যে আসা আলোর কথা। সে ক্রিয়ার মধ্যে মায়ের আলোটি হলো শ্বেতশুভ্র যাতে নির্মল করে, দীপ্ত করে, সত্যের মূল, শক্তি ও সমগ্র নির্যাসকে নামিয়ে এনে রূপান্তরকে সম্ভব ক'রে তোলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে আলোই আসে উপর থেকে এবং যে আলোই আসে সর্বোচ্চ দিব্য সত্যের ভিতর থেকে, সবই হলো মায়ের আলো।

মায়ের পথ ও আমার পথে কোনোই প্রভেদ নেই; চিরদিন ছিল এবং চিরদিনই আছে আমাদের এই একই অভিন্ন পথ, যে পথে পৌছনো যায় অতিমানস রূপান্তরে ও ভগবৎ উপলব্ধিতে; কেবল শেষকালেই নয়, কিন্তু গোড়া থেকেই তাই।

মাকে একদিকে আর আমাকে একদিকে আলাদা ক'রে নিয়ে এই যে তফাৎ ক'রে দেখবার এবং বিপরীত বলে বোঝাবার চেষ্টা, এ হলো মিথ্যার কারসাজি, যার দ্বারা ঐ মিথ্যার শক্তিরা সাধককে সত্যে গিয়ে পৌছতে না দেবার জন্য চেষ্টা করে। মন থেকে ঐ সব মিথ্যাকে একেবারে দূর ক'রে ফেলে দাও।

এটা জেনে রাখো যে মায়ের আলো এবং শক্তি হলো স্বয়ং সত্যেরই আলো এবং শক্তি, এই কথা জেনে সর্বদাই তার সঙ্গে সংযোগ রাখো। তাহলেই তুমি দিব্য সত্যের মধ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারবে।"

মা কেন দেহধারণ করলেন

"পরমতম মূল ভগবৎ শক্তি একটাই, যে শক্তি বিশ্বের মধ্যেও কাজ করছে ব্যক্তির মধ্যেও কাজ করছে, আবার বিশ্বকে ও ব্যক্তিকে ছাড়িয়েও যে রয়েছে। মা হলেন তাই, এর সব কিছুকেই জড়িয়ে,—কিন্তু এখানে তিনি

দহী হয়ে কাজ করছেন এমন কিছুকে নামিয়ে এনে এখানকার জীবনকে পান্তরিত করবার জন্য যা ইতিপূর্বে এই জড়জগতে আজ পর্যন্ত কখনই প্রকাশ পায়নি—তোমরা এই মাকে স্বয়ং সেই ভগবতী শক্তি বলেই জানবে, যিনি ঐ উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে কাজ ক'রে যাচ্ছেন। দেহীরূপে যদিও তিনি াই, কিন্তু তাঁর সমগ্র চেতনাতে তিনি ভগবানের অন্যান্য সকল দিকের ঙ্গেই একাত্ম।"

[আগেকার কথাগুলি থেকে এ পর্যন্ত বোঝা গেছে যে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের কাজ ছিল "অস্তিত্বের দুই প্রান্তকে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে মিলিয়ে দেওয়া", কংবা যা তিনি অন্যত্র বলেছেন "জীবনের মধ্যে ভগবত্তাকে নামিয়ে আনা।" কটি চিঠিতে তাই স্পষ্টই লিখেছেন :]

"আমরা চাইছি এক নতুন গুণসম্পদ হিসাবে অতিমানসকে এখানে নামিয়ে মানতে। মন বলতে এখন যেমন মানব চেতনার একটা স্থায়ী অবস্থার জনিস বলে বোঝায়, তেমনি আমরা চাইছি অতঃপর এমন জাতির সৃষ্টি রতে যাদের পক্ষে অতিমানসই ঐরকম স্থায়ী অবস্থার জিনিস হয়ে দাঁড়াবে।"

অতিমানসকে আনতে চেষ্টার কারণ কি

[অন্য এক চিঠিতে তিনি একথা বলেছেন :]

"আমি চাইছি এক উচ্চতর সত্যকে। তাতে মানুষ এর চেয়েও বড়ো হতে ারবে কিনা সে প্রশ্নই নয়, কিন্তু যাতে তাদের জীবনের মধ্যে আসে শান্তি সত্য ও আলো, তাদের জীবন যাতে এখনকার এই অজ্ঞতা ও অসত্য ও ালাযন্ত্রণা ও দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে নিত্য সংঘর্ষপূর্ণ হয়ে থাকার চেয়ে ভালোরকম কছু হয়ে ওঠে।...অতিমানসকে আমি নামিয়ে আনতে চাই নিজেকে বড়ো রার জন্য নয়। মানুষের বিচারে আমি বড়োই হই বা ছোটোই হই তার ন্য আমি কিছু গ্রাহ্যই করিনা। আমি কেবল চাই যে এই পার্থিব চেতনার ধ্যে কিছু আভ্যন্তরীণ সত্য এবং আলো এবং সঙ্গতি এবং শান্তি এসে ঢুক; উপরের দিকে তা রয়েছে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি—উপর থেকে ার জ্যোতি আমার চেতনার মধ্যে এসে উঁকি মারছে, আমি তাই চাইছি সেই জিনিস সমগ্র সত্তার মধ্যে তার আপন শক্তিতে এসে অবতীর্ণ হোক, ানুষের প্রকৃতি আর যেন এমন আধা-আলো আধা-অন্ধকারের মধ্যে না

থাকে। আমি এই বিশ্বাস রাখি যে পার্থিব বিবর্তন ধারার শেষ উদ্দেশ্য হবে যে সত্যের আলো নেমে এসে এখানে দিব্য চেতনা বিকশিত হবার উন্মুক্ত করে দেবে। আমার চেয়েও মহৎ পুরুষেরা এটা যদি না দেখে থাকে এবং এ আদর্শ যদি তাঁদের দৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত না হয়ে থাকে, তথাপি আমি সত্যদৃষ্টি ও সত্যানুভব পেয়েছি নিশ্চয়, তাকে অনুসরণ করতে আমি নিবৃ থাকব, এমন কখনো হতে পারেনা। কৃষ্ণও যে চেষ্টা করেননি, আমি সে চেষ্টাই করতে যাচ্ছি বলে লোকের বুদ্ধির কাছে আমি যদি নির্বোধ ব প্রতিপন্ন হই, তাতেও কিছু যায় আসেনা। এখানে অমুক কিংবা তমুক বলছে তা নিয়ে প্রশ্নই নয়। এ হলো কেবল ভগবান ও আমার নিজের মে একটা বোঝাপড়ার প্রশ্ন—স্বয়ং ভগবানের তাই ইচ্ছা কিনা, তিনি আমা এখানে পাঠিয়েছেন সেই জিনিসকে নামিয়ে আনতে কিনা, অথবা ত অবতরণের পথ খুলে দিতে কিনা, অথবা অন্ততপক্ষে সেটা অপেক্ষাকৃত আ সম্ভবতর ক'রে তুলতে কিনা, তাই নিয়ে কথা। আমার এই দুঃসাহসি ধারণা পোষণ করবার জন্য সকল লোকে আমাকে যতই টিট্‌কারি দিক কি আমার উপর নরকপাতই ঘটুক—তবু আমি এ কাজ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাব তাতে আমি জয়ীই হই কিংবা ধ্বংসই হয়ে যাই। এইমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে আমি অতিমানসকে এখানে চাইছি, নিজেকে বা অন্য কাউকে বড়ো ক' তোলার মতলবে নয়।"

[আরো এক চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন :]

"আমি এখানে অতিমানসের আরোপ ঘটাতে চাইছি, কারণ পার্থি চেতনার জন্য এখন তা হওয়াই নিতান্ত দরকার এবং তা হওয়াতেই হবে।"

[আশ্রমবাসী ও সাধকদের সংখ্যা যতই বাড়তে থাকল, শ্রীঅরবিন্দে চিঠিপত্র লেখার পরিমাণও ততই অনেক বেড়ে গেল। শিষ্যেরা প্রত্যহ নানারকম প্রশ্ন লিখে পাঠাতো তার জবাব দিতে হতো, তাদের নানারক বাধাবিপত্তির ক্ষেত্রে সাহায্য দিতে হতো, কখনো বা সান্ত্বনা কখনো বা উ দিতে হতো, সাধনার পথে তাদের শক্তি ও আশা ও উৎসাহ দিতে হতে এর জন্য তাঁকে অনেকটা সময় ব্যয় করতে হতো। সেই সকল চিঠি এখন চারটি খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, আরো অনেক এখ প্রকাশিত হতে বাকী আছে।

যতই দিন যেতে থাকল ততই শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস আলোককে নী

মিয়ে আনার কাজের গতিবেগ প্রবলতর হতে থাকল। তিনি জানতেন মানুষের আবার পশুত্বে ফিরে যাওয়া কিংবা তার আত্মনাশ ও সমূহ লোপ ঘটে যাওয়া যদি নিবারণ করতে হয়, তাহলে তার এই মনের চেয়ে ড়া কোনো শক্তিবোধ ও চেতনা সূত্রের অভ্যুদয় হওয়া নিতান্তই দরকার, র মানবজাতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি জরুরী অবস্থাই এবার এসে ড়ছে। বর্তমান কালের পরিস্থিতিতে কোনো মেরামতি রকমের সংস্কার ধনে বা নৈতিক ধরনের মনগড়া আপোষ ঘটিয়ে কিছুই কাজ হবেনা, এখন নব প্রকৃতির আমূল রূপান্তর ঘটানো চাই···অর্থাৎ সক্রিয় ও সৃষ্টিগর্ভ দিব্য লনের ভিত্তিতে মানব সমাজকে সম্পূর্ণ নূতন ক'রে পুনর্গঠিত করা চাই। ই কালের গতির সেই দাবি মেটাবার জন্যই শ্রীঅরবিন্দের প্রবর্তিত পূর্ণ-াগের প্রচেষ্টা। তিনি এখানে সেই কথাই বলেছেন :]

"সাধারণ জীবনের কাজ হলো স্বার্থরক্ষা করা ও কামনা পূরণ করা, তার ঙ্গ থাকবে খানিকটা মানসিক বা নৈতিক সংযম, কখনো বা কিছু মানসিক াদর্শের অনুশাসন। গীতার যোগের কাজ হলো তোমার সকল কর্মকে গবানে নিবেদন করা, সকল কামনাকে জয় করা, অহং বর্জিত হয়ে নিরাসক্ত াবে কাজ করা, ভগবানে ভক্তিযুক্ত হয়ে থাকা, বিশ্ব চেতনার মধ্যে প্রবেশ রা, সকল প্রাণীর সঙ্গে ঐক্যবোধ করা ও ভগবানের সঙ্গে একাত্মবোধ করা। ার এই পূর্ণযোগের কাজ হলো ঐগুলির সঙ্গে অধিকন্তু অতিমানস আলোকে শক্তিকে এখানে নামিয়ে আনা আর প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করা।"

শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগ

[১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীঅরবিন্দ দেহত্যাগ করলেন। ই থেকে ৯ই তারিখ পর্যন্ত তাঁর দেহ তাজা ও অবিকৃত অবস্থায় শায়িত ইল। মা বললেন যে অতিমানসের আলো ওর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে াজ করছে। হাজার হাজার মানুষ কাছ থেকে ও দূর থেকে এসে তাঁর াই জ্যোতির্ময় দেহ দর্শন ক'রে প্রণাম ক'রে গেল, তারা সকলেই এই াধারণ দৃশ্য দেখে গেল যে চারদিন পর্যন্ত সেই দেহে পচনের চিহ্নমাত্র খা যায়নি, যেমন তাজা অবস্থায় ছিল তেমনিই আছে। ৯ই তারিখের কালে তাঁর দেহকে সমাধিস্থ করা হলো গোলাপ-কাঠের বাক্সের মধ্যে ভরে

মাটির নীচে সিমেণ্টের তৈরি গহ্বরে, মূল আশ্রম প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে, সে বৃক্ষের ছায়াতলে।]

[অতঃপর ৭ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীমা দিলেন নিম্নলিখিত বাণী :]

"হে প্রভু, আজ সকালে তুমি আমাকে দিয়েছ এই নিশ্চয়তা যে তোমা কাজ যতদিন সুসম্পন্ন না হয় ততদিন তুমি রইলে আমাদের সঙ্গে, কেব দীপ্তিদায়ক ও দিশারী চেতনারূপে নয়, কিন্তু সক্রিয় সতেজ উপস্থিতি রূে অভ্রান্ত ভাষাতে তুমি দিয়েছ এই অঙ্গীকার যে তোমার সমগ্র সত্তাই এখা অবস্থান করবে, যতদিন এই পৃথিবীর রূপান্তর না ঘটে ততদিন তুমি এ পৃথিবীর আবহাওয়া পরিত্যাগ ক'রে যাবেনা। প্রার্থনা করি যে আম যেন তোমার এই অনির্বচনীয় উপস্থিতির যোগ্য হতে পারি, এবং এখ থেকে আমাদের ভিতরকার সব কিছুই যেন একমাত্র ইচ্ছাতে কেন্দ্রীভূত হ তোমার সুমহৎ কর্মকে সুসম্পন্ন ক'রে তোলবার জন্য উত্তরোত্তর নিজেদের সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত ক'রে দিতে পারি।"

[৮ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীমা আবার একটি বাণী দিলেন :]

"শ্রীঅরবিন্দ যে তাঁর দেহত্যাগ সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তার জ বর্তমান পৃথিবীর ও এখনকার মানুষদের গ্রহিষ্ণুতার অভাবই অধিকাংশরূ দায়ী। কিন্তু একটি কথা একেবারে নির্ভুল—বাস্তবের স্তরে যা ঘটেছে তা তাঁর দান ও অবদানস্বরূপে তাঁর বাণীর সত্য কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি। তিনি যা বলেছেন তা সম্পূর্ণই সত্য, এবং এখনও তা সত্য। যথাকালের ঘটনাবলী দ্বারা তার সত্যতা প্রভূতরূপে সপ্রমাণ হয়ে যাবে।"

[তাঁর কাজ এগিয়ে চলেছে মহা সাফল্যের পথে।

শ্রীঅরবিন্দের কর্মধারার গতি আরো অগ্রমুখী হয়ে চলেছে। তার ক্ষে আরো বিস্তারলাভ করছে। অনেক নব নব মানবমনকে ও মানবহৃদয় অনুবর্তীদের দলে টানছে, সাফল্যের দিকটা আরো দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হচ্ছে, তিনি পূর্ণতা আসার কামনা ও প্রত্যাশা করেছিলেন সেই পথে সাফল্য আ এগিয়ে এসেছে। কিন্তু একাজ প্রধানত মানুষের চেতনাকে নিয়ে, দ্বিতীয়ত ত প্রকৃতিকে নিয়ে, এবং শেষ পর্যন্ত তার সমগ্র জীবনের ছক ও বুননধারা নিয়ে। মানুষকে তার মামুলী মনশ্চেতনার সীমারেখার এতটা উপরে ও চাই যেখানে সে অনন্ত সত্যের মধ্যে প্রবেশের অধিকার পেয়ে এখানে তা মুক্ত অভিব্যক্তির মাধ্যমস্বরূপ হতে পারে। অতএব সেই সত্যের ক্রিয়া য

হ্মুষের চেতনা ও প্রকৃতির মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারবে তখনই
ার সুফল বাস্তবের স্তরে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে। আপাতত মানব চেতনার
ধ্য যা কিছু রূপান্তর ঘটছে তা হচ্ছে তলে তলে, তার অজ্ঞানের যবনিকার
ন্তরালে, মানুষ তার ভিতরের খবর বিশেষ কিছুই রাখেনা। অতিমানস
তনা যে ধীরে ধীরে সাধারণ মানব চেতনার মধ্যে ও পৃথিবীর আবহাওয়ার
ধ্য উত্তরোত্তর অনুপ্রবেশ করছে তা এমন স্থূল ব্যাপার নয় যে চর্মচক্ষে দেখা
বে। সে কাজ হলো অগোচর এবং আমাদের বুদ্ধির দ্বারা দুর্ভেদ্য, পরোক্ষে
ামাদের সত্তার সকল ক্রিয়াই তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে।
তএব যতক্ষণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি না খোলে ততক্ষণ আমাদের পক্ষে সমীচীন
ব শুধু বিশ্বাস ক'রে বিনীত হয়ে থাকা—হৃদয়কন্দরে শ্রদ্ধার দীপটি জ্বালিয়ে
খা, যাতে বাইরের অন্ধকার অন্তরেতে ঝড় তুলে হতাশা না এনে দেয়।

শ্রীঅরবিন্দের কাজের নিশ্চিত অগ্রগতি সম্বন্ধে দুটি কথা ভেবে দেখতে
ব। প্রথমত, মা বলেছেন যে শ্রীঅরবিন্দ এখানে এই পৃথিবীর আবহাওয়ার
ধ্যই উপস্থিত রয়েছেন, কেবল নির্দেহী আত্মারূপে নয় কিন্তু সক্রিয় এবং
ীবন্ত সূক্ষ্মদেহী সত্তারূপে। অদৃশ্য লাঙ্গল চালিয়ে যাচ্ছেন আমাদের অস্তিত্বের
বচেতন ও নিশ্চেতনের ক্ষেত্রে, প্রস্তুত ক'রে তুলছেন পার্থিব চেতনাকে
ব্যজীবনের অতিমানস গ্রহণের উপযোগী হওয়াতে। এ কথা মা দৃঢ়প্রত্যয়ের
ঙ্গে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের মধ্যে অনেকের কাছেই
অরবিন্দের সক্রিয় উপস্থিতিও প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়েছে। তিনি অন্তরালে
ওয়াতে যদি পরিবর্তন কিছু ঘটে থাকে, তবে তা এই যে সে কাজের বেগ
াগের চেয়ে আরো বেড়ে গেছে, তা আরো বেশি জোরালো হয়ে উঠেছে।
তীয়ত, এখন স্বয়ং শ্রীমা তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, যে কথা আগের থেকে
জেই তিনি পরিষ্কার ক'রে বলে গেছেন। ইনি অতিমানসের ঋতজ্যোতিকে
ামিয়ে আনার প্রচেষ্টাতে শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী ছিলেন, এখনও সেই
কাজই ইনি করছেন। সেই অতিমানসের সত্যজ্যোতি এখন নেমেই
এসেছে এবং তার রূপান্তরের ক্রিয়াও শুরু ক'রে দিয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের
দেহত্যাগের ছয় বৎসর পরে ১৯৫৬ সালে শ্রীমা ভগবানকে উদ্দেশ ক'রে তাই
বললেন :]

"হে প্রভু, তুমি যা চেয়েছিলে তা আমি কাজে সম্পন্ন করেছি।
এই পৃথিবীতে এক নূতন আলো ফুটে উঠেছে,

এক নূতন জগৎ এবার জন্ম নিয়েছে,

যা কিছু প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছিলে তা সবই প্রতিপালিত হয়েছে।"

[ঐ বছরেই মা আরো একটি বাণীতে বললেন :]

"তে অতিমানসের অভিব্যক্তি এখন আর প্রত্যাশা বা প্রতিশ্রুতি মাত্র নয়, এখন তা বাস্তব ও জীবন্ত ঘটনা। এখানে অতিমানস এখন তারই কাজ শুরু করেছে। আর এমন একদিন আসছে যখন অতি অন্ধ, অতি অজ্ঞান, অতি অবিশ্বাসীকেও তা স্বীকার করতে বাধ্য হতে হবে।"

[১৯৫৭ সালের নভেম্বরে শ্রীমা এই বিষয়ে আরো বিশদভাবে বললেন :]

মহা "অ্যাড্‌ভেঞ্চারের" জন্য আহ্বান

"গত বছরে আমি তোমাদের বলেছিলাম অতিমানস চেতনার অবতরণ তার আলো এবং শক্তির আসন্ন বিকাশের কথা, সেই সঙ্গে আরো আমার বলা উচিত ছিল যে এবার এক নতুন জগৎ জন্মাবে, এ হলো তারই পূর্বসূচনা তবে এই সময়ে সেই নতুন জগতের চিত্র এই প্রাচীন জগতের চেহারার অন্তরালে এমনি চাপা পড়ে আছে যে এখনও পর্যন্ত খুব কম লোকেই অনুমা করতে পারছে সেই নতুন জগৎসৃষ্টির কথা, এবং তার ফলে এখানে আমূ পরিবর্তন এসে পড়ার কথা। তথাপি যুগান্তকারী নবশক্তি এসে গেছে এব তার আপন উদ্দিষ্ট কাজকে অবাধে ও অপ্রতিহত ধারাতে সম্পন্ন ক'ে চলেছে। তার ফলাফলও দিনের পর দিন সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে টের পাওয়া যাচ্ছে। সংক্ষেপে ও সরল ভাষাতে তার সম্বন্ধে এখন কিছু বলাও যেতে পারে।

প্রথমত, এ শুধু আধ্যাত্মিক জীবনের সম্বন্ধে ও ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা নতুন রকমের ধারণা বা বিভাবনা মাত্রই নয়। শ্রীঅরবিন্দ এ সম্বন্ধে বেশ পুরোপুরি ভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন। তার মূলসূত্রটা সংক্ষেপে এইরূপ :

আগের যুগের আধ্যাত্মিক সাধনা ছিল জীবনকে ছেঁটে দিয়ে ভগবানকে খোঁজা, জগৎটা যেমন অবস্থাতে রয়েছে তেমনি অবস্থাতেই থাক। কিন্তু আমাদের নতুন দৃষ্টিশক্তি নিয়ে আমরা চাইছি যাতে এই বাস্তবময় জীবনটাকেই ভগবানের দিকে উঁচু ক'রে তুলে ধরা যায়, এই জড়ময় জগৎকেই যাতে দিব্য জগতে রূপান্তরিত করা যায়। বহুবার এ কথা বলা হয়েছে, আর

তোমরা তা অল্পবিস্তর বুঝতেও পেরেছ। আমরা যেটা চাইছি তার এই হলো মূল কথা। তবে এই পুরানো জগৎকেই ক্রমশ বড়ো ক'রে এনে ও তার ক্রমিক উন্নয়ন ঘটিয়ে এ কাজ স্বাভাবিক উপায়ে ধীরে ধীরেও হয়ে যেতে পারতো। সে উন্নয়নের প্রকল্প যতই অনন্যপূর্ব হোক, উচ্চতর ভাবরাজ্যে যখন তা একবার রূপায়িত হয়েছে তখন তাকেই বীজরূপে শক্তিগর্ভ ক'রে পালন করা যেতো। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা আলাদা জিনিস বাস্তবের মধ্যে ঘটে গেছে, সম্পূর্ণ নতুন জগৎটাই এখন জন্ম নিতে শুরু করেছে। পুরানো জগৎটাই যে নতুনে রূপান্তরিত হবে এখন আর সে কথা নয়, একেবারে নতুন জগৎটাই এসে দেখা দিচ্ছে।

বর্তমান কালে আমরা রয়ে গেছি এই অদল বদলের ঠিক মাঝখানে। যেখানে নূতনে পুরাতনে হচ্ছে মেশামেশি; পুরাতনের প্রভাব এখনও পুরোমাত্রাতে সাধারণের চেতনাতে কাজ করছে, আর নূতন এসে তারই মধ্যে নিজের মাথা গলাচ্ছে। নূতন যদিও এখনও তার তলদেশেই চাপা রয়েছে, বাইরের দৃষ্টিতে আপাতত তাব কোনো প্রকাশ দেখাই যাচ্ছেনা, এমন কি অধিকাংশ মানুষের চেতনাতে তার অস্তিত্বের চিহ্নই নেই, তবু সে ধীরে ধীরে তার আপন কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অল্পে অল্পে সে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর অপেক্ষা করছে সেই সময়টির জন্য যখন প্রত্যক্ষভাবে ও পূর্ণতেজে সব কিছুকে সে দখল কববে।

মোটামুটি ভাবে বলা যায়, পুরাতন জগৎ ছিল শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন অধিমানসের গড়া, আর তার উপর আধিপত্য করত অধিমানসেরই দেবদেবীরা, তাই মানুষ সেই সব দেবতাদেরই মানতো। তাই সে যুগ ছিল যাগযজ্ঞ ধর্মকর্মের যুগ। মানুষ নিম্ন অবস্থা হতে উচ্চে উঠতে কয়েক-প্রকার ধর্মপন্থা আবিষ্কার করেছিল, যার সাহায্যে মহৎ আত্মারা ঊর্ধ্বজগতের নাগাল পেতে পারতেন। এর চরম পরিণতি ঘটল যখন আরো উচ্চতর উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত হলো সর্বোপরিস্থ একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বরের ধারণা, যিনি অনির্বচনীয় ও সকল অভিব্যক্তির উর্ধ্বে—মানব আস্পৃহার চূড়ান্ত হবে সেখান পর্যন্ত গিয়ে পৌছোনো। কিন্তু সে আস্পৃহাও একটা সীমান্তে গিয়ে থেমে যায়; অর্থাৎ তখনও তা পুরোপুরি অধিমানসের স্তরের মধ্যেই থাকার ব্যাপার, তারই অন্তর্গত হয়ে থেকে আরো উপরেব দিকে কেবল দৃষ্টিপাত মাত্র করা, একটা ধারণা আনা ছাড়া আর কিছু নয়, যার থেকে

একটা নূতন সৃষ্টির আভাস মাত্র আসে কিন্তু তা আয়ত্তের মধ্যে আসেনা। তার জন্য অদল-বদলের প্রয়োজন। তখন অধিমানসের সীমায়িত আশ্রয় থেকে সরে আসতে হবে। সেই নূতনকে এনে ফেলার জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল অধিমানসের স্থানে অতিমানসের আবির্ভাব।

সেই পুরাতন ব্যবস্থা এখন প্রাচীনত্ব পেয়ে অচল হয়ে পড়েছে, এখন যা হচ্ছে তা পূর্বেকার সত্যের প্রাণহীন আনুষ্ঠানিক অনুকরণ মাত্র।

এই নূতন অতিমানসের আমলে পূর্বেকার ধর্মানুষ্ঠান বা ধর্মমত বলে কিছু থাকবেনা ; সমগ্র জীবন নিয়েই হবে বিভিন্ন প্রকারে সেই মহা অনন্তের দিব্য অভিব্যক্তি ও দিব্যবিকাশ। মানুষ যাদের দেবতা বলে, তারাও আর থাকবেনা।

বড়ো বড়ো দেবদেবীরাও এসে এই নূতনের সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করবে, সেজন্য তাদেরও এই পৃথিবীতে এসে অতিমানসের আবরণ নিতে হবে। তা যদি না নিয়ে যেমন ছিল তেমনি থাকতে চায়, তাহলে এখানকার অতিমানস সত্তাদের সঙ্গে সমান সমান মিত্রালী হবে, কারণ এখানকার সত্তাতেও ভগবানের শ্রেষ্ঠবস্তু হবে অভিব্যক্ত।

পার্থিব জড়ের দেহ যখন অতিমানসত্ব প্রাপ্ত হবে তখন এখানে এসে জন্মানোকে আর তুচ্ছ বলা চলবে না, কারণ ওতেই এমন পূর্ণতাপ্রাপ্তির সুযোগ মিলবে যা অন্য কোনো উপায়ে মেলা সম্ভব নয়।

কিন্তু এ সবই হলো ভবিষ্যতের কথা। তার সবেমাত্র সূচনাই হয়েছে, পুরোপুরি সাফল্য দেখা দিতে বেশ কিছু সময় লাগবে। ইতিমধ্যে আমরা য়েছি এক অসাধারণ অবস্থাতে, যেমন আর কখনই হয়নি। এই সন্ধিস্থলে াড়িয়ে আমরা এমন এক নূতন জগতের জন্মের আভাসমাত্র দেখছি যার খন খুবই ক্ষীণ ও অতি শৈশব অবস্থা—ভিতরে তা নির্বল না হলেও বাইরে াই দেখাচ্ছে—তাই এখন একে চেনা যায় না, অধিকাংশ লোকে এর স্তিত্বকে অস্বীকারই করছে ; কিন্তু এখন তা বাস্তবিকই উপস্থিত, ক্রমাগত পরে ওঠাতে চেষ্টা করছে, সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। তবে যে রাস্তায় ার পরিণতি হবে তা সম্পূর্ণ এক নূতন রাস্তা, যা ইতিপূর্বে কখনই আবিষ্কৃত নি, আজ পর্যন্ত কেউ সে পথে অগ্রসর হয়নি। এই প্রথম তার আরম্ভ, পূর্ণ এক বিশ্বব্যাপী যাত্রাপথের নূতন সূচনা। এ একেবারে যথার্থই এক মহা ড্ভেঞ্চার, যা অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয়, অভূতপূর্ব।

তোমরা অনেকেই অ্যাড্‌ভেঞ্চার পছন্দ করো, তাই তোমাদের সকলকে আমি এই মহা অ্যাড্‌ভেঞ্চারে যোগ দিতে আহ্বান করছি। এতে পূর্বকালের মতো আধ্যাত্মিক তপস্যার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন হবে না, কারণ আমাদের প্রথম পদক্ষেপই শুরু হবে সেরূপ অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে। আমরা চলেছি এক নূতন সৃষ্টির অভিমুখে, যার আগাগোড়াই অভূতপূর্ব, যার মধ্যে রয়েছে অনেক ঝুঁকি অনেক সংকট, সব কিছুই তার অদৃষ্টপূর্ব। এটি হলো পুরো রকমেরই এক অ্যাড্‌ভেঞ্চার, যার অন্তে রয়েছে সুনিশ্চিত বিজয়, কিন্তু যার পথ হলো সম্পূর্ণ অজানা, প্রতি পদে পদে তাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার ক'রে চলতে হবে। উপস্থিত বিশ্বে এমন জিনিস আর কখনই হয়নি, ঠিক এ রকমটি আর কখনই হবেনা। এ সব কথা শুনে যদি উৎসাহ আসে মনে, তবে নেমে পড়ো এ পথে। এতে আগামী কাল যে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, আজ তা বলতে পারি না।

কিন্তু এ পথে পা দিতে হলে—এতাবৎ যা কিছু এঁচে রেখেছিলে, যা কিছু মতলব ঠিক করেছিলে বা যতটা যা গড়েছিলে, সব কিছুকেই ছেড়ে চলে আসতে হবে, সমস্তই ফেলে রেখে একেবারে সম্পূর্ণ অজানার মধ্যে ঝাঁপ দিতে হবে। তার পরে যা হবার তা হোক।"

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারত প্রসঙ্গে

"হে আমাদের ভারতমাতা, হে ভারতের অন্তর্নিহিত আত্মা, যখন চলেছিল ঘোর অন্ধকার দুর্দিনের যুগ, এমন কি যখন তোমার আপন সন্তানেরাও তোমার কথায় কান না দিয়ে তোমাকে অগ্রাহ্য ক'রে অন্য প্রভুদের দাসত্ব করছিল, তখনও তো তাদের তুমি পরিত্যাগ করোনি। এখন মুক্তির প্রথম প্রভাতের অরুণিমায় তোমার মুখমণ্ডল গৌরবালোকে উদ্ভাসিত, তোমাকে আমরা প্রণিপাত করি। নিয়ে চলো আমাদের আলোকের পথ দেখিয়ে, যাতে আমাদের এই মুক্তির দিগন্ত পরিণত হয় প্রকৃত মহত্ত্বের দিগন্তে, যাতে জগতের আন্তর্জাতিক সভাতে তোমার জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। নিয়ে চলো আমাদের মহৎ আদর্শের পথে, যাতে সকলের দৃষ্টি পড়ে তোমার প্রকৃত আননসৌন্দর্যের দিকে, যাতে তারা তোমাকে চিনতে পারে আত্মিক পথের দিশারী রূপে, ও সকল জগৎজনের হিতৈষী ও পরম বন্ধু রূপে।"

১৫-৮-১৯৪৭ —শ্রীমা

ভারত মাতা

"দেশ কাকে বলে? দেশ-মাতা বলতে কি বুঝি? তা কেবল একটা নির্দিষ্ট কোনো ভূমি খণ্ড নয়, তা কেবল একটা কথার কথা নয়, মনের আন্দাজে গড়া কল্প-কাহিনী নয়। দেশ হলো এক প্রবল শক্তি, যা তার কোটি কোটি সন্তানের কোটি কোটি শক্তি একত্রীভূত ও জমাট হয়ে গড়া।...এই শক্তিকেই আমরা বলি ভারত, ভবানী ভারতী, ত্রিশকোটি মানুষের সম্মিলিত শক্তির এক জীবন্ত ঐক্যরূপ।.." (শ্রীঅরবিন্দ)

"যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মাতৃভূমি কেবল বিস্তীর্ণ এক খণ্ড ভূমি কিংবা কতকগুলি মানুষের সমষ্টির পরিবর্তে তোমাদের মনশ্চক্ষুতে মাতৃরূপে প্রতিভাত না হচ্ছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি মহাভগবতী মাতৃশক্তির জলন্ত রূপে ও সৌন্দর্যে

তোমাদের মনকে ও হৃদয়কে অধিকার ক'রে না বসছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের তুচ্ছ ক্ষুদ্র ভয়ও ঘুচবেনা, আশাও জাগবেনা ; যখন সর্বগ্রাসী আগ্রহ ও প্রেম নিয়ে সেই মায়ের সেবাতে আত্মনিয়োগ করবে, তখনই সেই দেশপ্রেম অঘটন ঘটিয়ে তোমাদের রক্ষা করবে, আব তখনই এই অধঃপতিত জাতি পুনর্জন্ম লাভ করবে।...

দেশের লোকদের সেই দৃষ্টি যখন একবার খুলে যাবে, তখন তাঁর মন্দিরটিকে তৈরি ক'রে নিয়ে সেখানে তাঁর প্রতিমা স্থাপন ক'রে তাঁর কাছে আত্মবলি না দেওয়া পর্যন্ত কারো চোখে আর ঘুম নেই, কারো মনে আর শান্তি নেই, বিরতি নেই। যে বৃহৎ জাতির ও দৃষ্টি একবার খুলে গেছে সে কিছুতেই আর বিজেতার দাসত্বের জোয়ালে ঘাড় পাতে না।

মুক্ত ভারত এমন কাঠ পাথরের মতো জিনিস নয় যাকে খোদাই ক'রে জাতির প্রতিরূপ গড়া যাবে, কিন্তু তিনি আছেন তাদেরই হৃদয়ে যারা তাঁকে ভজনা করে, তাদেরই হৃদয় থেকে তিনি রূপ নেন। তাহলে আমরা স্বরাজ পাই কেমন ক'রে? নিজের অহংকে ত্যাগ ক'রে তার স্থানে জাতির ভাব-রূপকে বসিয়ে। শ্রীচৈতন্য যেমন আর নিমাই পণ্ডিত হয়ে না থেকে হয়ে দাঁড়ালেন কৃষ্ণ, হয়ে দাঁড়ালেন রাধা, হলেন বলরাম, তেমনি ভাবে আমাদের প্রত্যেকেরই কোনো স্বতন্ত্র জীবনের মধ্যে অবস্থান না ক'রে জাতির জীবনে অবস্থান করতে হবে। মুমুক্ষুর মন যেমন মুক্তির আশাতেই আবিষ্ট থাকে, আমাদের মনকেও তেমনি জাতির মুক্তির আশাতে আবিষ্ট রাখতে হবে। নামগোত্র-হীন হয়ে সন্ন্যাসী যেমন সর্বস্ব ত্যাগ করে, আমাদের ত্যাগও তেমনি হওয়া চাই। শ্রীচৈতন্য যেমন শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দেখবার জন্য প্রেমে পাগল হয়ে উঠে-ছিলেন, আমাদেরও তেমনি স্বাধীনতায় গৌরবান্বিত মায়ের মুখচন্দ্র দেখবার জন্য ব্যাকুলতা চাই। জগাই মাধাই যেমন রাজার অধীনতা ত্যাগ ক'রে মরিয়া হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্তনে যোগ দিয়েছিলেন, আমাদেরও দেশের জন্য ত্যাগ সেইরকম ধরনের হওয়া চাই। কার্থাগনের বাপমায়েরা যেমন তাদের শিশুদের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে নির্ভয়ে নিবেদন ক'রে দিতেন, আমাদের নিবেদনও তেমনি মায়ের যজ্ঞবেদিতলে নির্মম ও পুরোপুরি নির্ভয় হওয়া চাই। এখনও পর্যন্ত আমরা নিজেদের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থকে দুই দুই ভেবে ইতস্তত করছি ; আমরা মায়ের সেবাতে এক আনা মাত্র দিয়ে পনের আনা রাখছি নিজেদের স্বার্থের জন্য, স্ত্রী পুত্র পরিবারের স্বার্থের জন্য, নাম-ডাকের জন্য, নিরাপত্তা ও

আরামের জন্য। কিন্তু মা যে আমাদের সবই চান, তবেই তিনি নিজেকে দান করবেন...

আমরা যে প্রকল্প গড়ে তুলে জাতিকে গঠন করতে চাইছি, শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার প্রবর্তন, স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারা রাজনৈতিক পুনর্গঠন—এগুলি হলো দেশের গভীরতর পুনর্মুক্তির গৌণ জিনিস মাত্র, দেশের মুক্তির জন্য আত্মনিবেদনই প্রয়োজন। দেশমাতা চান না কোনো প্রকল্প, কোনো ব্যবস্থা, কোনো প্রণালী। তিনি নিজেই তার ব্যবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল জানেন। তিনি চান শুধু আমাদের হৃদয়, আমাদের প্রাণ, তার চেয়ে কম কিছু নয়, বেশি কিছু নয়···

পুনরভ্যুত্থান মানেই পুনর্জন্ম। তা কখনো বুদ্ধির জোরে হয় না, পয়সার জোরেও হয়না, কৌশলেও হয়না, শাসন যন্ত্র বদলালেও হয়না, হয় কেবল নিজের পূর্বপরিচয়কে আগুনে আহুতি দিয়ে মায়ের সন্তান হয়ে পুনর্জন্ম নিয়ে হৃদয়কে নতুন ক'রে দিলে। আত্মত্যাগই শুধু চাওয়া হচ্ছে আমাদের কাছে। মা জানতে চাইছেন, 'আমার জন্যে বাঁচতে চাও ক'জন? মরতে চাও ক'জন?'

এর জবাবের জন্যে তিনি অপেক্ষা ক'রে আছেন···"

('বন্দেমাতরম্' পত্রিকা)

"ভারতের যা মূল সূত্র তা ঠিকই থাকবে, তার আত্মার যা বৈশিষ্ট্য তাও ঠিক থাকবে, অনেকখানি বদলে যাবে তার দেহটা। যে নতুন দেহ তার গড়ে উঠবে তাতে তার দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজ, সবই নতুন হবে তার সেই আত্মারই নবযৌবনের ছাঁচে, আর এইরকমই হবে ভারতের পুনরভ্যুত্থান,—প্রাচীন জীবনসত্যের বিরোধী কিছু নয়, কিন্তু সেই সত্যকেই নতুন ক'রে মার্জিত ক'রে ত্রুটি বর্জিত ক'রে পুনঃপ্রকাশ করা···

আগেকার যা কিছু আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সবই পূর্ণজ্যোতিতে ফিরে আসবে, এই হবে তার প্রথম মূল ক্রিয়া; সেই জিনিসই নূতন আকারে প্রকাশ পাবে দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও বুদ্ধিক্রিয়াতে, এই হবে দ্বিতীয় ক্রিয়া; বর্তমান যাবতীয় সমস্যাগুলির সেই অনুসারেই সমাধান হবে, তার পরে তারই সমূহ সংশ্লেষণের দ্বারা সমাজ গঠিত হবে, এই হবে কঠিনতর তৃতীয় ক্রিয়া।

ভারতের পুনর্বিকাশ ও পুনর্জীবনের শক্তি নিয়তি কর্তৃক তার মধ্যে

অন্তর্নিহিত, তার ভবিষ্যতের প্রকৃত অর্থ রয়েছে সেইখানে। পার্থিব জীবনকে সর্বব্যাপক ও সর্বোচ্চ রকমে আধ্যাত্মিক ক'রে তোলা, সহস্র রকমের সহস্র উপায়ে তারই জন্য অনির্বচনীয় ভাবে সাধনা ক'রে গেছে ভারতের অতীত। এই হলো তার শেষ কর্তব্য ও শেষ লক্ষ্য, এরই কারণে তার জন্ম আর তাই হলো এর অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত মর্ম।" ('ভারতের সংস্কৃতির ভিত্তি')

ভারতের আত্মমর্ম

"ভারতীয় মনের মুখ্য সূত্র হলো আধ্যাত্মিকতা; অসীমের বোধ তা মজ্জার মধ্যে। আদিকাল হতেই ভারত জেনে এসেছে যে জীবনকে কেবল তার বাইরের দৃষ্টিতে ঠিক ভাবে দেখা যায়না, কেবল তার বাইরের শক্তির সাহায্যেই পুরোপুরি ভাবে জীবন ধারণ করা হয়না। যখন তার বুদ্ধিনির্ভরের যুগ আর উত্তরোত্তর অজ্ঞান তমসাচ্ছন্নতার যুগ এসেছিল, তখনও এই অন্তর্দৃষ্টিটিকে সে হারায়নি। প্রাকৃতিক নিয়মকে ও বাস্তবের শক্তির মহত্বকে সে অবশ্য যথোচিত ভাবেই স্বীকার করেছে; বস্তু বিজ্ঞানের যেখানে সার্থকতা সেখানে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কোনো অভাব হয়নি; আর সাধারণ জীবনকে সুষ্ঠু করবার দক্ষতাও তার অজানা ছিলনা। কিন্তু এই কথাই সে বুঝতো যে বাস্তবোত্তীর্ণ জিনিস কিছু আছে, যার সঙ্গে ঠিক সম্পর্কটি বজায় না রাখলে বাস্তবেরও সার্থকতা সম্পূর্ণ হয়না। এই কথা সে বুঝতো যে বিশ্ব জটিলতাকে মানুষের বর্তমান স্থূল দৃষ্টিতে দেখাও যায়না আর মামুলী ভাষা দিয়ে ব্যাখ্যা করাও যায়না, তার পিছনে অন্যান্য শক্তি কাজ করছে। মানুষের নিজের মধ্যেও অন্যান্য অনেক শক্তি রয়েছে যার কথা সে কিছুই জানেনা, জানে কেবল নিজের সামান্য অংশটুকু মাত্র। আর দৃশ্যকে সর্বদাই ঘিরে আছে অনেকখানি অদৃশ্য, বোধকে ঘিরে আছে বোধাতীত, যেমন সীমাকেও ঘিরে আছে অনন্ত অসীমা। ভারত এ কথাও জানতো যে মানুষের মধ্যে রয়েছে তার নিজেকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবার শক্তি, সে এখন যেমন আছে তার চেয়ে সম্পূর্ণ অন্যরূপে সে বৃহত্তর ও মহত্তর হয়ে উঠতে পারে,—এসব জিনিস ইউরোপ এখন সম্প্রতিই দেখতে শুরু করেছে এবং তাও তার সাধারণ বুদ্ধিতে বোধগম্য হচ্ছেনা। ভারত দেখেছিল যে মানুষের উপরেও অসংখ্য দেবতা আছে, দেবতার উপরেও ঈশ্বর আছে, আবার ঈশ্বরের উপরেও আছে তাঁর অবর্ণনীয় শাশ্বতী; সে জানতো

যে আমাদের জীবনের উত্তরেও অনুরূপ জীবনের অন্যান্য স্তর আছে, আমাদের বর্তমান মনের উত্তরেও মনের অন্যান্য পর্যায় আছে, এবং তারও উপরে আছে আত্মার পরমতম গরিমা। তার এই শান্ত ও অভ্রান্ত বোধির ফলে ক্ষুদ্রতা ও ভীতি বর্জিত হয়ে আধ্যাত্মিক বা জ্ঞানমার্গীয়, নৈতিক বা দুঃসাহসিক কোনো কাজেই সে পিছপাও হতোনা, সে জানতো যে ইচ্ছাশক্তিকে ও জ্ঞানশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারলে ঐ সব কিছুকেই সে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারে, এমন কিছু নেই যা তার আয়ত্তের অতীত; মনের ঐ সকল পর্যায়ে সে উঠে যেতে পারে, দেবতাত্মা হয়ে উঠতে পারে, ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে, অব্যক্ত ব্রহ্মেও পরিণত হতে পারে। এবং বিজ্ঞানোচিত মনোভাব নিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যবহারিক প্রণালী অনুসরণ ক'রে ভারত তার স্বাভাবিক একনিষ্ঠতা সহকারে তখনই তার সমুচিত উপায় খুঁজে বের করেছে। তাই সুদীর্ঘ কাল ধরে তার এই অন্তর্দৃষ্টি ও সাধনার অনুশীলন ক'রে ক'রে আধ্যাত্মিকতা হয়ে গেছে তার মজ্জাগত, চৈতন্যের দিকে তার ঝোঁক অতি প্রখর, অনন্তকে আয়ত্তীভূত করতে সে সদা আগ্রহী, এবং তার ধর্মপ্রবণতা, তার আদর্শানুগামিতা, তার যোগ, তার শিল্প ও দর্শন নিত্য সেই অভিমুখেই হয়েছে ক্রিয়াশীল।

কিন্তু কেবল এই তার মনস্তত্ত্বের সমস্তটা নয়, তার মর্মবস্তুর সবটুকু নয়। আধ্যাত্মিকতা বিকাশ পেতে পারেনা শূন্যতার উপরে, যেমন তলায় ভিত্তি না থাকলে পর্বত শৃঙ্গ খাড়া হয়ে উঠতে পারেনা উড়ন্ত মেঘের ভিতর থেকে স্বপ্নের কুহকের মতো। ভারতের অতীতের দিকে চাইলেই তৎক্ষণাৎ নজরে পড়বে যে কতখানি ছিল তার প্রবল প্রাণশক্তি, কেমন অফুরন্ত ছিল তার প্রাণের তেজ ও আনন্দ সম্পদ, কল্পনাতীত ও বহুমুখী তার কত সৃষ্টিপ্রতিভা। অন্তত পক্ষে তিন হাজার বছর যাবৎ—নিশ্চয়ই তার চেয়ে আরো বেশি হবে—ভারত পর্যাপ্তরূপে ও অবিরাম ভাবে সৃষ্টিকার্য ক'রে গেছে সকল দিক দিয়ে। সে একদিকে গড়েছে কত রাষ্ট্র ও রাজ্য ও সাম্রাজ্য, কত সম্প্রদায় ও ধর্ম-সংস্থা, কত আইন কানুন ও অনুষ্ঠানরীতি, বস্তুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, যোগ পদ্ধতি,—অন্যদিকে রাজনীতি ও শাসনরীতি, পার্থিব শিল্প, অধ্যাত্ম শিল্প, ললিত শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, আবার অন্যদিকে বিভিন্ন দর্শন, বিভিন্ন সংঘগঠন, প্রাসাদ গঠন, বিভিন্ন রূপ মন্দির ও বিরাট বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ গঠন, শিল্পরচনা, কাব্যরচনা—তালিকা হবে অফুরন্ত, অথচ এগুলির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তার কর্ম-

কুশলতার পরাকাষ্ঠা। ভারত কেবল সৃষ্টিকর্ম করেই চলেছে, করেই চলেছে, তবুও তার পরিতৃপ্তি হয়নি, ক্লান্তি আসেনি; কোনো কাজই সে শেষ ক'রে দিতে চায়না, বিশ্রামের ফাঁক পাবার দরকার হয় না, ক্লান্ত অবশ হয়ে কোনো কিছুকে ফেলে রাখতে চায় না। সে আবার তার সীমানা ছাড়িয়ে বাইরেও বেরিয়ে পড়ে; তার জাহাজ চলে যায় সমুদ্র পেরিয়ে, তার উদ্বৃত্ত অপূর্ব সম্পদরাজি ছড়িয়ে পড়ে জুডিয়াতে, মিশরে, রোমে; তার উপনিবেশগুলি ছড়াতে থাকে আশপাশের যত দ্বীপে উপদ্বীপে তার শিল্প ও মহাকাব্য ও ধর্মোপদেশ; এখনও তার চিহ্ন মেলে মিসোপটেমিয়ার বালুরাশির তলায়; তার ধর্ম প্রচারিত হয়ে জয় করে চীন ও জাপানকে, তার পরে পশ্চিমে আরো প্রসারিত হয়ে যায় প্যালেষ্টাইন ও আলেক্‌জেণ্ড্রিয়তে, শেষে উপনিষদের রূপক আর বুদ্ধের বাণীর প্রতিধ্বনি শোনা যায় খ্রীষ্টের মুখে। সর্বত্র তার জমিতেও যেমন প্রচুর ফলন হয়, তেমনি তার সকল কর্মেই জীবনের শক্তি-প্রাচুর্য ফুটে ওঠে। ইউরোপের সমালোচকেরা এই বলে অভিযোগ করে যে ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে ও শিল্পে কোনো সংযম নেই, সৌন্দর্য সম্পদের কোনো সংবরণ নেই, কোথাও একটুও ফাঁক রাখা হয়নি, সর্বত্র আনাচে কানাচে ও এক ইঞ্চির কোণটিকে পর্যন্ত সৌন্দর্যের অতিশয়তার ভারে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা দোষের কথা কিনা তা বলতে পারিনা, তবে তার জীবনের এতই প্রাচুর্য যে এইরকমই তার প্রয়োজন হয়েছিল, অনন্ত এই ভাবেই তার মধ্যে এমনি প্রাচুর্য ঘটিয়েছিল। অনন্ত যেমন বিশ্বস্থানের প্রত্যেক ইঞ্চিতে জীবনের ও শক্তির অবিরাম স্পন্দন জাগিয়ে যেতে থাকে তার আনন্ত্যেরই কারণে, ভারতও তেমনি তার প্রাচর্যকে প্রকাশ ও পুনঃপ্রকাশ না ক'রে পারেনা।

কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতার চরম বিকাশ ও জীবনের আনন্দে ও তেজে ঐরূপ সৃষ্টিপ্রাচুর্যই অতীত ভারতাত্মার সব কথা হলোনা। নিছক নীল অনন্তের আকাশস্বর্গ তলে গ্রীষ্মমণ্ডলবর্তী বনানীর মতো এমনিই যে এত কিছু এলোমেলো ভাবে গজিয়ে উঠেছে একথা মনে করা ঠিক না। যারা এরূপ দেখতে অনভ্যস্ত তাদেরই মনে হতে পারে যে জীবনের এতটা প্রাচুর্যের কোনো মাপজোপ বা শৃঙ্খলা ছিল না, তার প্রকল্প বিকাশের কোনো ভারসাম্য ছিলনা, কেবল ভিড় করেই অনর্থক জায়গা জুড়েছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতাত্মার মধ্যে একটা তৃতীয় রকমের শক্তি পুরোপুরি ভাবেই ছিল, তা হলো তার বুদ্ধিদীপ্তি—যে বুদ্ধি

একাধারে তীক্ষ্ণ অথচ সুগভীর সুদৃঢ় অথচ সূক্ষ্ম, ব্যাপক অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুবিশদ। তার প্রধান লক্ষ্যই ছিল শৃঙ্খলা ও সুস্থাপনার দিকে, কিন্তু তা আভ্যন্তরীণ বিধান ও সত্যের ভিত্তিতে, এবং যা ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও সার্থক হতে পারে। ভারতকে প্রধানত বলা যায় ধর্মের ও শাস্ত্রের দেশ। প্রত্যেকটি মানবীয় ক্রিয়ার বা বিশ্বক্রিয়ার ভিতরকার সত্য কি বা ধর্ম কি, তারই সে সন্ধান করতো; এবং সেটিকে আবিষ্কার করার পরে তাকে জীবনের ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সুষ্ঠু ও ন্যায্য ভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতো। তার প্রথম যুগ ছিল সৃষ্টির আভ্যন্তরীণ মর্ম আবিষ্কারের যুগ; তার দ্বিতীয় যুগ ছিল সেই ধর্ম আবিষ্কারের যুগ; আর তৃতীয় যুগ ছিল তাই থেকে শাস্ত্র প্রণয়নের যুগ। কিন্তু এই তিন যুগ একান্তরূপে স্বতন্ত্র ভাবে আসেনি, চিরদিন সবই হয়ে চলেছিল একত্রে।

এই তৃতীয় যুগে জীবনের বুদ্ধিকুশলতা আশ্চর্যরূপে বিকাশ পেলো বিজ্ঞানে ও নানা শিল্পে অতি অসাধারণ মাত্রায়। অশোকের কাল থেকে মুসলমান রাজ্যকাল পর্যন্ত এখানকার বুদ্ধিপ্রেরণার ক্রিয়াতে নানা রচনাসম্ভারের মাত্রা প্রকৃতই ধারণাতীত, সেটা তৎক্ষণাৎ বোঝা যায় বর্তমান কালের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফল থেকে, এবং তাও যতটা আজ আবিষ্কৃত হয়েছে তা এখনও যতটা মজুদ আছে তার সামান্য অংশ মাত্র, এবং যাও বা মজুদ আছে তাও পূর্বে যত কিছু লিখিত ও জ্ঞাত হয়েছিল তার সামান্য অংশ মাত্র। ছাপাখানার ও বর্তমান বিজ্ঞানের নানারকম সুযোগ সুবিধার উদ্ভাবনা হবার আগেকার কালে এখানে যত চূড়ান্ত রকমের বুদ্ধিবিকাশের কাজ হয়ে গেছে, জগতের ইতিহাসে তার তুলনা নেই; ঐ সব সুযোগ সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও নানা দিক থেকে গবেষণার কাজ প্রচুর করা হয়েছে ও তার সম্বন্ধে সকল কথা অতি নিপুণভাবে বিবৃতও করা হয়েছে, অথচ তাকে স্মৃতির মধ্যে সংরক্ষিত করা কিংবা নশ্বর রকমের তালপাতার পুঁথিতে লিখে রাখা ছাড়া অন্য কোনো প্রকারে স্থায়ী রাখার উপায় তখন ছিলনা। এবং সেই বিরাট সাহিত্য রচনা যে কেবল দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব ও যোগের বিষয়বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাও নয়,—ন্যায়শাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, কাব্য, নাটক থেকে চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং অন্যান্য বহুবিধ বিজ্ঞান প্রসঙ্গ পর্যন্ত, আর জীবনের সকল ব্যাপার নিয়েই, যেমন রাজনীতি, চিত্রবিদ্যা থেকে শুরু ক'রে নৃত্যগীত পর্যন্ত চৌষট্টি রকমের বিদ্যারই চরমভাবে চর্চা করা

হয়েছিল—এমন কি ঘোড়া ও হাতির সন্তানোৎপাদন ও প্রতিপালন করবারও আলাদা শাস্ত্র ছিল, তারও জন্য স্বতন্ত্ররকম পারিভাষিক ছিল ও প্রচুর গ্রন্থাদি ছিল। মহৎ ও উচ্চ বিষয় নিয়েই হোক বা অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়েই হোক, সব কিছুই লিখিত ও স্মৃতিতে সংরক্ষিত হতো অতি নিখুঁত ও নিপুণভাবে সমান যত্নের সঙ্গে। একদিকে ছিল যেমন জীবন রহস্যকে সর্বতোভাবে জানবার জন্য অতৃপ্ত কৌতূহল, অন্যদিকে ছিল তেমনি সঙ্গতিপূর্ণ জ্ঞানসঞ্চয় ক'রে তার সাহায্যে জীবনের যাত্রাপথকে সুষ্ঠু ও ছন্দিত ক'রে তোলার প্রবল ইচ্ছা। সুতরাং এক মজ্জাগত আধ্যাত্মিক আস্পৃহা, তার সঙ্গে জীবনের নানা সৃষ্টিপ্রেরণার অফুরন্ত বিকাশ, তার সঙ্গে মার্জিত মনের ন্যায়সঙ্গত নৈতিক বিচার ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ, এইগুলির চূড়ান্ত পরিণতি ও সমন্বয় ঘটেছিল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে।

ভারতের গৌরবের প্রথম অবস্থায় ছিল আধ্যাত্মিক সাধনার যুগ, যখন সে অস্তিত্বের সত্য নিরূপণের জন্য একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল বোধিমূলক মনের সাহায্যে ও আভ্যন্তরীণ অনুভূতির সাহায্যে, যাতে চৈত্য ও দৈহিক দুইরূপ অস্তিত্বেরই সদর্থ করা যায়। তার ফলে সেই প্রথম যুগেই যে তার উপর স্থায়ী ছাপ পড়েছিল তা কখনই নষ্ট হয়নি, বরং জাতীয় জীবনের প্রতি পদে নূতন নূতন আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও আবিষ্কারের ফলে সে মনোভাব আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এমন কি তার অধঃপতনের কালেও এই ছিল একমাত্র সম্বল, যা কখনই নষ্ট হতে পারেনি।

কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতার ঝোঁক যে কেবল ধরাছোঁয়ার বাইরে অদৃশ্য ও অমূর্ত গুহ্যরহস্যের দিকেই উঠিয়ে নিয়ে গেছে তা নয়; ওর আলোকশিখা নীচের দিকে এবং বাইরের দিকেও ছড়িয়ে পড়ে চিন্তার ও জীবনসম্পদের বহুবিভিন্ন দিককে তার অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েছে। তাই ভারতের গৌরবের সুদীর্ঘ দ্বিতীয় যুগ ছিল বুদ্ধিবিকাশের যুগ, নৈতিক উন্নতির যুগ, যাতে ঐ আধ্যাত্মিক সত্যের আলোতে জীবনকে সুগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হতো। আত্মিক সাধনার যুগের পর এলো ধর্মের যুগ; বেদ উপনিষদের পরে এলো শতাব্দীর পর শতাব্দী বীর্যবিকাশের ও সমাজ গঠনের কাল, চিন্তার ও দর্শনের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের বিকাশ, যখন ভারতীয় জীবনের ও সংস্কৃতির বাহ্য বড়ো বড়ো ধারাগুলি বীজরূপে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল।

সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকর্ষের চিরস্মরণীয় যুগে বুদ্ধিদীপ্তির বিকাশ সূক্ষ্মতর

ও সুন্দরতর ভাবে ফুটে উঠল বিদ্যায়, বিজ্ঞানে, শিল্প ও সাহিত্য রচনায়, রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে, সাংসারিক জীবনে। এই সময়টিতে কেবল সৌন্দর্যবোধের দিক দিয়ে নয়, কিন্তু ভাবপ্রবণতা ও প্রাণানুভূতির দিক দিয়েও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব প্রাণ-মনগত তৎপরতার পিছনে প্রেরণাদান করেছে সেই আগেকার আধ্যাত্মিকতা। এই স্মরণীয় যুগের পরবর্তীকালে নিম্নতর স্তরের জীবনকেও উচ্চে ওঠাবার এবং তার উপর আত্মিক সত্যের প্রভাব বিস্তার করবার প্রচেষ্টা হয়েছে। তার থেকেই উদ্ভাবিত হয়েছে পুরাণ ও তন্ত্র এবং ভক্তিমূলক ধর্ম। এরই শেষ ফুলটি ফুটে উঠল বৈষ্ণব ধর্ম, যাতে ভাবময় সত্তার সৌন্দর্যবোধ ও হৃদয়ের ভক্তিকে নিয়োগ করা হলো পরমাত্মার সেবাতে। এই ভাবে সর্ববিধ উৎকর্ষের বৃত্তটি সম্পূর্ণ হলো···

প্রথমে ছিল বৈদিক যুগ···দ্বিতীয় হলো পুরাণ তন্ত্রের যুগ···তৃতীয় যুগ হবে ভবিষ্যতের যুগ, যা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রস্তুত হচ্ছে। তার যা মূল সূত্র তা বেরিয়ে পড়েছে কখনো বা সীমাবদ্ধ কখনো বা বৃহৎরূপে, কখনো বা প্রচ্ছন্ন কখনো বা সুস্পষ্ট আকারে নানা আধ্যাত্মিক অভ্যুদয় ও শক্তিগর্ভ নবধর্মের ভিতর দিয়ে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার ঠিক পথটি খুঁজে পায়নি ও মানবজীবনে নতুন রেখাপাত করেনি। কারণ ঘটনা ছিল প্রতিকূল, সময় এখনও তাই আসেনি।

ভারতের আধ্যাত্মিক মনের যে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তার মধ্যে রয়েছে দুইমুখী প্রেরণা। এক হলো এর ইচ্ছা সর্ব মানবকে এক সম্প্রদায়ভুক্ত করা, এবং তার মধ্যে প্রত্যেক জন যাতে তার শক্তি অনুযায়ী সর্বোচ্চ আলোকপ্রাপ্ত হয়ে নিজেদের সমগ্র জীবনকে পূর্ণ আত্মিক সত্যের ও অভিব্যক্ত শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে।

কিন্তু সময়ে সময়ে এর এক সর্বোচ্চ দৃষ্টিলাভও ঘটেছে, যাতে সে জেনেছে যে কেবল শাশ্বতের অভিমুখে উঠে যেতে পারাই সম্ভব নয়, কিন্তু এটাও সম্ভব যে ভগবৎ চেতনা নীচে নেমে এসে মানব চেতনাকে দিব্য চেতনাতে রূপান্তরিত ক'রে দেবে। সে এটা অনুভব করেছে যে মানুষের মানবতার মধ্যে ভগবত্তা লুকিয়ে আছে, এতেই তার মনের এত জোর। ইউরোপের ধর্ম সংস্কারকের বা তার অনুকরণকারীদের মাথায় এটা ঢুকবে না বা তাদের ভাষাতেও তা প্রকাশ পাবেনা। যুক্তিবাদী বা অধ্যাত্মবাদী খুঁতখুঁতে রুচি-

যোগীশদের কল্পনায় এটা আসবেনা, এবং তাড়াতাড়ি এই নিয়ে কল্পনা করতে চেষ্টা করতে বসলেই তা ব্যর্থ হবে। এ দৃষ্টি যে সত্যের দিকে নির্দেশ দিচ্ছে তা মানব মনের অতীত, এবং মানুষদের মধ্যে যদি এ সত্য উদ্বোধিত হয় তাহলে মানব জীবন রূপান্তরিত হবে দিব্য অতিমানসের জীবনে।

আর যতদিন পর্যন্ত এই আধ্যাত্মিক বিবর্তনের তৃতীয় বৃহত্তর যুগটি এসে তার অধিকার স্থাপন না করছে, ততদিন ভারতীয় সভ্যতার অভিপ্রেত কর্তব্য শেষ হবেনা, তার শেষ কথাটি বলা হবেনা, তার প্রতি যে ভার দেওয়া হয়েছে মানবজীবন ও পরমাত্মার মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে মিলিয়ে দেবার, তার সমাপ্তি হবে না।" ('ভারতের সংস্কৃতির ভিত্তি')

ভারতের ধর্ম

"ভারতের ধর্ম কোনো একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা ধর্মমতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কেবল যে বিভিন্ন রকমের বহু সংখ্যক ধর্ম সংগঠনই এর অন্তর্ভুক্ত তাই নয়, কিন্তু ধর্মের ক্রম বিবর্তনের পথে যখনই যেটা গজিয়ে উঠেছে তখনই তাকে এর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে, কোনোটিকেই অস্বীকার করা বা ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়নি ; গুহ্যবিদ্যাও এর মধ্যে চূড়ান্তে গিয়ে পৌছেচে, সব রকমেরই অধ্যাত্ম দর্শন এর মধ্যে গৃহীত হয়েছে, যার ফলে তা অতি গভীরে প্রবেশ করাতে সকল রকমেরই উপলব্ধি ও অনুভূতি ও আত্মশুদ্ধি সম্ভব হতে পেরেছে।

এর কাজের যা প্রণালী তা স্বয়ং বিবর্তনমুখী প্রকৃতিরই প্রণালী। অর্থাৎ সকল অগ্রগতিকেই স্থান দেওয়া, আত্মার সকল প্রকার যোগাযোগ ক্রিয়াকে ও মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলনের সকল পথকে মেনে নেওয়া, লক্ষ্যে পৌছবার সকল রাস্তাই শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা ক'রে দেখা……এমনকি আদিম যুগের কোনো ধারাকেই বর্জন না ক'রে তারও গভীরতর তাৎপর্য নিরূপণ করা হয়েছে, এদিকে অনন্তের অনুভূতির চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক চাপও বহন করা হচ্ছে।……

এখন আমাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, 'তাহলে হিন্দুধর্ম জিনিসটা কি, তার শিক্ষা কি, সাধনা কি, তার সাধারণ কি গুণ আছে?' তার জবাবে আমরা বলব যে ঐ ধর্ম তিনটি মূল সর্বোচ্চ ও ব্যাপক অধ্যাত্ম অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথম কথা, বেদের উক্ত অভিন্ন একের সর্বৈব অস্তিত্ব,—যাকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে, যাকে উপনিষদ বলেছে একমেবাদ্বিতীয়ম্, যিনি সর্বময় ও সর্বাতীত, বৌদ্ধেরা যাকে বলে অক্ষয়, মায়াবাদীরা বলে পরমব্রহ্ম, ঈশ্বর-বাদীরা যাকে বলে পরমেশ্বর বা পরম পুরুষ, যাঁর মধ্যে আত্মা ও প্রকৃতি একত্রে বিধৃত—এক কথায় যিনি শাশ্বত, যিনি অনন্ত। এই হলো প্রথম সর্বগ্রাহ্য ভিত্তি। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি একে অশেষ রকমের বৈচিত্র্যে ও বিবিধ তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে, এবং তাই করেছে। আধ্যাত্মিক অনুভূতির শেষ লক্ষ্য ও চূড়ান্ত প্রয়াস হলো এই অক্ষয়, অনন্ত, শাশ্বতের সঙ্গে যে-কোনো ভাবে ও যে-কোনো মাত্রাতে মিলিত হবার জন্য যে-কোনো উপায় আবিষ্কার করা। ভারতের ধর্মানুরাগী মনের এই হলো প্রথম সর্বজনীন সারসূত্র।

এই ভিত্তিকে ধরে যে-কোনো ধর্মমতই তুমি যেনে নাও, এই মূল আধ্যাত্মিক লক্ষ্য নিয়ে ভারতে প্রচলিত হাজার পথের যে-কোনো পথই তুমি বেছে নাও, কিংবা ওর থেকে শাখায়িত আরো যা কিছু নতুন পথই তুমি খুঁজে বের করো, এই মূল হিন্দুধর্মের কেন্দ্রের মধ্যেই তুমি থাকবে। এর দ্বিতীয় মূল কথা এই যে,—মানুষ বহুবিধ উপায়েই সেই শাশ্বতের ও অনন্তের নাগাল পেতে পারে। যিনি অশেষ তাঁর নানা রকমারিও অশেষ, এবং তার প্রত্যেকটাই সেই শাশ্বত।......প্রকৃতির ক্রিয়াগুলির পশ্চাতে আমরা যে সব দেবতাদের জানি ও বিভিন্ন শক্তিরূপে পূজা করি, তাঁরা হলেন সেই একই পরমতম দেবতার বিভিন্ন নামরূপ ও ব্যক্তিরূপ। যা কিছু ঘটেছে এবং ঘটছে তাকে আমরা ভালোই বলি আর মন্দই বলি, তাতে সায় দিই কিংবা নাই দিই, তাকে সৌভাগ্যই বলি বা দুর্ভাগ্যই বলি, সব কিছুরই পশ্চাতে রয়েছে এক অসীম চিৎ-শক্তি, একই নিয়ামক তেজ বা ইচ্ছা বা বিধান, মায়া বা প্রকৃতি, শক্তিক্রিয়া বা কর্ম। অনন্তই হলেন স্রষ্টিকর্তা, তিনিই তখন ব্রহ্মা; তিনিই হলেন রক্ষক, তিনিই তখন বিষ্ণু; তিনিই ধ্বংস করেন বা নিজের মধ্যে লয় ক'রে নেন, তখন তিনিই হলেন রুদ্র বা শিব। যে মঙ্গলময়ী কল্যাণময়ী পরমা শক্তি জগৎকে পালন করছেন ও রক্ষা করছেন, তিনি তখন হচ্ছেন জগন্মাতা লক্ষ্মী বা দুর্গা। কিংবা বিনাশের ছদ্মরূপেও যিনি মঙ্গলময়ী, তিনি তখন চণ্ডী বা কালী। একই পরম দেবতা তাঁর বিভিন্ন গুণে অভিব্যক্ত হচ্ছেন বিভিন্ন নামধারী বিভিন্ন পূজ্য দেবতারূপে। বৈষ্ণবের প্রেমময় প্রভু,

শাক্তের শক্তিময়ী মাতা, যেন দুই স্বতন্ত্র দেবতার মতো মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই একই অনন্ত দেবতা, এইভাবে দুই বিভিন্ন রূপ নিয়েছেন। (ভারতের বহু-দেবার্চনার এ ব্যাখ্যা পাশ্চাত্যের টিটকারির জবাবে নতুন উদ্ভাবন করা হয়নি; গীতাতে এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবেই রয়েছে; তার চেয়ে আগেকার উপনিষদেও এই ধরনের উক্তি আছে; তারও আগেকার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিসম্পন্ন আদিম বৈদিক কবিরাও তাঁদের বেদ গাথায় একথা স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন।) সেই পরম ব্রহ্মকে তুমি যে-কোনো নামে ও যে-কোনো আকারেই ডাকতে পারো, জ্ঞানেই হোক বা অজ্ঞানেই হোক; তারই ভিতর দিয়ে এবং তাকেও ছাড়িয়ে গিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত আসল ও চরম অনুভূতিতে গিয়ে পৌছতে পারি……

ভারতীয় ধর্মের ভিত্তিতে সবচেয়ে প্রধান তৃতীয় কথা যেটি, তা হলো তার আধ্যাত্মিক জীবনের সক্রিয় পরিণতির ব্যাপারে। তা এই যে পরম ব্রহ্মের বা ভগবানের দিকে তুমি যে-কোনো সার্বভৌম চেতনার ভিতর দিয়েই অগ্রসর হও এবং প্রকৃতির বাহ্য ও আভ্যন্তর দখলকে ভেদ ক'রে চলে যাও, শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে তৎ বা তিনি প্রত্যেকের নিজ নিজ অন্তরাত্মার মধ্যেই অন্তর্বাসী হয়ে রয়েছেন, অর্থাৎ অন্তরাত্মার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা তাঁর সঙ্গে অভিন্ন অথবা অন্ততপক্ষে সেই মূল অস্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ভারতীয় ধর্মের সার কথাই হলো তাই যে এমনভাবে নিজেকেই ফুটিয়ে তুলতে হবে যাতে আত্মজ্ঞান-আচ্ছন্নকারী অজ্ঞানতাকে জীবন ও মনের উপর থেকে হটিয়ে সেই চূড়ান্ত উপলব্ধিতে গিয়ে পৌছতে পারি যে ভগবান আমারই মধ্যে অবস্থান করছেন।

এই তিনটি মূল সূত্রকে একত্রে নিয়েই সমগ্র হিন্দুধর্ম। এই হলো তার ভিতরকার আসল কথা, এবং যদি ভারতের ধর্মমত জানতে চাও, তবে এই ই তার ধর্মমত।"

ভারতের ধর্ম শাস্ত্রাদি

বেদ

"বেদের কি প্রকৃত চরিত্র তা ওর যে-কোনো স্থান খুলে ওর নিজস্ব বাক্য ও ভাবরূপের সোজাসুজি অর্থ করে নিলেই বোঝা যাবে। কোনো খ্যাতনামা

জার্মান পণ্ডিত তাঁর উচ্চতর বুদ্ধির মঞ্চ থেকে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে বেদের মধ্যে মহৎ ভাব রয়েছে যারা বলে তারা নির্বোধ, তিনি বলেন যে, ওর মধ্যে কতকগুলি ছেলেমানুষি অর্থহীন বিসদৃশ কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নেই। কেবল একঘেয়ে নিম্নধারণার মামুলী উক্তি, যাতে মানব প্রকৃতির হীন স্বার্থপরতা ও পার্থিবতাই প্রকাশ পায়। কেবল স্থানে স্থানে কিছু বিরল রকমের উচ্চভাব আছে যা অন্তরের গভীর থেকে বেরিয়ে এসেছে। বেদের ঋষিদের উচ্চারিত বাক্যের উপর যদি আমরা নিজেদের ধারণাগুলোকে চাপাই তাহলে তার ঐরূপ অর্থ হয়তো করা যেতে পারে। কিন্তু আদিম বর্বর যুগের লোকেরা ঐরকম কথাই বলতে পারে, এই কথাই ভেবে নিয়ে ঐভাবে মিথ্যা অনুবাদ না ক'রে, সেগুলি যেমন ভাবে উক্ত হয়েছে তেমনি ভাবেই যদি পড়ে যাই, তাহলে দেখতে পাব যে ওর মধ্যে রয়েছে সুপবিত্র ও মহীয়ান ভাবগম্ভীর উঁচুদরের কাব্য এবং তার ভাষা ও ভাব অতি শক্তিদীপ্ত। যদিও তার ভাষা ও কল্পনা এখনকার রুচি ও রীতি অনুযায়ী তেমন প্রণিধানযোগ্য নয়, তা হলো তখনকার প্রকাশভঙ্গির দ্বারা গভীর মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিতে সমৃদ্ধ, এবং অন্তরের অন্তর্দৃষ্টি থেকে তা স্বতঃ উৎসারিত হয়েছে। এখানে বেদের নিজস্ব ভঙ্গীতে নিজস্ব উক্তি কিছু উদ্ধৃত করি :

'অবস্থার পর অবস্থার জন্ম হচ্ছে। আবরণের পর আবরণ সচেতন হয়ে উঠছে : মায়ের (অদিতির) কোলে বসে তিনি দেখছেন সবই। হে রশ্মি, লীলায়িত হও, ক্রীড়াচ্ছলে আমাদের কাছে প্রকাশিত হও।'

কিংবা পরবর্তী গাথাতে যেমন আছে—

'...হে শোভনকর্মা দেবতা, আমরা যেন সম্পদের ও ঋতের ও কিরণের যোগ্য হই, আমরা যেন আনন্দমাতাল হই বীরগণের সঙ্গে সঙ্গে।'

অবশেষে তৃতীয় গাথাটি দেখ যা যজ্ঞের সাধারণ প্রতীক নিয়ে বলা—

'...মর্ত্য মানব যেন দিব্য অগ্নির আরাধনা করে দেবযজ্ঞের সহিত। হে সমুজ্জ্বল শুভ্রজ্যোতি, সমিদ্ধ হয়ে ঋতের কোলে আসন পাতো, শান্তির কোলে আসন পাতো।'

এর মধ্যে যে রূপকগুলি আছে তার যেমন অর্থই আমরা করি না কেন, এ হলো মিষ্টিক্ ধরনের রূপকপ্রধান কাব্য, এই হলো খাঁটী বেদ·· এইসব দ্রষ্টা ঋষিদের চোখে মানব জীবন ছিল সত্য মিথ্যায় মিশ্রিত, যাদের অভিযান মরত্ব হতে অমরত্বের দিকে, মিশ্রিত আলো-আঁধারি হতে দিব্য সত্যের পূর্ণ

জ্যোতির দিকে, যাদের স্বঘর হলো উপরের দিকে অনন্তের মধ্যে, কিন্তু তা এখানেও মানুষের আত্মায় ও তার জীবনের ক্ষেত্রে গড়ে তোলা যেতে পারে। যেখানে চলেছে আলোর সন্তানদের সঙ্গে আঁধারের সন্তানদের সংগ্রাম, যেখানে সম্পদ ও সমৃদ্ধি মিলবে, জয়লাভ হলে দেবতারা মানব যোদ্ধাদের বরদান করবেন, যেখানে যাত্রাপথে চলবে আত্মদানের পালা ; এই সকল কথাই তাঁরা বলেছেন নির্দিষ্ট একরূপ রূপকের মাধ্যমে, এবং সে রূপক তাঁরা নিয়েছেন প্রকৃতির ভিতর থেকে, আর নিয়েছেন তখনকার আর্যদের কৃষিজীবন ও পশুপালন ও যোদ্ধবৃত্তির বিষয়গুলি থেকে,—আর তার কেন্দ্রে ছিল অগ্নি উপাসনা ও প্রাকৃতিক জীবন্ত শক্তি সমূহকে দেবতাজ্ঞানে উপাসনা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান।

বাহ্য অস্তিত্বের ও যজ্ঞ ক্রিয়ার যে সব খুঁটিনাটি বর্ণনা ওর মধ্যে আছে সেগুলি প্রতীক হিসাবে জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বেদের কাব্যের মধ্যে তা মৃত বা কৃত্রিম উপমামাত্র নয়—কিন্তু অন্তরের ভিতরকার ব্যাপার সম্পর্কে জীবন্ত ও জোরালো ইঙ্গিত। তাঁরা তাঁদের ভাবপ্রকাশের জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট অথবা বিভিন্ন প্রকার রূপক ব্যবহার করতেন যাতে উপমা ও অতিকথার জাল বোনা হতো, রূপক পরিণত হতো উপমাতে, উপমা পরিণত হতো অতিকথায়, এবং তা রূপক হয়েই থেকে যেতো। কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ কেবল তারাই বুঝতো যাদের বাস্তব ধরনের চৈত্য অনুভূতির মধ্যে কিছু প্রবেশলাভ ঘটেছে। স্থূল জিনিস সেখানে মিলিয়ে যেতো চৈত্যের দীপ্তচেতনার মধ্যে, এবং তা আরো গভীরতর হয়ে পরিণত হতো আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে। এগুলির মধ্যে কোনো সীমারেখা ছিলনা। পরস্পর পরস্পরের ইঙ্গিতার্থ ও বর্ণালীর মধ্যে মেশামেশি হয়ে যেতো···

এই যে অগ্নিকে সম্বোধন ক'রে বলা, 'হে অগ্নিশিখা, তুমি লেলিহান রূপে আমাদের কাছে প্রকাশ হও', এটা স্থূল যজ্ঞবেদীতে উৎপন্ন যজ্ঞাগ্নির শিখাকেই উদ্দেশ ক'রে বলা হচ্ছে, কিন্তু বস্তুত তা অন্তরস্থ চৈত্যের অনুরূপ অবস্থারই প্রতীক। আমাদের অন্তরের মধ্যে অনুরূপ ভগবৎ শক্তির বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠুক তারই কামনা। ···বেদে যে বৃষ ও গাভীর কথার উল্লেখ আছে, 'সূর্যের আলোকধেনু গুহার কন্দরে রয়েছে লুক্কায়িত', এ সব কথা বাস্তবধর্মী মনের কাছে অদ্ভুত বলেই বোধ হবে,—কিন্তু ঐ সকল কোনো জিনিসই বস্তুত স্থূল পৃথিবীর নয়। কিন্তু অন্তরের স্তরে তা রূপক হিসাবে

খুবই বাস্তব এবং জীবন্ত তাৎপর্যসূচক। বেদের কাব্যগুলিকে আমাদের আগাগোড়া এই ভাবেই গ্রহণ করতে হবে। যদিও তা আমাদের কাছে অদ্ভুত ও অপ্রাকৃত বলে ঠেকে, তথাপি তাকে নিতে হবে তার আপন দৃষ্টিভঙ্গীতে রূপক হিসাবে একটা সত্যেরই ভাবপ্রকাশ বলে।

এইভাবে বেদকে গ্রহণ করতে পারলে তখন দেখা যাবে যে জগতের মধ্যে সবচেয়ে আদি অথচ এখনও-জীবিত-ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও, এবং মানুষ ও ভগবান ও বিশ্বকে নিয়ে আদি যুগের সর্বপ্রথম ভাবনাধারা ছাড়াও, এ হলো এক অপূর্ব মহিমাময় অমর কাব্যসৃষ্টি।

…মানুষের সকল ভাবনার সূত্র হলো সত্যের এবং আলোর এবং অমরত্বের জন্য অনুসন্ধান। আমাদের এই যে বাহ্য অস্তিত্বের সত্য, এর চেয়েও কোনো গভীরতর ও উচ্চতর সত্য আছে, আমাদের এই যে বুদ্ধির দীপ্তি তার চেয়েও প্রবলতর ও উচ্চতর আলোর দীপ্তি আছে, যাকে মিলতে পারে অন্তর্বিকাশ ও প্রেরণা হতে, আছে এক অমরত্ব যেখানে অন্তরাত্মাকে তার সত্যে গিয়ে উঠতে হবে, সেখানে যাবার পথ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, ও সেই অমরত্বের স্পর্শলাভ করতে হবে। 'সপন্ত ঋতম্ অমৃতম্' সেই সত্যের মধ্যে জন্ম নিয়ে সেই সত্যেরই জগতে লালিত হতে হবে। অর্থাৎ আমাদের নিজেদেরকে ভগবানের সঙ্গে মিলিত করে মরত্ব হতে অমরত্বে উত্তীর্ণ হতে হবে। বৈদিক অগমবাদী ঋষিগণের এই হলো প্রথম ও প্রধান কেন্দ্রগত শিক্ষাদান।……

এখানকার জগতে নিম্নতর সত্যও রয়েছে মিথ্যা ও ভ্রান্তির সঙ্গে মিশ্রিত, 'অনৃতস্য ভূরেঃ'। আবার খাঁটী সত্যেরও জগৎ বা স্বধাম রয়েছে, 'সদনম ঋতস্য' যেখানে সত্য অভ্রান্ত ও বৃহৎ, সত্যম্ ঋতম্ বৃহৎ, যেখানকার চেতনা সম্পূর্ণ সত্যময়, ঋতচিৎ। এর মাঝখানে আবার আরো অনেক জগৎ আছে, ত্রিস্বর্গ পর্যন্ত, এবং তার আলোও বিভিন্ন। কিন্তু এই হলো সর্বোচ্চ আলোর জগৎ—যাকে বলে সবিতার বা সত্যের জগৎ। 'স্বর' অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্বর্গ। ঐ স্বর্গে যাবার সত্যের পথই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, ঋতস্য পন্থা, যাকে অনেকে বলে দেবতাদের পথ। এই হলো তাঁদের দ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় জ্ঞানদান।

তৃতীয় কথা এই যে আমাদের জীবন হলো সত্য এবং আলোকের জগতের অমর দেবতাদের শক্তির সঙ্গে তমিস্র জগতের শক্তিদের যুদ্ধক্ষেত্র। ঐ সকল

শক্তিদের নানারূপ নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন বৃত্র ও বৃত্রগণ, বল ও পাণিগণ, দস্যু ও দস্যুরাজগণ। এই সকল তমিস্র শক্তিরা ঢাকনির দ্বারা আলোকে আড়াল ক'রে আমাদের তার থেকে বঞ্চিত করে। তাদের সেই বিরোধিতা নাশ করবার জন্য দেবতাদের সাহায্য আমাদের আহ্বান করতে হয়। তারাই সত্যের প্রবাহকে, ঋতস্য ধারা, ও স্বর্গের আগন্তুক ধারাকে অবরোধ করে এবং আত্মার উন্নয়নকে সর্বপ্রকারে বাধা দেয়। তাই আভ্যন্তরীণ যজ্ঞের দ্বারা আমাদের প্রার্থনা জানাতে হয় দেবতাদের কাছে, মন্ত্রের দ্বারা তাঁদের আহ্বান করতে হয়—মন্ত্রগুলি সেইরূপ বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন, যজ্ঞের দ্বারা তাঁদের কাছে হব্য নিবেদন করতে হয়, যার ফলে তাঁরা আমাদের কৃপা দান করেন। এই উপায়ে আমরা লক্ষ্যে উঠে যাবার একটা পথ তৈরি ক'রে নিতে পারি।

বেদে যে বাহ্য যজ্ঞের উপাদানগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি সবই আভ্যন্তরীণ হব্যের ও আত্মনিবেদনের প্রতীক; আমরা নিজেরা যা, এবং নিজেদের যা কিছু আছে, সবই দিয়ে দিতে হবে, যাতে উপরের দিব্য সত্য এবং আলোকের অপূর্ব সম্পদ নেমে আসে আমাদের জীবনে, এবং তা সত্যের মধ্যে আমাদের আধ্যাত্মিক জন্মলাভের সম্পদ স্বরূপ হয়ে আসে—সমুচিত চিন্তাধারা, সঠিক বোধোদয়, অভ্রান্ত কর্মরীতি, যেন এগুলি আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায় উচ্চতর সত্যের প্রেরণাতে, ঋতস্য প্রেষা, ঋতস্য ধীতি, এবং তার ফলে আমরা যেন সেই সত্যের মধ্যে নিজেদের গড়ে তুলতে পারি। আমাদের এই যজ্ঞ হলো এক পথযাত্রা, এক তীর্থযাত্রা, এক যুদ্ধযাত্রা—আমরা চলেছি ঐ দেবতাদের সকাশে, এবং আমাদের যাত্রাপথের যিনি নেতা ও পথপ্রদর্শক তিনি হলেন অগ্নি, অর্থাৎ নিজেদের অন্তরস্থ আভ্যন্তরীণ অগ্নিরই শিখা। আমাদের মানবীয় সত্তা এই গুহ্য অগ্নির তেজে অমর সত্তাতে উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্গে উঠে যাবে, এবং স্বর্গের দিব্য বস্তু নেমে আসবে আমাদের মধ্যে। ঋগ্বেদের এই শিক্ষার মূল মর্মগুলিই হলো বেদান্তের শিক্ষার বীজস্বরূপ, তেমনি ওর মধ্যে যে সকল আভ্যন্তরীণ অভ্যাস ও নিয়মাদির নির্দেশ আছে তা হলো পরবর্তী কালের যোগ রীতির বীজস্বরূপ।

শেষ কথা এই, বৈদিক গূঢ়মর্মী আদি কবিরা অদ্বিতীয় একের তত্ত্বই প্রচার করেছেন, একম্ সৎ কিংবা তৎএকম্, আর উপনিষদেরও তাই কেন্দ্রীয় তত্ত্ব। দেবতাগণ এবং আলোক ও সত্যের সকল শক্তি সেই একেরই নাম ও একেরই শক্তি, আর সকল দেবতাই তিনি, সকলে তাঁর মধ্যেই বিধৃত। সত্য সেই

একই, তৎসত্যম্। সেই একই আনন্দ সত্তায় আমাদের উঠতে হবে। কেবল বেদে এই কথাই বলা হয়েছে একরূপ রূপকের অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে।

আরো অনেক কথা অবশ্য আছে, কিন্তু এই হলো সার মর্ম।"

উপনিষদ

"উপনিষদগুলি হলো ভারতীয় মনের চরম অবদান, তার মানসিক প্রতিভার সর্বোচ্চ আত্মবিকাশ, তার সুমহান কাব্যধারা, তার চিন্তা ও বাক্যের সর্বোত্তম সৃষ্টি যার সঙ্গে কোনো সাধারণ সাহিত্যপ্রতিভার বা উৎকৃষ্ট কাব্যের তুলনাই হয়না, যার বাণীর বন্যা প্রবাহ সরাসরি বেরিয়ে আসে গভীর আধ্যাত্মিক দিব্য-দৃষ্টির ভিতর থেকে, এই হলো এর আশ্চর্য ব্যাপার,—ভারতীয় আত্মার ও মনের অসাধারণ অনুভূতিধারার অপূর্ব এক অতুলনীয় নিদর্শন। উপনিষদকে বলা যায় অতি অগাধ ধর্মশাস্ত্র—কারণ অতি গভীরতম আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথাই ওর মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে—ওর মধ্যে এমন বোধিমূলক দর্শনোক্তি আছে যার আলো এবং শক্তি এবং ব্যাপকতা অফুরন্ত, যা কোথাও বা কবিতায় আর কোথাও বা ছন্দায়িত গদ্যে রচিত, যা এসেছে অভ্রান্ত প্রেরণার ফলে এবং যার প্রতিটি ছত্র আশ্চর্য ছন্দে ও ভাবে মুখর, প্রতিটি বাক্য অর্থপূর্ণ ও অকাট্য। এগুলি মনের যে অবস্থা থেকে বেরিয়েছে সেখানে ধর্ম আর দর্শন আর কাব্য একত্রে মিলে এক হয়ে গেছে,—কারণ সে ধর্ম কোনো মত বিশেষে কিংবা ধর্মনৈতিক অনুশাসনে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু তা উঠে চলে গেছে অনন্ত ভগবানকে ও পরমাত্মাকে আবিষ্কারের দিকে, তা আমাদের সত্তার সর্বোচ্চ বাস্তব পরিণতি নিয়ে জ্ঞানদীপ্তিতে ও পূর্ণ অনুভূতিতে পরমানন্দে মুখর,—আর সে দর্শনজ্ঞান সত্য সম্বন্ধে কোনো বুদ্ধিকল্পিত শুষ্ক তত্ত্বজাল মাত্র নয়, কিন্তু সে সত্য বাস্তবে দৃষ্ট ও অনুভূত ও অন্তরে অন্তরে আয়ত্তীভূত হওয়াতে তারই সুনিশ্চিত আবিষ্কারের আনন্দ বাণীরূপে উচ্ছ্বসিত,—আর সে কাব্য হলো সাধারণ স্তর হতে উর্ধ্বে উত্থিত কান্ত মানসের অপূর্ব সৃষ্টি, যা বিরল আধ্যাত্মিক আত্মদর্শনের বিস্ময় ও সৌন্দর্যকে এবং আত্মার ও বিশ্বের ও ভগবানের সুগভীর দীপ্তিময় সত্যকে সামনে দেখে অতুলনীয় ছন্দে বিকশিত ক'রে ব্যক্ত ক'রে তুলেছে। এখানে বৈদিক ঋষিদের মনের বোধির ও মনস্তাত্ত্বিক ঘনিষ্ঠ অনুভূতির বীজ চরম পরিণতিতে ফুটে উঠেছে। তাই যেমন কঠোপনিষদের

একটি বাক্যে বলা হয়েছে, আত্মা এখানে তার নিজস্ব দেহকে আবিষ্কার করেছে, তাই আত্মপ্রকাশের ঠিক শব্দটি সে খুঁজে পেয়েছে, আর মন আবিষ্কার করেছে এমন ছন্দের স্পন্দন যার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করতে থাকলে আধ্যাত্মিক শ্রুতির ভিতর দিয়ে অন্তরাত্মাকে সুগঠিত ক'রে তোলে এবং আত্মতৃপ্তির ভিতর দিয়ে এক আত্মজ্ঞানের চূড়ান্তে উপনীত করে।

উপনিষদের এই বিশেষ গুণটির কথা খুব জোরের সঙ্গেই উল্লেখ করা দরকার, কারণ বিদেশী অনুবাদকেরা এই জিনিসটিকে এড়িয়ে গিয়ে কেবল ওর বুদ্ধিমূলক ব্যাখ্যাই হাজির করে, কিন্তু যে চিন্তক দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরমানন্দের বিকাশ ওর মধ্যে রয়েছে তা সমঝদার শ্রোতাদের কাছে তখনও এবং এখনও কেবল বুদ্ধিকেই অভিভূত করেনা, কিন্তু অন্তরাত্মাকে এবং সমগ্র সত্তাকেই নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলে, তাদের কাছে এ কেবল চিন্তা ও মনকে মুগ্ধকারী প্রাচীন বাক্য মাত্রই নয়, কিন্তু এ হলো 'শ্রুতি', অধ্যাত্ম শ্রবণ, শ্রবণের দ্বারা অন্তরের মধ্যে এক দিব্য প্রেরণাদায়ক ধর্মশাস্ত্র।

উপনিষদের যে দার্শনিক মর্মকথা তার মূল্য সম্বন্ধে আজকের দিনে আর সবিস্তারে বলার কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ যারা শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তি তারাও যদি সে কথা যথেষ্ট রকমে স্বীকার না করে, তথাপি যাবতীয় দর্শন বিদ্যার ইতিহাসের দ্বারাই তা সপ্রমাণ হয়ে যায়। কারণ হিমালয়ের বুক থেকে যেমন বড়ো বড়ো নদীর জলধারা প্রবাহিত হয়ে এসে সকল ভূমিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উর্বরা করে রেখেছে, এই উপনিষদের আদি উৎস হতেও তেমনি কত গভীরতম দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের প্রবাহও এই ভারত থেকে বেরিয়ে নানা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং এরই কাছে অনেকে বারে বারে ফিরে এসেছে নূতন দীপ্তিলাভের জন্য, এবং এর অফুরন্ত জ্ঞানপ্রবাহের দান থেকে কখনই তারা বঞ্চিত হয়নি। বৌদ্ধ ধর্মের অনেক নবোন্নতি হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে রয়েছে এরই পুনরুক্তি, যদিও তা নূতন রকমের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং তার মধ্যে নূতন নূতন বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়ে এবং অনুভূতির একটি মাত্র দিককে নিয়ে, এবং ঐরূপ পরিবর্তিত আকৃতি নিয়ে তা সমগ্র এশিয়াকে ছাড়িয়ে পশ্চিমে ইউরোপে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। পিথাগোরাস ও প্লেটোর অধিকাংশ চিন্তার মধ্যেই এই উপদিষদের মূল ভাবগুলিকে পুনরুদ্ধার করা যায়, এবং Neo-Platonism ও Gnosticism-এর গভীর তত্ত্বগুলির মধ্যে এই জিনিসই স্থান পেয়ে পাশ্চাত্ত্যের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে, আর সুফি ধর্মের

মধ্যেও এরই কথাই পুনরুক্ত হয়েছে অনুরূপ ধর্মীয় ভাষাতে। এই সুপ্রাচীন শিক্ষার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হতে তার বুদ্ধিগ্রাহ্য পরিণতি নিয়েই গড়ে উঠেছে জার্মন অধিবিদ্যা বা তার অধিকাংশ জ্ঞানতত্ত্ব, আর আধুনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও উত্তরোত্তর প্রাণবন্ত গ্রহিষ্ণুতা আসার ফলে এত শীঘ্র এই ভাবগুলি সেখানে অনুপ্রবেশ করছে যে কালক্রমে দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তার দিক দিয়ে একটা বিপ্লব এসে যাবে; এর এরূপ অনুপ্রবেশ ঘটছে কোথাও বা পরোক্ষ প্রভাবের ভিতর দিয়ে, কোথাও বা উন্মুক্ত ও প্রত্যক্ষ প্রভাবের পথে। জগতে এমন কোনো মূল দার্শনিক তত্ত্ব নেই যার আদি বীজ বা প্রথম প্রামাণিক নিদর্শন এই আদিম রচনাগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবেনা—অথচ অনেকেব মতে যারা এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কথা নিয়ে চিন্তা করেছিল তাদের পূর্ব ইতিহাসের পিছনে কেবল স্থূল বর্বর জনোচিত অমার্জিত ও পশুসুলভ সাধারণ অজ্ঞানতা ছাড়া আর কিছু ছিলনা। তথাপি বৃহত্তর সাধারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে জড় প্রকৃতির রহস্যের ক্ষেত্রে যে সকল নূতন সত্যের এখন আবিষ্কার হচ্ছে সেই সকল সত্যই ভারতীয় ঋষিগণ আগের থেকে মূলতঃ আবিষ্কার করেছিলেন আত্মার গভীরতর সত্যের বৃহত্তম অর্থের ভিতর দিয়ে।

অথচ এই সকল রচনা কোনো বুদ্ধিগত দার্শনিক অনুভাবনার জিনিস নয়; কোনো নির্দিষ্ট ধারণাকে ঘিরে তার আধিবিদ্যক বিশ্লেষণ নয়, নানা ভাব থেকে যেগুলি বুদ্ধিতে সত্য বলে বিচার হবে সেগুলিকে বেছে নেওয়া নয়, সেই সত্যকে ন্যায়সঙ্গত যুক্তিব দ্বারা সমর্থন ক'রে অস্তিত্বের এমন কোনো নির্দিষ্ট মীমাংসায় উপনীত হওয়া নয় যে অতঃপর সব কিছুকে সেই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারেই দেখতে হবে এবং তার কেন্দ্রীয় অর্থ নিরূপণ করতে হবে। উপনিষদগুলি যদি সেই ধরনের জিনিস হতো তাহলে তা এখনও পর্যন্ত এমন প্রাণবন্ত হয়ে টিঁকে থাকতনা, তার প্রভাব এখনও পর্যন্ত এমন সার্থকভাবে কাজ করতনা, এবং অন্যান্য দিক থেকে বিপরীত দৃষ্টিতে অনুধাবন করেও তার উক্তিগুলি শেষ পর্যন্ত সত্য বলে মঞ্জুর হতোনা। তার কারণ ঐ সকল সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা কেবলমাত্র চিন্তায় ভেবে বলেননি, কিন্তু সত্যকে দেখেই বলেছেন, তারপর তাকে বোধিমূলক সুস্পষ্ট ভাবের ও ভাষার দ্বারা এমন স্বচ্ছ রূপ দিয়েছেন যে সেই স্বচ্ছতার ভিতর দিয়ে আমরা অসীমকে দেখতে পাই। আর যেহেতু তাঁরা তা দেখেছিলেন নিজেদের আত্ম অস্তিত্বের আলোতে ও অনন্তের দৃষ্টিতে, তাই তাঁদের বাক্যগুলি চিরদিনের জন্ত জীবন্ত

ও অমর হয়ে রইল, তার তাৎপর্য নিঃশেষ হয়ে গেলনা, তা স্বতঃই প্রামাণ্য হয়ে রইল, এবং তার সত্য সম্পূর্ণ হয়েও অনন্তভাবে আরম্ভ স্বরূপ হয়ে রইল, অর্থাৎ যাতে আমাদের নানা অনুসন্ধানের ধারা পুনঃ পুনঃ ঐ খানেই গিয়ে পৌছয় এবং মানুষ যুগে যুগে বৃহত্তর দৃষ্টিলাভ ক'রে তাদের মন শেষ পর্যন্ত ঐ ধারাতেই নিত্য ফিরে ফিরে যায়। উপনিষদকে বলে বেদান্ত, অর্থাৎ বেদের চেয়েও উচ্চতর জিনিসকে জানিয়ে দেবার গ্রন্থ, যে গভীরতর জানাকে ভারতের ভাষাতে বলে 'জ্ঞান'। কেবল চিন্তায় ও বুদ্ধিতে অনুধাবন করা নয়, বুদ্ধিপ্রধান মনের দ্বারা সত্য সম্বন্ধে একটা মানসিক ধারণা ক'রে নেওয়া নয়, কিন্তু অন্তরাত্মার দৃষ্টিতে তাকে প্রত্যক্ষ দেখে তারই মধ্যে আভ্যন্তরীণ সত্তার শক্তিতে ঢুকে থাকা, সেই বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে সর্বদা আধ্যাত্মিক চেতনাতে তাকে আঁকড়ে থাকা, তাকেই বলে 'জ্ঞান'। এবং কেবল সম্পূর্ণ-রূপে আত্মাকে জানলেই এই ধরনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আসতে পারে, সেই কারণে বৈদান্তিক ঋষিরা প্রথমে আত্মাকে জানতে এবং তার সঙ্গে একাত্মভাবে নিত্য অবস্থান করতে চেয়েছেন। আর এই প্রচেষ্টার ফলে তাঁরা সহজেই জানলেন যে আমাদের ভিতরকার আত্মা বিশ্বময় আত্মার সঙ্গে অভিন্ন, এবং যাকে বলি ভগবান ও ব্রহ্ম তার সঙ্গেও এই আত্মার কোনো প্রভেদ নেই, পরাৎপর সত্তা ও এই আত্মা একই জিনিস, এবং এই একত্বের দৃষ্টিতে ও এরই আলোতে তাঁরা বিশ্বের সব কিছুর অন্তরতম সত্যকে এবং মানুষের বাহ্য ও আভ্যন্তর অস্তিত্বের মূলগত সত্যকেও দেখতেন ও অনুভব করতে পারতেন। উপনিষদ হলো আত্মজ্ঞানের ও বিশ্বজ্ঞানের ও ভগবৎ-জ্ঞানের মহাকাব্য জাতীয় অপরূপ স্তবগাথা। ওর মধ্যে যে দার্শনিক সত্য নিহিত আছে তা বুদ্ধিমূলক এমন তত্ত্বকথা নয় যা সাময়িক ভাবে উজ্জ্বল হয়ে কেবল মনকে আলোকিত করবে, কিন্তু স্থায়ী হবেনা আর আত্মার উন্নয়ন ঘটাবেনা। কিন্তু সে জিনিস অনুরাগ সহকারে অন্তরস্থ বোধির অন্তর্দৃষ্টিকে প্রজ্বলিত ক'রে দেবে, এবং অখণ্ড পরম অস্তিত্বকে জানিয়ে দিয়ে ও পরাৎপর দেবতার কাছে পৌছে দিয়ে তাঁকে দেখিয়ে দেবে, যিনি একাধারে দিব্য আত্মা ও বিশ্ব আত্মা,—এবং তাঁর সঙ্গে এই বিশ্বময় বিচিত্র অভিব্যক্তির ও তাবৎ জীবসমূহের কি সম্বন্ধ তাও জানিয়ে দেবে। এই সব গাথা যখন জ্ঞানগর্ভ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে গীত হয়, তখন তা যদিও সকল স্তবগানেরই মতো ধর্মীয় আনন্দময় একটা উদ্দীপনা আনে, কিন্তু তা বিশেষ কোনো নিম্নতর ধর্মভাবের

সঙ্কীর্ণতর তীব্রানন্দের মতো নয়, কিন্তু তা সকল রকম মতের ও পূজারীতির উপরে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেয় পরাৎপর ভগবানের বিশ্বানন্দের মধ্যে, এবং সেই স্বয়ম্ভূ বিশ্বাত্মার দিকে ফিরে আমরা তারই সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই। বৌদ্ধধর্মের সর্বোচ্চ নীতিশাস্ত্র ও পরবর্তী হিন্দুধর্ম যদিও বাহ্য মানব জীবনকে ছাড়িয়ে প্রধানত আভ্যন্তরীণ দৃষ্টির বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছে, তথাপি তা উপনিষদের সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত সত্যগুলির তাৎপর্য হতেই উদ্ভূত—এবং তা ছাড়াও এর মধ্যে এমন বৃহত্তর কিছু আছে যা এসেছে ভগবান ও তাবৎ জীবের সঙ্গে একাত্মতার ভিত্তি থেকে। এই কারণে প্রাচীন বেদের তত্ত্ব ও ক্রিয়াকাণ্ড যখন লোপ হয়ে গেল, উপনিষদ তখনও জীবন্ত হয়ে টিঁকে রইল এবং তার থেকেই ভারতীয় ভক্তিমূলক ধর্মগুলির নূতন নূতন যত কিছুর সৃষ্টি হতে থাকল এবং তা ভারতের ধর্মভাবকে এখনও বজায় রাখলে···

উপনিষদের কয়েকটি পংক্তির মধ্যেই আমাদের চোখের সামনে প্রাচীন জগতের চিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে,—ঋষিরা বনে উপবনে থেকে শিষ্য ও নবাগতদের নিয়ে শিক্ষা দিতে ও পরীক্ষা করতে বসেছেন, তার মধ্যে রাজপুত্র এবং বিদ্যালব্ধ ব্রাহ্মণগণ ও ভূস্বামীগণও এসেছেন জ্ঞানলাভের জন্য, রাজপুত্র এসেছে তার মহার্ঘ্য রথে এবং দরিদ্র জারজ দাসীপুত্রও এসেছে, তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন কাউকে যিনি নিজের মধ্যে দিব্য আলোকের চেতনা ও দিব্যদৃষ্টির বাণী বহন করছেন। এর মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের পরিচিত,—একদিকে জনক রাজা, অন্যদিকে সূক্ষ্মমনা অজাতশত্রু, রথী রৈক্য, আছেন সেই সত্যসংগ্রামী স্থিরমতি যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি নিরাসক্ত ভাবে দুই হাতে পার্থিব সম্পদও গ্রহণ করেন আর আধ্যাত্মিক সম্পদও গ্রহণ করেন, আবার অনায়াসে সকল সম্পদ পরিত্যাগ ক'রে গৃহহীন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়েও পড়েন। আছেন দেবকীপুত্র কৃষ্ণ, যিনি ঋষি ঘোরার একটিমাত্র বাক্যে শাশ্বতকে চিনে নিতে পারেন। আমরা দেখি কত কত আশ্রম, আধ্যাত্মিক সত্যের আবিষ্কারক অথচ রাজ্যপরিচালক কত কত রাজাদের সভা, দেখি কত বিরাট যজ্ঞের সম্মেলন যেখানে ঋষিরা মিলিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান করছেন। আর এও দেখতে পাই যে ভারতের আত্মার কেমন ভাবে জন্ম হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার এই উদাত্ত জন্মমঙ্গল গাথা ঋষিকণ্ঠে গীত হয়ে পৃথিবী ছেড়ে আত্মার সর্বোচ্চ লোকে উঠে গেল।

বেদ ও উপনিষদ কেবল যে ভারতের সকল দর্শন ও সকল ধর্মের উৎস

তাই নয়, কিন্তু তা এখানকার সকল শিল্প, কাব্য ও সাহিত্যেরও উৎসস্বরূপ। এরই মর্ম, এরই ভাব থেকে যে আদর্শ মনের সৃষ্টি হলো, তাই অতঃপর প্রকাশ পেলো মহা মহা দর্শনতত্ত্বের মধ্যে, তার থেকেই গড়ে উঠল যত ধর্মের দেউলগুলি, তার থেকেই লিখিত হলো রামায়ণ ও মহাভারতের আদর্শ বীরত্বপূর্ণ যুবকদের কাহিনী, তখনকার পুরুষেরা বুদ্ধিতে পরিপক্ক হয়ে উঠল, এবং তারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মূল ধরনের কত অবদান যোগালে, কত সুকান্ত ও প্রাণবন্ত অনুভূতির মহার্ঘ্য জ্যোতি বিকীরণ করলে, তন্ত্রে ও পুরাণে সেই সকল অধ্যাত্ম ও চৈত্য অনুভূতিকে নূতন ক'রে শোনালে, রঙে রেখায় ও শিল্পে সৌন্দর্যে তার মহিমা চারিদিকে ছড়ালে, প্রস্তরে ও ধাতুতে তার চিন্তা ও দৃষ্টির সৌন্দর্য মূর্তিতে মূর্তিতে খোদাই করে রাখলে, পরবর্তী ভাষাতেও নূতন নূতন পথে তার আত্মবিকাশ ঘটালে। এখন আবার ঘনান্ধকারে কিছুকাল আচ্ছন্ন থাকার পরে তারই নতুন ক'রে পুনর্বিকাশ ঘটবে, এবং এক নূতন জীবন ও নূতন সৃষ্টির জন্য দেশ প্রস্তুত হয়ে উঠবে।"

গীতা

"সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে আধ্যাত্মিক নির্দেশপূর্ণ গ্রন্থ আজ পর্যন্ত এই জাতির পরমতম সম্পদ হয়ে রয়েছে, সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে গ্রন্থ হতে নিখুঁত কর্মযোগের শিক্ষা অতীতকালের মানুষ লাভ করতে পেরেছে, তা হলো এই ভগবদ্গীতা। মহাভারতের ঐ চিরপ্রসিদ্ধ কাহিনীকে উপলক্ষ ক'রে অতুলনীয় নৈপুণ্য ও অভ্রান্ত অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে চিরন্তন কালের জন্য স্থায়ী এই অপূর্ব কর্মযোগের মহাভিত্তি ওর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।...

গীতার যা দার্শনিক প্রণালী, সত্যের বার্তা বিতরণের যে কৌশল, তাই যে এর শিক্ষার মধ্যে সব চেয়ে দামী ও চিরস্থায়ী তা নয়; কিন্তু যে উপাদানগুলি একত্রিত ক'রে এটি রচিত হয়েছে, যে মূল চিত্তভেদী ও চেতনা উদ্দীপক ভাবগুলি অপূর্ব সঙ্গতির সঙ্গে ওর মধ্যে ইতস্তত গ্রথিত করা হয়েছে তারই শাশ্বতমূল্য অপরিসীম ও সর্বগ্রাহ্য; কারণ তা কেবল তীক্ষ্ণ দার্শনিক বুদ্ধির জ্যোতির্ময় ধারণা বা পরিকল্পনা নয়, কিন্তু তা হলো পরিণত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সর্বকালের সত্য, আমাদের মনস্তত্ত্বের সর্বোচ্চ রকম সম্ভাবনার প্রামাণ্য বৃত্তান্ত, যাকে মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃত

রহস্য সন্ধানী কেউই কখনো অবহেলা করতে পারে না। এর অনেক ব্যাখ্যাকারকেরা যেমন বলে থাকে যে বিশেষ কোনো মতের দার্শনিক তত্ত্বকে সমর্থন দেবার জন্য বা একটা কোনো বিশেষ রকমের যোগমার্গকে প্রাধান্য দেবাব উদ্দেশ্যে এটি রচিত, সে কথা ঠিক নয়। গীতাব যে ভাষা, ওর যে চিন্তাসূত্রের গঠন এবং ভাবেব তুল্যমূল্য সমন্বয়, তা কোনো মতবিশেষেব প্রচারক বা পক্ষপাতী যুক্তি বিশ্লেষণকারীব পক্ষে সম্ভব নয়।·

গীতার যে নির্দেশবাণী শিক্ষাগুরুরূপী ভগবানেব মুখ থেকে প্রচাবিত হয়েছে তা সংক্ষেপে এইভাবে বলা যায়—'কর্মের রহস্য এবং জীবনেরও অস্তিত্বেব রহস্য একই। অস্তিত্ব কেবল প্রকৃতির নিয়মচক্রেব আবর্তন নয় যার মধ্যে আত্মা ক্ষণকালের জন্য বা বহুকালেব জন্য জড়িয়ে থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে, এ হলো অস্তিত্বের ভিতর দিয়ে আত্মার নিত্য ক্রমবিকাশ। জীবন কেবল জীবনেরই জন্য নয়, কিন্তু তা ভগবানেব জন্য, কাবণ মানুষের জীবন্ত আত্মা হলো তাঁরই একটা শাশ্বত অংশ। তার কর্ম কেবল আত্মাবিষ্কার আত্মপূবণ ও আত্মোপলব্ধির জন্য, বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে কোনো বাহ্য ফলপ্রাপ্তিব জন্য নয়। সব কিছুরই একটা আভ্যন্তবীণ নিয়ম ও অর্থ আছে, যা নির্ভর কবে উপরের বিধান ও আত্মাব অভিব্যক্ত প্রকৃতির উপর, কর্মের প্রকৃত সত্য রয়েছে সেইখানে, যদিও বাইবেব দিক থেকে মনের গতি ও তার ক্রিয়া অজ্ঞানতায় প্রচ্ছন্ন থাকাতে কর্ম যেন দৈবক্রমে অপূর্ণভাবে ঘটে যায়। কর্মেব অভ্রান্ত ও সর্বাপেক্ষা চরম নিয়মটি জানতে হলে তাই তোমার অস্তিত্বের সর্বোচ্চ নিগূঢ় সত্যটিকে জানতে হবে এবং তারই মধ্যে অবস্থান করতে হবে, বাইরের অন্য কোনো ধর্ম বা আদর্শকে অনুসরণ করবেনা। যতদিন তা না হয় ততদিন তোমার সমগ্র জীবন ও তার কর্মের মধ্যে থাকবে কেবল অপূর্ণতা, কষ্টপ্রয়াস, সংগ্রাম ও সমস্যা। সে সমস্যা তখনই মিটে যাবে ও সে সংগ্রামও থেমে যাবে কেবল আপন আত্মাকে আবিষ্কার ক'রে তারই প্রকৃত সত্যের মধ্যে অবস্থান করলে, তখন সেই আবিষ্কারের ফলে নিরাপত্তা এসে সব কাজই হবে সঠিক দিব্য কর্ম। আগে তাহলে তুমি নিজেকে জানো, জানো যে তোমার আত্মা সেই ভগবান, এ আত্মা ভগবানেরই একটি অংশ, এবং অন্য সকলের আত্মার সঙ্গে তা অভিন্ন। জেনে নিয়ে তারই মধ্যে, তোমার পরমতম আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করে, ভগবানের সঙ্গে ও ভগবত্তার সঙ্গে এক হয়ে মিলে যাও। প্রথমে, তোমার সকল কর্মকে

যজ্ঞরূপে নিবেদন ক'রে দাও সেই পরাৎপর একের কাছে যিনি রয়েছেন তোমারও মধ্যে, যিনি রয়েছেন সারা জগতেরও মধ্যে। অবশেষে তোমার সব কিছু তাঁর হাতে ছেড়ে দাও, যাতে সেই পরমতম বিশ্ব-আত্মা তোমার ভিতর দিয়ে তাঁর নিজের ইচ্ছাকে পূরণ ক'রে জগতে তাঁর নিজের কাজ সুসিদ্ধ করতে পারেন। এই একমাত্র পন্থাই তোমাকে জানিয়ে দিলাম, এছাড়া অন্য পন্থা নেই...'

মানবরূপী অবতার হয়ে গীতাতে ভগবান আরো বলেছেন—'এইরূপ মহা পরিবর্তন ও রূপান্তর আনবার জন্যই আমি সেই সকল চিহ্নিত ব্যক্তিদের আহ্বান করছি, যারা আপন আপন ইন্দ্রিয়াদির অজ্ঞানতার দিক থেকে ইচ্ছাকে ফিরিয়ে নিয়ে আত্মার গভীরতম অনুভূতির দিকে নিয়োজিত করতে পারে, আভ্যন্তরীণ সত্তাকে জেনে তাকে ভগবানের সংস্পর্শে নিয়ে যেতে পারে, ভগবত্তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। তারাই চিহ্নিত ব্যক্তি, যারা এই তত্ত্বকে বুঝে এই উচ্চতম নিয়মকে মেনে চলতে পারে। সাধারণ মানুষের বুদ্ধি তার মেঘাচ্ছন্ন আধা-আলোকিত অজ্ঞানতাকে এবং তার চেয়েও অর্থহীন মন-প্রাণ-দেহের অভ্যাসগুলিকেই আঁকড়ে থাকে, তার পক্ষে এ কথা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন; কিন্তু একবার ঐ রাস্তা ধরে নিতে পারলে তখন থেকে নিশ্চয় তুমি বেঁচে গেলে, কারণ তাই হলো মানুষের প্রকৃত সত্তার সমধর্মী জিনিস ও তার অন্তরতম প্রকৃতির সঠিক ক্রিয়া...

'কিন্তু এমন পরিবর্তন ও রূপান্তর আনা খুবই বৃহৎ ব্যাপার, তোমার সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতি ঐদিকে সম্পূর্ণরূপে না ফিরলে তা হতে পারেনা। এখানে তোমার আত্মা ও প্রকৃতি ও প্রাণকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ ক'রে দিতে হবে যিনি পরাৎপর তাঁর কাছে, অন্য কারো কাছে নয়, তাঁরই জন্য তুমি সব কিছু গ্রহণ করবে, যা ভগবানের জিনিস এবং ভগবানের স্বরূপ এবং ভগবানের জন্য তা ছাড়া অন্য কিছুই মেনে নেবেনা। এই নতুন সত্যকে স্বীকার ক'রে নেবে, মনকে মানিয়ে নেবে এই নতুন জ্ঞান যে তুমি নিজে ও বাকী অন্য সকলে ও জগৎ ও আত্মা ও প্রকৃতি সবই সেই এক জিনিস, এই জ্ঞানই সেই সর্বময় ভগবানের জ্ঞান,—এ জ্ঞান যদিও প্রথমে কেবল বুদ্ধির দ্বারাই গ্রহণ করবে কিন্তু পরে এই দৃষ্টি এবং এই চেতনাই তোমার অন্তরের একটা স্থায়ী অবস্থাতে পরিণত হবে এবং এরই ভিত্তিতে সব কিছু কাজ হতে থাকবে...

'এই ইচ্ছাটি জাগিয়ে রাখা চাই যাতে এই নূতন জ্ঞান ও দৃষ্টি ও চেতনাই তোমার সকল কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য স্বরূপ হয়। এবং সে কর্ম যেন প্রকৃতির বিশেষ কয়েকটি ক্রিয়াকে নিয়েই নিতান্ত কষ্টপ্রেরণাতে সীমাবদ্ধ হয়ে না থাকে কিংবা তোমার তথাকথিত সিদ্ধির পক্ষে যা সহায়ক তাইতেই সীমাবদ্ধ না হয়, কেবল ধর্মভাবের ও মুক্তিলাভের সপক্ষেই তা নিয়োজিত না হয়, কিন্তু তোমার মানব জীবন যেন সমান ভাবে সে কর্মকে গ্রহণ করে ভগবানের জন্য এবং সর্বজীবের মঙ্গলের জন্য। হৃদয়কে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে একমাত্র পরমতমের আস্পৃহা নিয়ে, একমাত্র ভগবৎ প্রেম ও ভগবৎ ভক্তি নিয়ে। আর সেই জ্ঞানদীপ্ত ও অচঞ্চল হৃদয়কে এমন উদার ক'রে নিতে হবে যাতে সর্ব সত্তাকেই সে ভগবান জ্ঞানে আলিঙ্গন দিতে পারে। তোমার এখনকার অভ্যস্ত এই মামুলী মানব প্রকৃতিকেই বদলে ফেলে তাকে পরিণত করতে হবে পরম ও সুদিব্য আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে। অর্থাৎ এক কথায় তুমি এমন যোগের অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করবে যা হবে পূর্ণ জ্ঞানের ও পূর্ণ ইচ্ছাযুক্ত কর্মের যোগ, পূর্ণ প্রেম ও ভক্তি নিবেদনের যোগ, এবং সর্বসত্তার ও তার সকল অংশের ও সকল তৎপরতার পূর্ণ অধ্যাত্ম পরিণতির যোগ…

'এই হলো একমাত্র গতি, একমাত্র মুক্তি, এই পূর্ণ সিদ্ধির উপায়ের কথা আমি তাদের জানিয়ে দিচ্ছি যারা নিজেদেব অন্তরদেশে এই দিব্য বাণীকে শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে।' "

পুরাণ

"গোড়াতে ধর্ম রচনা করেছিলেন যাঁরা, তাঁরা ছিলেন সেই সব অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তি যাঁরা স্থূল জগতের আপামর জনসাধারণের মধ্যেই বাস করতেন এবং তারা তখনও কেবল স্থূল জীবনের ব্যাপারগুলিকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। উপনিষদ এসে তাদের মনের সেই স্থূল আবরণের পর্দা সরিয়ে দিয়ে একটা স্থূলোত্তীর্ণ মুক্ত বিশ্বময় দৃষ্টি ও অনুভূতির পথ খুলে দিলে, এবং পরের যুগে এই জিনিস থেকেই সাধারণগ্রাহ্য ভাবে বৃহত্তর অথচ সহজ দার্শনিক ও বোধগম্য অর্থ নিয়ে ত্রিশক্তির তিনটি কেন্দ্রীয় প্রতিমূর্তি রূপে গড়ে উঠল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। পুরাণ এই জিনিসকে আরো বাড়িয়ে সাধারণের কল্পনাগ্রাহ্য ক'রে তাকে

চৈত্যানুভূতিতে একটা ভাবপ্রবণতা জুড়ে দিয়ে লোকের রুচিসম্মত ক'রে জীবন্ত ক'রে তুললে। যোগী ও ঋষিগণ যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে আবিষ্কার করেছিলেন, তাকে সাধারণ মানুষের প্রকৃতির গ্রহণের পক্ষে উপযোগী করবার জন্য এমন বাহ্য উপায়ের আবিষ্কারের চেষ্টা হতে থাকল যাতে সাধারণ জনের মনকে তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করে। এই হলো ভারতীয় সংস্কৃতির ধর্মীয় ও দার্শনিক দিকের ক্রমবিবর্তনের ভিতরকার কথা।

পুরাণে যে সকল স্থূল প্রতিমূর্তিগুলিকে সাজানো হয়েছে তার প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছে চৈত্যিক তাৎপর্য। যেমন গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমের পবিত্রতা হলো যোগেরই চৈত্য-দৈহিক সাধনকে তিন দিক থেকে তিনটি স্রোতের সঙ্গমে মিলিত এক পরম অনুভূতির প্রতিরূপ, এবং তা ছাড়া আরো অনুরূপ প্রতীকসূচক সদর্থও এর আছে। পুরাণে যে সব কল্পনাতে গড়া ভৌগোলিক বিবরণ আমরা পাই তা হলো আমাদের আভ্যন্তরীণ চৈত্য জগতেরই প্রতীকরূপে রচিত ভূগোল। স্থূল জগতের ভাষাতেই ওর মধ্যে যে সব সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ আছে তারও বিশেষ আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক অর্থ এবং ভিত্তি আছে, যেমন আছে বেদে। কিন্তু পরবর্তী কালের অজ্ঞানতার মাত্রা বেড়ে যাওয়াতে এই সব পৌরাণিক প্রতীকধারাকে নিতান্ত স্থূল বাস্তবের পর্যায়ে এনে চৈত্য ও আধ্যাত্মিক জিনিসগুলিকে শেষ পর্যন্ত লৌকিক অন্ধ-সংস্কারে এনে দাঁড় করানো হয়েছে।

মূলতঃ পুরাণগুলি হলো প্রকৃত ধর্মকাব্য, ধর্মের সত্যকে মোহনীয় ক'রে বলা। অবশ্য অষ্টাদশ পুরাণের সবগুলিই এমন উঁচুদরের জিনিস নয়। ওর মধ্যে অনেক বাজে জিনিসও আছে এবং অবান্তর একঘেয়ে কথাও আছে, কিন্তু মোটের উপর যে নিপুন কবিত্বের সঙ্গে এগুলি রচিত তাতে সৃষ্টিশক্তির প্রাচুর্যই প্রকাশ পায়। আদিমতম পুরাণই সর্বোৎকৃষ্ট—আর শেষের দিকের একটি যা রচিত হয়েছিল নতুন পদ্ধতিতে তা একেবারে অতুলনীয়। যেমন বিষ্ণুপুরাণ, এটি দুই এক স্থানে নীরস হলেও এ এক উঁচুদরের অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি, এর মধ্যে আগেকার মহাকাব্যের ধরনের শক্তিমত্তা প্রকাশ পেয়েছে। ওর মধ্যে লেখার নৈপুণ্য রয়েছে নানা দিক দিয়ে, কোথাও বা সুমধুর ও সৌন্দর্যময় গীতিকাব্য, স্থানে স্থানে অনেক মনোরম কাহিনী এবং সরল প্রকৃতির অদ্ভুত কাব্যসুষমা। শেষের দিকে হলো ভাগবত, যা জনপ্রিয় সাধারণ জিনিস থেকে একেবারে স্বতন্ত্র, যথেষ্ট জ্ঞানসমৃদ্ধ ও সাহিত্যিক

আলঙ্কারিকতায় ভরপুর, তাতে সূক্ষ্মভাবও যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি চিন্তার ও সৌন্দর্যবোধের সমৃদ্ধিও প্রকাশ পেয়েছে…

…ধর্ম সম্বন্ধীয় এই পুরাণগুলির ক্রিয়া চরমে উঠে ভবিষ্যৎ কালের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং হৃদয়ানন্দদায়ক উচ্চ ভাবময় ভক্তি-ধর্মের ক্রমবিকাশ ঘটিয়েছে। ভারতীয় মনের ধর্মের দিকের এই ভাবপ্রবণতা প্রথম যুগ থেকেই ছিল এবং ধীরে ধীরে বাড়ছিল, কিন্তু মাঝে জ্ঞানের ও কর্মের দিকে বেশি ঝোঁক আসাতে এবং সর্বোচ্চ স্তরে উঠে আধ্যাত্মিক মার্গের আনন্দলাভের প্রভাব এসে পড়াতে তা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্য জীবনের উপর আবার সেই হৃদয়তৃপ্তিমূলক আগেকার প্রভাব ফিরে আসাতে ভিতরে ভিতরে একটা নতুন মোড় নিয়ে তার পূর্ণ অভিব্যক্তিরূপে দেখা দিল বৈষ্ণব ধর্ম। এতে যে লোকায়ত মুক্ত হৃদয়ানুভূতি এসে প্রাণসত্তার স্নায়বিক উদ্যমকে শিথিল করে দেয় তাতে সংযমের অভাবে নৈতিক অবনতি যথেষ্টই ঘটতে পারত, কিন্তু ভারতের যেমন মনোভাব তাতে জীবনের সকল রকম অনুভূতিকেই তদুপযোগী অধ্যাত্ম অনুভূতির পর্যায়ে রূপান্তরিত ক'রে নিতে বাধ্য করে, তার ফলে এই সব বাহ্য জিনিসও নতুন রকমের আধ্যাত্মিক ভাবধারাতে পর্যবসিত হয়ে গেল। সত্তার ভিতরকার প্রেক্ষাভযুক্ত আবেগময় ও হৃদয়োত্তেজক ক্রিয়াগুলি অন্তরকে বাহিরের দিকে টানবার আগেই তাকে চৈত্যের ভাবধারাতে গুণান্তরিত করে নেওয়াতে এমন জিনিস দাঁড়াল যাতে হৃদয়াবেগের জোরে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই ভগবানকে আয়ত্তের মধ্যে ধরা যায়, এবং এর থেকেই প্রেমময় আনন্দময় ও রূপায়িত সৌন্দর্যময় ভগবানকে লাভ করার ঐ ধর্ম জনপ্রিয় হলো।

তন্ত্রের ক্ষেত্রে এই নতুন উপাদানকে ভিত্তি ক'রে দৈহিক-চৈত্যিক-আধ্যাত্মিকের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ এক বিজ্ঞানের সৃষ্টি হলো, যার নাম যোগ। আবার জনপ্রিয় বৈষ্ণব ধর্মের এই নব ভাব স্নেহে প্রেমে কেন্দ্রীভূত হলো গোপাল কৃষ্ণের রাখালিয়া জীবনকে ঘিরে। বিষ্ণুপুরাণের অবতার কৃষ্ণের কাহিনীর মধ্যে নানা বীরত্বের গাথা, পরবর্তী পুরাণে এসে পড়েছে রূপকচ্ছলে কাম ও সৌন্দর্য বিকাশের প্রতীক, এবং ভাগবতে তারই পরাকাষ্ঠা ঘটেছে পুরোপুরি আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ও চৈত্য অনুভূতি প্রকাশের নানা অভিব্যক্তির দ্বারা, এবং বেদান্তের আদিম ধারাতে জ্ঞানমার্গের সংশ্লেষণ ঘটেছে প্রেম ও ভক্তিমার্গকে কেন্দ্র স্বরূপ ক'রে নিয়ে। এরই চরম পরিণতি দেখা যায় শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মে ও তারই দার্শনিক তত্ত্বে।"

ভারতের দর্শন

"আত্মা ও মানবজীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে সত্যগুলি বোধির দ্বারা ও সত্যদৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে বেদে ও উপনিষদে রক্ষিত ছিল, দার্শনিকগণের কাজ হলো তাকে গুছিয়ে নিয়ে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার দ্বারা তাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করা, এবং তারই ভিত্তিতে এমন রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া যে প্রণালী অনুসরণ ক'রে মানব তার অস্তিত্বের চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌছতে পারে। যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতিতে এ কাজ করা হয়েছিল তাতেই বোঝা যায় যে বোধির জিনিসকে মনোবুদ্ধির অন্তর্গত ক'রে নিতে যেরূপ মধ্যবর্তী কৌশলের প্রয়োজন তার সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে সেগুলির মধ্যে। সেই বোধিমূলক তথ্যের সমুচিত পবিত্রতা রক্ষা করতে যে মর্মগর্ভ স্বল্পবাক্ সাহিত্য রচিত হয়েছিল, বেদ ও উপনিষদে তার চেয়ে আরো স্বল্পবাক্ ও সংক্ষিপ্ত আকারে এই দার্শনিক তত্ত্বগুলি রচিত হলো। তার মধ্যে কবিত্ব বা বোধির উল্লেখ কিছুমাত্র নেই, কেবল নিছক বুদ্ধিগত বাহুল্যরিক্ত সূত্র সমূহ—সামান্য কয়েকটি বাক্যের মধ্যে বা এমন কি দুই একটি শব্দের মধ্যে সমগ্র দার্শনিক নির্দেশ ও চিন্তাধারা একেবারে কেন্দ্রীভূত, সুনিশ্চিত নির্ধারণ জ্ঞাপক এক একটি যথাসম্ভব ছোটো ছোটো বাক্যের মধ্যে ঘনীভূত অথচ সম্পূর্ণ সেই সূত্রগুলি অনেকটা যেন হেঁয়ালি বচনের মতো। সেই সূত্রগুলিকে ভিত্তি ক'রে নানা যৌক্তিক ও পরাতাত্ত্বিক প্রণালীতে বিশদভাবে তার বিভিন্ন প্রকার ভাষ্য রচিত হয়েছে। সেগুলির মূল উদ্দেশ্য একই, সূত্রের ভিতরকার চরম সত্যটিকে জ্ঞাপন ক'রে আধ্যাত্মিক মোক্ষের উপায় বলে দেওয়া…

ভারতে এই প্রচেষ্টার দিকে আগ্রহ বরাবর চলে এসেছে, আধ্যাত্মিক ও বোধিজাত অনুভূতির দ্বারা যে সত্য লব্ধ হয়েছে তাকে পরাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বে এনে দাঁড় করানো, যার ফলে আগেকার যুগে প্রতিষ্ঠিত হলো বৌদ্ধ জৈন এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান দর্শনশাস্ত্র, যার মধ্যে তন্নতন্ন ক'রে বুদ্ধিগত বিচার ও পরীক্ষার দ্বারা অবিসম্বাদী ও অকাট্য যুক্তিগ্রাহ্য মীমাংসাতে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। আর এ কাজ খুব বেশি মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছিল ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে, বিশেষত শংকর, রামানুজ ও মাধ্ব প্রভৃতি দক্ষিণা জ্ঞানীগণের দ্বারা। তার পরেও কিন্তু এ কাজ থামেনি, এমন কি আমাদের সময় পর্যন্ত তা চলে এসেছে, যার

ফলে মাঝে মাঝে নতুন রকমের আরো কত সূক্ষ্ম দার্শনিক মতের সৃষ্টি হয়েছে আগেকার পূর্বাপর ভাষ্য ও বিচারগুলির মধ্যেও। অতএব জাতির মন থেকে এই পরাতত্ত্বের গবেষণার প্রতি আগ্রহ কথনই হ্রাস পায়নি ··

এথনকার যুগে যদিও বুদ্ধির দিকের সকল কাজকেই সর্বাপেক্ষা প্রাধা দেওয়া হয়, তথাপি ভারতবাসীর মজ্জাগত ধাত অনুসারে ঐ জিনিসে প্রয়োজন বরাবরই টিঁকে আছে। আধ্যাত্মিক অনুভূতি থেকে বুদ্ধি বিচারণায় যুক্তিগ্রাহ্য মীমাংসাতে উপনীত হওয়া, এবং সেই বুদ্ধিগত বোধে ভিতর থেকে ফিবে গিয়ে আবার নতুন নতুন আধ্যাত্মিক অনুভূতি উন্মীলিত হওয়া, এর বিরাম নেই। অবশ্য টুকবো টুকরো ক'রে ভাগ ক দেখার একটা ঝোঁক আছেই; উপনিষদ্‌গুলির প্রধান প্রধান মৌলি সত্যকেই কত রকম বিভিন্ন মতের সমর্থন কবতে কতবকম বিভিন্নভাবে বিভ করা হয়েছে, এবং তার থেকে আরো পুনর্বিভাগ হয়ে চলেছে; তথাপি এ সব বিভিন্ন মতের দিক দিয়েও যা কাজ হচ্ছে তা সত্যকে অনুসন্ধানেবই কাজ তাতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানেব জন্য গ্রহিষ্ণুতাব ক্ষেত্র আরো বিস্তৃতই হচ্ছে আর এই যে ছন্দায়িত ক্রিয়া, আত্মিক বোধ হতে বুদ্ধিতে আসা, যেখানে আত্মা দিচ্ছে জ্ঞানদীপ্তি সেখানে বুদ্ধি আনছে অনুসন্ধান প্রবৃত্তি, তাতে নিম্নতর জীবনেও সেই বোধির ফলগুলি অন্তরে জীর্ণ হতে সাহায্য কবছে এতেই ভারতের আধ্যাত্মিকতা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে এবং স্থায়ী হচ্ছে যা অন্য কোনো জাতির মধ্যে নেই। যাঁবা এ কাজ করে গেছেন তাঁরা যেমন দার্শনিক ছিলেন তেমনি যোগীও ছিলেন, আর তাঁদের সেই কাজের জন্যই ভারতের অধঃপতনের অন্ধকার যুগেও তার আত্মা সেই আদর্শ ধরে এখনও জীবন্ত হয়ে আছে।"

ভারতের বিজ্ঞান

"বর্তমান যুগের কথা ছেড়ে দিয়ে বহু প্রাচীন যুগে ভারতে যেমন অপূর্ব সার্থকতার সঙ্গে বিজ্ঞানের অনুশীলন হয়েছিল, তেমন আর সেই যুগে কোনো দেশেই হয়নি।··· কেবল অঙ্কশাস্ত্রে, জ্যোতিষে, রসায়ন বিদ্যায়, চিকিৎসায়, শল্যপ্রয়োগে, এবং প্রাচীন জড়বিজ্ঞানেই ভারত প্রথম স্থান অধিকার ক'রে ছিল না, কিন্তু গ্রীকদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতও ছিল আরবদের শিক্ষাগুরু, যাদের

কাছ থেকে পরে ইউরোপ ফিরে পেলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, এবং তাকে ভিত্তি করেই শুরু হলো আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। অনেক দিক দিয়েই ভারত প্রথম আবিষ্কারের দাবি করতে পারে—যার মধ্যে দুটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের নাম করা যায়, যেমন গণিতের দশক (decimal) নিরূপণ পদ্ধতি, আর জ্যোতিষের এই তত্ত্ব যে পৃথিবীকে স্থির দেখলেও বস্তুত কিন্তু পৃথিবীই ঘুরছে, 'চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি,'—গ্যালিলিও এ-কথা বলার বহু শতাব্দী আগেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদ এই কথা বলেছিল। যে দেশের জ্ঞানীজনেরা কেবল পরাতত্ত্বের দিকেই বেশি ঝোঁক দেয় তাদের পক্ষে প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কারে এতখানি উন্নতি করা হয়তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু ভারতবাসীর মন জীবনের সকল দিকই খুঁটিয়ে দেখেছে, তার বিশিষ্টতাগুলিকে তন্নতন্ন ক'রে লক্ষ্য ক'রে সেই পর্যবেক্ষণের ফলাফলগুলিকে একত্রে সাজিয়ে তাই নিয়ে বিভিন্ন বিভাগীয় বিজ্ঞান বা শাস্ত্রগুলির রচনা করেছে। এতে প্রমাণ হয় যে তারা কেবল বিবিক্ত পরাতত্ত্ব নিয়েই মত্ত ছিল না, অন্য দিক দিয়ে বিজ্ঞানেরও প্রথম সূচনা করেছিল।

প্রাচীনতম বিজ্ঞানের সম্পর্কে বিশেষ ক'রে কাজ হয়েছিল গণিত ও জ্যোতিষ ও রসায়নের দিক দিয়ে। তাছাড়া যুক্তি ও পরীক্ষাদির দ্বারা অনেকগুলি অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্যেরও আবিষ্কার ও পূর্বাভাস তখনই তারা জ্ঞাপন করেছিল, যেগুলি অনেক পরে ইউরোপ পুনরাবিষ্কার করে এখনকার নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সপ্রমাণ করে তাক দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেছে। শল্য চিকিৎসাও তখন প্রচলিত ছিল এবং তারও বিশেষ মূল্য আছে, যদিও মধ্যবর্তীকালে তার অবনতি ঘটেছিল, কিন্তু এখন আবার ক্রমে প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসে ভারতীয় বিজ্ঞানের গতি হঠাৎ স্থগিত হয়ে যায়, অন্ধকার ও নিষ্ক্রিয়তার যুগ আসাতে তখন আর আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর হতে পারে না।...সেটা হলো নব তৎপরতার পূর্বেকার বিরতির একটা অংশস্বরূপ...।

ভারতীয় যোগ

"জগতের বর্তমান অবস্থাতে যেন সব কিছুই গ্রীক কিংবদন্তীর সেই মিডিয়ার (Media) কটাহের মতো এক বিরাট কটাহের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে সবই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। তারপর ওর ভিতর থেকে যেগুলি লোপ পাবার তা লোপ পেয়ে যেগুলি থাকবার মতো সেইগুলিকে নিয়ে একত্রে জোড়াতাড়া দিয়ে এক নবতর অস্তিত্বের নতুন আকারে নবীন তেজে তা প্রকট হয়ে উঠছে।

ভারতীয় যোগ হলো প্রকৃতিরই কতকগুলি মহাশক্তির বিশিষ্ট ক্রিয়াব সংহত গঠন, যার মধ্যে ভবিষ্যৎ মানবজীবনের শক্তিবিভব অন্তর্নিহিত। স্মরণাতীত কাল থেকে যে শিশু তার প্রাণকে ও সত্যকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ঐ গুপ্ত অবস্থাতেই বজায় রেখে আসছে তার গোপন যোগ পদ্ধতি ও সন্ন্যাস আশ্রমাদির মধ্যে, তা এখন ভবিষ্যৎ মানবজীবনের শক্তি ও কার্যকারিতাব ক্ষেত্রে তার নিজস্ব স্থান ক'রে নিতে চাইছে।

কিন্তু তৎপূর্বে তার নিজেকে আগে পুনরুদ্ধার ক'রে আনতে হবে। অর্থাৎ তার সাধারণ সত্যের মধ্যে যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে এবং প্রকৃতিরও যা নিরন্তরের লক্ষ্য তাকে মুক্তভাবে প্রকাশ্যে এনে ফেলতে হবে, আব সেই নূতন আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধির দৃষ্টিতে নিজেকে মুক্ত ও বৃহত্তরভাবে সংশ্লেষণ ক'রে নিতে হবে। এমন ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হলে তখন তা নবগঠিত জাতির জীবনের মধ্যে সহজেই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আপন গুহ্য প্রণালীতে দীক্ষিত ক'রে তাদের উঠিয়ে নিয়ে যাবে তাদের আপন অস্থিত্বের ও ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ স্তরে।

যোগের মূল তত্ত্ব হলো আমাদের মানব অস্তিত্বের কোনো এক শক্তিকে বা সকল শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তার সাহায্যে ভগবৎ সত্তাব সান্নিধ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। সাধারণ যোগে কেবল একটিকে বা এক পর্যায়েরই শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তারই মাধ্যমে বা তারই জোরে সেই পথ ক'রে নেওয়া হয়। কিন্তু সর্বসংশ্লেষণমূলক যোগে যাবতীয় সর্ববিধ শক্তিকেই একজোট ক'রে নিয়ে তাকেই ঐরূপ পরিবর্তনকারী যন্ত্রে পরিণত করতে হবে।

হঠযোগের বেলাতে এই সাধনার যন্ত্র ক'রে নেওয়া হয়েছে দেহকে

ও জীবনকে। প্রাণায়াম ও আসনাদির দ্বারা এবং অন্যান্য দৈহিক প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহের সকল শক্তিকে সংহৃত, বিশুদ্ধীকৃত, উন্নত ও চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীভূত করা হয়, এবং ঐ উপায়ে জীবন সম্বন্ধেও তাই করা হয়। এই সংহৃত শক্তিকে তখন সেই দেহকেন্দ্রের দিকে নিবিষ্ট করা হয় যেখানে ভগবৎ চেতনা রয়েছে গুপ্তভাবে অন্তর্নিহিত। জীবনের ও প্রকৃতির সকল শক্তি তার গুহ্য তেজকে গুটিয়ে নিয়ে কুণ্ডলিত অবস্থায় নিদ্রিত রয়েছে পার্থিব সত্তার সর্বনিম্নস্থ স্নায়ুজালকের মধ্যে—কেবল জাগ্রত অবস্থায় জীবনের সাধারণ সীমায়িত কাজগুলি করবার জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকুই ওর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে—সেই কুণ্ডলিনী শক্তি তখন স্বরূপে জাগ্রত হয়ে কেন্দ্রের পর কেন্দ্র অতিক্রম ক'রে উপরে উঠতে থাকে আমাদের সত্তার ও স্নায়বিক জীবনের, আমাদের মনের ও ভাবগ্রাহী হৃদয়ের, আমাদের বাচনের ও দৃষ্টির ও ইচ্ছার ও উচ্চতর জ্ঞান স্থানের বিভিন্ন পর্বের পর পর্ব ভেদ ক'রে, শেষে মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে উপরে উঠে ভগবৎ চেতনার সঙ্গে মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়।

রাজযোগের বেলাতে ওর পক্ষে নির্বাচিত যন্ত্র হলো মন। আমাদের এই সাধারণ মনকে আগে বিশুদ্ধীকৃত ও সুসংযত ক'রে ভগবৎ সত্তার দিকে নিযুক্ত রাখা হয়, অতঃপর আসন ও প্রাণায়ামের সাহায্যে সত্তার দৈহিক শক্তিকেও শুদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত ক'রে জীবনীশক্তিকে ছন্দায়িত ক্রিয়াতে উচ্চতর শক্তি সহকারে উপরদিকে নিয়োজিত করা হয়, তাতে সেই মনটি দেহের ও জীবনের তরফের শক্তির ভিত্তি পেয়ে তারই দ্বারা আরো সমৃদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, তার সমস্ত চঞ্চলতা ও অভ্যস্ত ভাবপ্রবাহ ও চিন্তাপ্রবাহ থেকে এবং সকল প্রকার বিক্ষোভ ও বিক্ষিপ্ততা থেকে মুক্তি পেয়ে আরো উচ্চতর শক্তিতে কেন্দ্রীভূত হয়ে তুরীয়ে নিমগ্ন হয়ে যায়। এই যোগের দ্বারা দুইরূপ ফল মেলে, পার্থিব ও শাশ্বত। মনঃশক্তি বৃদ্ধি পেয়ে অসাধারণ রকমের প্রজ্ঞা লাভ করে, তার ইচ্ছাশক্তি বাড়ে, সহিষ্ণুতার আলো গভীরতর হয়। আমাদের মনের সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে চিন্তাধারার তেজঃক্রিয় জ্যোতিকে অনেক দূর পর্যন্ত বিচ্ছুরিত করা যায়; আর এতে এমন যোগশক্তি বা গুহ্যশক্তি লাভ করা যায় যার সম্বন্ধে অনেক রহস্যময় বৃত্তান্ত রচিত হয়ে আসছে এবং তার মধ্যে অনেক কল্যাণকারী ক্রিয়ার কথাও আছে। কিন্তু

এতে শেষ পর্যন্ত সব চেয়ে বড়ো লাভ এই হয় যে মনটি একেবারে স্তব্ধ হয়ে নিবিড়তম সমাধির অবস্থায় পৌঁছে ভগবৎ চেতনার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, আর আত্মাটিও মুক্ত হয়ে পরাৎপর সত্তার সঙ্গে মিলিত হয়।

আর ত্রিমার্গীয় যোগের নির্বাচিত যন্ত্র হলো মানুষের মনোময় আত্মিক জীবনের প্রধান প্রধান তিনরকম শক্তিরই সমন্বিত প্রয়োগ। তার জ্ঞানের দিক বেছে নেয় বুদ্ধিবৃত্তিকে ও মনের দর্শনশক্তিকে, এবং তারই বিশুদ্ধি ও সংহতির দ্বারা তাকে একান্ত ভগবৎমুখী হতে অভ্যস্ত করিয়ে তার ফলে চরম জ্ঞান ও চরম দৃষ্টি অর্থাৎ ভগবৎজ্ঞান ও ভগবৎ দৃষ্টি অর্জন করে। এর লক্ষ্য হলো ভগবানকে জানা, ভগবানকে দেখা, ভগবৎ সত্তায় পরিণত হওয়া। আর কর্মযোগের দিক বেছে নেয় কর্ম কর্তার ইচ্ছাশক্তিকে; তার নিজের জীবনকে সে ভগবানের কাছে উৎসর্গ ক'রে দেয়, এবং সেই সাধনাতেই বিশুদ্ধ সংহতি এনে নিজেকে ভগবৎ ইচ্ছারই অনুগত ক'রে নিয়ে এই উপায়ের দ্বারাই আত্মাকে উত্তরোত্তর বিশ্বপ্রভুর সংস্পর্শে এনে তাঁর সঙ্গে মিলিত করে। আর ভক্তিযোগের দিক বেছে নেয় আত্মার ভাবপ্রবণ ও কমনীয় গুণের শক্তিধারাকে এবং তারই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি ও তীব্রতা ঘটিয়ে অসীম আগ্রহের সঙ্গে ভক্তিতে ভগবানকে কামনা করতে থাকে, এবং তাঁর সঙ্গে এক বা একাধিক রকমের সম্বন্ধ স্থাপনা ক'রে সেই পথেই তাঁকে লাভ করে ও তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়। অতএব প্রত্যেক দিকেরই লক্ষ্য হলো তার আপন আপন পথে মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একত্ব বা মিলন ঘটানো।

তান্ত্রিক সাধনা হলো সব কিছুকে নিয়ে একটা সংশ্লেষণকারী ব্যাপার। সবচেয়ে বড়ো এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারে ধরে নেওয়া হয়েছে সকলকিছুর অস্তিত্বের দুই অন্তিম প্রান্তকে—ব্রহ্ম ও শক্তি, আত্মা ও প্রকৃতি। যার একত্র মিলনই হলো সকল অস্তিত্বের মূল রহস্য, আর প্রকৃতি হলো আত্মারই শক্তি বা শক্তিরূপী আত্মা। এ সাধনার পদ্ধতি হলো আমাদের মানব প্রকৃতিকে অভিব্যক্ত আত্মিক প্রকৃতিতে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া, এবং এই আধ্যাত্মিক রূপান্তর আনবার জন্য সমগ্র প্রকৃতিকেই একত্রে সংহত করা হয়। এর মধ্যে হঠযোগের কঠিন প্রক্রিয়াগুলিকেও প্রয়োগ করা হয়, বিশেষত স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে উন্মীলিত ক'রে তার ভিতর দিয়ে জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তিকে উপরে উঠিয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত ক'রে দেওয়া, রাজযোগেরও

বিশুদ্ধীকরণ ও একাগ্রচিত্ত ধ্যানরীতিও সেই সঙ্গে আনয়ন করা, কর্মেরও ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা, এবং ভক্তিমার্গের ও শক্তির এমন চূড়ান্ত সাধনা করা, যার ফলে পরম জ্ঞানেরও দৃষ্টি খোলে।

কিন্তু এই সকল বিভিন্ন যোগের একত্র সমন্বয় ঘটিয়েই এর কাজ শেষ হয় না। দুই দিক দিয়ে এই যোগের ক্ষেত্র ওর চেয়ে আরো বেশি বিস্তৃত। প্রথমত, মানব চরিত্রের মধ্যে যে প্রধান প্রধান জিনিসগুলি আছে, যেমন কামনা, কর্মব্যস্ততা, তাকে বাদ না দিয়ে তার উপরেও কঠিন হস্তে আত্যন্তিক শাসন ও সংযম আনিয়ে তাকে আত্মার প্রভুত্বের অধীন ক'রে রাখা এর লক্ষ্য, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে দিব্যতর আধ্যাত্মিক স্তরে উঠিয়ে সার্থকভাবে তদুপযোগী কাজে প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয়ত, এ যোগের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত কেবল মুক্তি নয়, যা অন্যান্য যোগের একমাত্র লক্ষ্য, কিন্তু যে আত্মিক শক্তি অর্জিত হলো তাকে বিশ্বের ভোগে লাগানো, যা অন্যান্য যোগে সম্ভব হলেও অনেকটা আংশিকভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। সুতরাং এ যোগ অন্যান্যগুলির চেয়ে অসমসাহসিক ও বৃহত্তর ধরনের।

…সকল যোগেরই আদি উদ্দেশ্য হলো মানুষের বর্তমান স্বাভাবিক অজ্ঞানতা ও সংকীর্ণতা হতে তার আত্মাকে তার আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে মুক্তি দেওয়া, তার সর্বোচ্চ উৎস যে পরমাত্মা তার সঙ্গে মিলিত করা। কিন্তু সাধারণত এ কেবল আদি উদ্দেশ্য থাকেনা, এই হয় সামগ্রিক ও চরম লক্ষ্য ; অধ্যাত্ম সত্তার আনন্দভোগ ওতে আছে বটে, কিন্তু তা হয় ব্যক্তি-সত্তা তার নীরবতার মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে অথবা অস্তিত্বের অন্য কোনো উচ্চস্তরে উঠে গিয়ে। তান্ত্রিক সাধনারও লক্ষ্য মুক্তি, কিন্তু তাই একমাত্র লক্ষ্য নয় ; তা ছাড়াও রয়েছে আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের পূর্ণ উপভোগ, মানব অস্তিত্বেরও আলো এবং আনন্দগুলিকে উপভোগ, এবং সেই চরম উপলব্ধির আভাসও মেলে যাতে সকল বাধা ও অনৈক্যকে জয় ক'রে মুক্তির উপভোগ ও বিশ্বক্রিয়ার উপভোগ উভয়ে মিলে এক হয়ে যায়। এই বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে পূর্বে যে আধ্যাত্মিক সূত্র অনুসরণ করা হচ্ছিল তার সঙ্গে আরো যোগ হয় ওর তদপেক্ষা পূর্ণতর তাৎপর্য। কেবল যে ব্যক্তিসত্তাই চলেছে পরাৎপর সত্তার সঙ্গে মিলিত হতে তা নয়, কিন্তু সকল আত্মা ও সকল প্রকৃতিকে নিয়ে যে বিশ্বসত্তা তাও সেই ভগবৎ সত্তার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও। ব্যক্তিআত্মার মিলন ও আনন্দ অবশ্য যোগের প্রথম লক্ষ্য ;

তার দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো তাঁর বিশ্বআত্মার সঙ্গে একত্ব উপভোগ; কিন্তু তার থেকে এসে পড়ে আরো এক তৃতীয় লক্ষ্য, তা হলো ভগবৎ মিলনে সকল সত্তার সঙ্গেও মিলন ও সমতা উপলব্ধি এবং ভগবানের মানব অভিব্যক্তির আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করা। ব্যক্তিগত যোগ তখন আপন স্বতন্ত্র সাধনা থেকে পরিণত হয় সর্ব মানব জাতির দিব্য-প্রকৃতির সামগ্রিক যোগ সাধনাতে। মুক্ত সত্তা তখন ভগবানের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বাভাবিক রূপেই সর্ব মানুষের মধ্যে ভগবানের পূর্ণবিকাশের সহায়ক যন্ত্রস্বরূপ হয়ে পড়ে।"

ভারতীয় শিল্পকলা

"ভারতীয় স্থাপত্য, তার চিত্রকলা, তার ভাস্কর্য, এই সকলের প্রেরণা যে কেবল ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম ও যোগ ও সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র হতেই আসে তা নয়, কিন্তু এগুলির দ্বারা তারই তাৎপর্য আরো বেশি ক'রে পরিস্ফুট করা হয়। ··

প্রাচীন ভারতে যে সব হর্ম্য সৌধ ও সভামণ্ডপ প্রভৃতি রচিত হয়েছিল, তা কালের গ্রাস থেকে নিষ্কৃতি পায়নি; যা অবশিষ্ট আছে তা বৃহৎ বৃহৎ পর্বতগুহাস্থিত ও প্রাচীন তীর্থ ও প্রাচীন নগরাদির সুদৃঢ় মন্দিরগুলি, ও পরবর্তীকালের দেবালয়গুলি।······

ভারতের যত কিছু প্রাচীন পবিত্রস্থানের স্থাপত্য, তা যখনই যে ভাবে যে দেবতার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়ে থাক, তা এখন কালাতীত এবং ভারতের বাইরে তার কোনো অস্তিত্বমূল্যই নেই, সেগুলি সম্পূর্ণই অতীতের জিনিস, তথাপি যুক্তিবিচারী মন বিশ্বাস না করলেও এ সব জিনিসের সার্থকতা আবার ভবিষ্যতে আমাদের কাছে ফিরে আসবে এবং এখনই ফিরে আসতে শুরু করেছে। কোনো মন্দির বা দেউল যে-দেবতার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়ে থাক, তা পরমাত্মার বেদী রূপেই গঠিত, তা বিশ্বাত্মারই সাধনার স্থান, যেখানে অনন্তেরই জন্য আস্পৃহা ও উপাসনা করা হয়েছে এবং হবে। প্রথমে এই দৃষ্টি নিয়ে এই আলোতেই যখন জিনিসটাকে বোঝা হবে তখনই ঐগুলির প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হবে।

এখানে যে বড়ো বড়ো মসজিদগুলি আছে তা হলো ধর্মীয় আস্পৃহার

ও পরম তপস্যার স্থান, তার মধ্যে যে অলংকরণ ও শোভার বাহুল্য আছে তাতে তার আসল উদ্দেশ্য কিছু হ্রাস পায় নি। যে সকল সমাধি-মন্দির রচিত হয়েছে তাতে মৃত্যুপারের স্বর্গীয় সৌন্দর্য ও আনন্দই অভিব্যক্ত করা হয়েছে। ফতেপুর শিকরির যে সুরম্য অট্টালিকাগুলি, তাকে নারীমনসুলভ তখনকার বিলাসিতা ও ব্যসনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মাত্র মনে করা উচিত নয়—তাতে তখনকার কালের আকবর বাদশাহের ভুল পরিচয়ই দেওয়া হবে—কিন্তু ওগুলি বস্তুত মহত্বের ও শক্তিমত্তার ও সৌন্দর্যবোধের অক্ষয় নিদর্শন রূপে পৃথিবীর মাটির উপর এখনও দাঁড়িয়ে আছে। যদিও সেই পূর্বেকার ভারতীয় মনের আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ ওর মধ্যে নেই, তথাপি ভারতীয় মনের দ্বারাই রচিত ঐ সব সূক্ষ্ম কারুকার্যের মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার প্রভাব এসে প্রবেশ করেছে, যার মধ্যে আগেকার কালিদাসের কাব্যের মতো রসের সন্ধানও মেলে, কিন্তু তার বাস্তবোত্তীর্ণ এক অপূর্ব যাদুগুণ মর্ত পৃথিবীকে ছাড়িয়ে উপরে উঠে গিয়ে একটা দিব্যভাবের আভাস এনে দিয়ে ভগবানের অঞ্চলস্পর্শ অনুভব করায়।......

আরো আগেকার যে সব প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন এখানে রয়েছে, সেগুলি হলো উপনিষদের প্রেরণামূলক চিন্তাকে বাস্তবে মূর্তিদান ক'রে সকলের প্রত্যক্ষীভূত করা, এবং মহাভারত ও রামায়ণের কথিত উপাখ্যানকে কল্পিত মূর্তির দ্বারা রূপায়িত করা। স্থাপত্যের ন্যায় এই ভাস্কর্যেরও সৃষ্টি হয়েছে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হতে। ওতে যা প্রকাশ পেয়েছে তা স্থূল দেহাকারে আত্মারই স্বরূপ, দিব্য কিংবা মানবীয় জীবন্ত আত্মিক শক্তিরই প্রতিরূপ। বিশ্ব ও ব্রহ্মাণ্ডের ভাবটিকে ব্যক্তির আকারে রূপ দেওয়া। কিন্তু ব্যক্তিরূপের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তা হারিয়ে যায়নি, বরং নির্ব্যক্তিকতাই সমর্থন দিয়েছে সেই ব্যক্তিরূপকে। তার মধ্যে নিহিত হয়ে আছে শাশ্বতের উপস্থিতি, শাশ্বতের ভাব ও শক্তি ও শান্তিগর্ভ আত্মিক আনন্দ, তার সকল ক্রিয়াতে ও সকল রূপসৃষ্টিতে। এমনি করে সকল শিল্পকলার মধ্যেই ভিতরকার এই উদ্দেশ্যটি বরাবর বজায় আছে, এবং এমন কি ভাস্করের নিজের মনে সে ভাবের উদয় না হলেও তার শিক্ষানুযায়ী যা সে গড়েছে তার মধ্যে ঐ উদ্দেশ্যেরই আভাস থেকে গেছে। সুতরাং কি প্রাচীন স্থাপত্য বা কি ভাস্কর্য দুই জিনিসকেই আমাদের দেখতে হবে অনুরূপ মনোভাব নিয়ে ও অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, সেখানে আমাদের নিজেদেরই অন্তরের গভীর দিক

থেকে তাকে দেখতে হবে, ইউরোপীয় বাহ্যতর কাল্পনিক শিল্পের মতো ক'রে নয়।……

ভারতীয় চিত্রকলার বেলাতেও ঠিক তাই। তার কেন্দ্রগত ভাবনাতে রূপ ও আকার দানের দৃষ্টিশক্তি ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রেরণাদায়ক দৃষ্টিশক্তিরই অনুরূপ। ভারতের শিল্প মাত্রই হলো গভীরতম আত্মদৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ, ভিতরে প্রবেশ ক'রে বাহ্য আকৃতির ও রূপের প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ করা, গভীরতর অন্তরের মধ্যে তারই বিষয়বস্তুকে আবিষ্কার করা, এবং বাহিরে সেই বস্তুকে এমন স্বাভাবিক গঠন দেওয়া যাতে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও শক্তিব্যঞ্জক রেখাতে ও কেন্দ্রীভূত ছন্দের ঐক্যে সেই শিল্পসৃষ্টি সমগ্রভাবে মোটের উপর তার মূলগত চৈত্য সত্যটিকে প্রকাশ করে। ভারতীয় চিত্রকলার যে কোনো শ্রেষ্ঠ নিদর্শনকে লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাবো যে এইরূপ উদ্দেশ্যই সেখানে ব্যক্ত হয়েছে এক মহিমান্বিত সৌন্দর্যসৃষ্টির ভিতর দিয়ে।…"

ভারতীয় সাহিত্য

"যাবতীয় হিন্দু কাব্যগুলির প্রধান লক্ষণ এই যে তাতে কেবল জীবনচিত্র ও চরিত্রচিত্রণ নিয়ে তাকেই রূপদান করাতে সীমাবদ্ধ হতে তা চায়নি, কিন্তু প্রধানত চেয়েছে অন্তরের কান্ত ভাবগুলিকে প্রকাশ করতে; এমন সহজ ও সূক্ষ্ম সঙ্গতির সঙ্গে দ্রষ্টার অন্তরে সেই কান্ত ভাবের উদ্রেক ক'রে তাকে পরিতৃপ্ত করা ছিল উদ্দেশ্য, যাতে মানবসুলভ অনুভূতিগুলির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তা মিলে যায়; জোর ক'রে মানুষের অন্তরের চুলের মুঠি ধরে তাকে ওতে উত্তেজিত ও কম্পান্বিত ক'রে পর্যুদস্ত করার কৌশল তা নয়।…

হিন্দু কবির মন কেবল প্রচণ্ডতা ও বিভীষিকা ও বিয়োগান্ত তীব্র বিলাপাদির বর্ণনা করা থেকেই বিরত ছিলনা, কিন্তু গ্রীক কবিরা যেমন নৈতিক বিষয় নিয়ে ট্রাজেডি রচনা করতেন তার থেকেও বিরত ছিল; তা ছাড়া বর্তমান যুগের নাটক উপন্যাসাদিতে যেমন দৈহিক ব্যাধি, স্নায়বিক বিকৃতি ও মানসিক বৈকল্য প্রভৃতিকে মুখ্য বিষয়বস্তু করা হয় তার উল্লেখমাত্র থেকেও বিরত ছিল।

হিন্দু নাটকে দেখা যায় একটা উপভোগ্য সৌন্দর্যের পরিবেশ, একটা উচুদরের সৌজন্য ও বরণীয় ভাবসাম্য, সূর্যালোকের আনন্দ ও পুষ্পদলের

াধুর্যের প্রতি একটা চিরন্তন প্রশস্তি; দুঃখ এবং ভীতির পরিস্থিতি যেখানে া আছে সেখানেও তা হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে জাগাবার জন্য, ছুরির দাগ সাবার জন্য নয়,—এবং প্রত্যেক নাটকেরই সমাপ্তি হয়েছে নিরাবিল আনন্দ ও শান্তির রেখা টেনে; মাঝে মাঝে মেঘ জমে উঠেছে, কিন্তু তা সূর্যালোকের দীপ্তিকেই সুন্দরতর ও স্ফুটতর ক'রে তোলবার জন্য, কারণ তাতেই সব কিছুর উৎপত্তি ও তাতেই সব কিছুর লয়।

এমন ধরনের শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই আত্মা প্রসন্ন বোধ করতে পারে, শীলতা ও সংস্কৃতি ওতে দৃঢ়ভিত্তি লাভ করতে পারে, অমিশ্র বুদ্ধিতৃপ্তি ও স্নিগ্ধ-কলারস আস্বাদনের আনন্দলাভ কবতে পারে। আর এতে জীবনের কাঠিন্য ও বৈষম্যাদির নিষ্ঠুর পীড়ন থেকে সরে গিয়ে মানুষের মন ঐ শিল্পসৌন্দর্যের ইন্দ্রজালের মধ্যে পরিতুষ্টি ও আশ্রয় লাভ করে।

সংস্কৃত কাব্যগুলির ধারা চিরদিনই উচ্চমার্গীয়; গণবাদের মতো মনোভাব বা এখনকার মতো সাধারণ মানুষের মামুলী সুখদুঃখ নিয়ে কারবার তার মধ্যে নেই, তার নায়ক নায়িকারা 'প্রাকৃতো জনাঃ'দের পর্যায়ের মধ্যে পড়েনা, তারা সকলেই উচ্চমনা ও উন্নত প্রকৃতির। তারা সকলেই অনন্যসাধারণ 'মহাজনাঃ', যাদের আদর্শ অন্যান্য সকলে অনুসরণ করবে। এই উচ্চাদর্শধর্মী চরিত্রচিত্রণের বিরুদ্ধে এখন যে ভাবেরই যুক্তি দেখানো হোক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই সব সম্ভ্রান্ত চরিত্র এবং বীরত্ব ও মহত্বের দৃষ্টান্ত জাতিকে উন্নত করতে এবং ইতিহাসে তাকে গৌরবের স্থান দিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে· ·

প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে যে সকল মহাকাব্য প্রভৃতি রচিত হয়েছে তার ভাষা ও ভাবের চমৎকারিত্বে, তার মৌলিকতা ও সৌন্দর্যে, তার সুশৃঙ্খল রচনানৈপুণ্যে , তার শ্রুতিমধুর বাক্যচয়নের মনোমুগ্ধকর ঐশ্বর্যে, এবং তার ভাবের প্রসারতায় ও উচ্চতায় জগতের সকল সাহিত্যের মধ্যে সেগুলিকে প্রথম শ্রেণীতে গণ্য করা যেতে পারে।

কেবল যে সংস্কৃত ভাষাতেই ভারতীয় মনের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতর অবদানগুলি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়, যদিও সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও মহিমান্বিত গ্রন্থগুলি মূলতঃ সংস্কৃতেই রচিত। তথাপি পালি ভাষাতে রচিত উৎকৃষ্ট রকমের বৌদ্ধ সাহিত্য এবং অল্পবিস্তর কাব্যরচনাও অপ্রতুল নয়, এবং অন্যান্য প্রায় বারো রকমের সাংস্কৃতিক ভাষাতে এবং দ্রাবিড়ী ভাষাতেও তার প্রচুর নিদর্শন আছে।

যেহেতু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম সূত্রপাত বেদ ও উপনিষদ হতে, তাই পরবর্তীকালের সাহিত্যগুলিরও সূচনা হয়েছে সাধুসন্তদের ও ভক্তজনের প্রেরণামূলক কাব্যধারা নিয়ে; কারণ ভারতে চিরদিন কোনোরূপ একটা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার ফলেই নতুন নতুন ভাবধারার ও নতুন রকম সম্ভাবনার বিকাশ ঘটেছে, এবং তার থেকে জাতির জীবনেও অনুরূপ পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান যুগের আগে বরাবরই এখানকার ভাষাগুলিতে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা ওর থেকেই এসেছিল, কারণ ঐ ধরনের ভক্তিমূলক ও আধ্যাত্মিক কাব্যাদিই এখানকার লোকের হৃদয়ে ও মনে সাড়া জাগিয়ে তুলতো; এবং যেখানে সাংসারিক বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু রচিত হয়েছে তার মধ্যেও ধর্মভাব প্রবেশ ক'রে তাই কাঠামোস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং তার সুর বা উদ্দেশ্যও সেই-ভাবে পাল্টে গেছে। এই সকল কাব্যের মধ্যে যে রসপ্রাচুর্য, যে আশ্চর্য কবিত্বসৃষ্টি, যে স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রকৃত গীতিকাব্য সৃষ্টির সৌকর্য প্রকাশ পেয়েছে, তার তুলনা এইরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোনো দেশের সাহিত্যেই নেই।...এখানকার সাহিত্যের আর একটি দিক আছে, যাতে প্রাচীন সংস্কৃতির মূল কথাকেই সাধারণ প্রচলিত ভাষায় সহজ লোকবোধ্য কাব্যে প্রকাশ করে মহাভারত ও রামায়ণের গল্পগুলি অথবা প্রাচীন রমণীয় কিংবদন্তীগুলি পুনরায় নূতন ভাবে রচিত হয়েছে; এর মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে সর্বোচ্চ রকমের প্রতিভা এবং তার চেয়ে কিছু কমদরের আরো অনেক সুদক্ষ প্রতিভার ক্রিয়া। আর তৃতীয় এক ধরনের সাহিত্য আছে, যাতে কেবল লোকায়ত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মভাবের কথা, নানারূপ রাজসভা ও নগরজীবনের ও পল্লী জীবনের কথা, জমিদার ও ব্যবসায়ী, শিল্পী ও চাষীদের কথাও স্থান পেয়েছে সেগুলি অধিকাংশই নানারূপ স্থানীয় ভাষাতে রচিত।...

কিন্তু এর মধ্যে আবার নানারূপ বৈচিত্র্যও আছে। যেমন মহারাষ্ট্রে রামদাসের রচিত ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক কবিতাগুলি, কিংবা প্রসিদ্ধ তামিল সাধু তিরুভল্লুভারের ভাবে ও রচনাশক্তিতে অনন্যসাধারণ ও পবি কল্পনায় সর্বোচ্চ ধরনের বিজ্ঞানময় কবিতাগুলি। ওর দুই একটি ভাষাতে পরে কিছু কামমূলক কবিতাও রচিত হয়েছে, কিন্তু তাতেও ঐহিক প্রেরণা দায়ক গীতিকাব্যময় সৌন্দর্যের অভাব নেই। বিভিন্ন প্রদেশের স্থানীয় কবিদে রচনার মধ্যেও সৃষ্টিবৈচিত্র্য যথেষ্টই আছে, এবং প্রত্যেকেই আপন আপ চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও মনোভাব অনুসারে আপন আপন ধারাকে অনুসরণ করেছে

তথাপি তার মধ্যে একই সংস্কৃতির লক্ষণ প্রকট হয়ে সৌন্দর্যের ও ঐশ্বর্যের বিচিত্রতা নিয়ে একই স্থানে এসে মিলেছে।...

যে জাতির ও যে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও শ্রেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য জিনিস হলো বেদ ও উপনিষদ, আর যার বিরাট ও অমর মহাকাব্য হলো মহাভারত ও রামায়ণ, যেখানে কাব্যে ও নাটকে অমর হয়ে আছেন কালিদাস, ভবভূতি ভর্তৃহরি, জয়দেব,—যেখানকার অতুলনীয় গ্রন্থ ধম্মপাদ ও জাতক-সমূহ, পঞ্চতন্ত্র, তুলসীদাস ও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের রচনা, রামদাস ও তুকারাম, তিরুভল্লুভর ও কম্বন, নানক ও কবীর ও মীরাবাঈএর অপূর্ব মধুর ভজন গান, দক্ষিণী শৈব সাধুদের ও আলোয়ারদের বন্দনাগান,—এখানে কেবল কতকগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ও রচয়িতার নামই করা হলো—সেখানে এর থেকেই প্রমাণ হয় যে জগতের সর্বোন্নত ও সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা-সম্পন্ন ও সৃষ্টিকুশলী জাতিদের মধ্যে এ-জাতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান নিশ্চয়ই আছে।"

ভারতীয় সংস্কৃতির জীবনমূল্য

"যে জাতির প্রকৃতিতে যে কাজ সর্বাপেক্ষা সহজাত, এবং যার স্বধর্ম যে সব কাজে সর্বোত্তম রূপে প্রকাশ পায়, সেই প্রকার কাজই সে জাতি স্বভাবতই বিশদভাবে করে থাকে। ভারতের শীর্ষস্থানে চিরদিনই রয়েছেন সাধু মহর্ষি ও ধর্মসংস্থাপক মহাজনেরা, তাঁরাই বরাবর ছিলেন এখানে সর্বপ্রধান—যেমন রোম রাজ্যে বীর ও রাজনীতিজ্ঞ ও শাসকরাই ছিল সর্বপ্রধান; প্রাচীন ভারতে ঋষিরাই ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য, তাঁদের পশ্চাতে ছিলেন বীরপুরুষেরা, এবং পরবর্তী যুগে তারই সুদীর্ঘ ধারা অনুসরণ করে একে একে দেখা দিলেন বুদ্ধ ও মহাবীর থেকে রামানুজ, চৈতন্য, নানক, রামদাস, তুকারাম এবং তারও পরে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দ।

কিন্তু তদ্ভিন্ন রাজনীতিজ্ঞ ও রাজ্যশাসকদের কীর্তিও কম নয়, কারণ নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের শুরু থেকেই দেখা যায় অনেক বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের, যেমন চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, অশোক, গুপ্ত রাজগণ, তার পরেই মধ্য যুগের হিন্দু ও মুসলমান অনেক স্মরণীয় রাজ্য শাসকদের আবির্ভাব, অনতিপূর্ব বর্তমান কাল পর্যন্ত। প্রাচীন ভারতে প্রজাতন্ত্র ছিল, গণতন্ত্রও ছিল, নির্দিষ্ট

কয়েকজন নির্বাচিত শাসকে মিলে রাজ্যশাসনের ব্যবস্থাও ছিল, এবং ছোটো ছোটো অনেক কৃতী রাজার রাজত্বও ছিল যার বিশেষ ইতিহাস এখন অবলুপ্ত; তার পরে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও সুদীর্ঘকাল চলেছিল, আর এখান থেকে সিংহলে এবং পারিপার্শ্বিক দ্বীপে উপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টাও হয়েছিল। তার পরে হলো পাঠান ও মোগল বংশের উত্থান পতন, দক্ষিণদেশে হিন্দু রাজ্যের পুনরুত্থানের প্রয়াস এবং রাজপুত বীরত্বের অপূর্ব ইতিহাস, মহারাষ্ট্রে জনগণের নিম্নতর পর্যন্তকে উদ্বুদ্ধ ক'রে জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন, এবং শিখ খালসাদের স্মরণীয় কীর্তি।

ভারতের বাহ্য জীবনের পরিপূর্ণ চিত্রের ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি; সে জিনিস রচিত হলে অনেক উপন্যাসকেই তা হার মানাবে। এখানে যে সকল বিরাট বিরাট কাণ্ড ঘটে গেছে তা এমন ব্যক্তিদের দ্বারা সাধিত হয়নি যাদের মনের ও প্রাণের কোনো তেজ ছিলনা, সন্ন্যাসের সাধনা করতে করতে যাদের পুরুষত্ব নষ্ট হয়ে একেবারে হীনবীর্য হয়ে পড়েছিল, কিংবা এমন কোনো দার্শনিক মনোভাবের লক্ষণও ছিলনা যাতে জীবন ও কর্মের প্রতি বিরূপ হয়ে লোকে কেবল স্বপ্ন নিয়েই দিন কাটাতো। তারা এখানে কত বিভিন্ন রকমের কীর্তি রেখে গেছে, কত আশ্চর্য পরিকল্পনা গড়ে তুলেছে, শত্রু জয় করেছে, উৎকৃষ্ট শাসন রীতির প্রবর্তন করেছে, বড়ো বড়ো রাজ্য সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে, কত কাব্য শিল্প ও স্থাপত্যের প্রচেষ্টাকে উৎসাহদান করেছে, দাম্ভিক রাজাধিরাজের শক্তির বিরুদ্ধে এবং সম্প্রদায়ের বা জাতির মুক্তি সংগ্রামে যারা কতই লড়েছে, তারা প্রাণহীন তৃণখণ্ডের মতো বা ইচ্ছাশূন্য কাষ্ঠ পুত্তলিকার মতো বা নিস্তেজ স্বপ্নচারীর মতো অপদার্থ মানুষ ছিলনা।

অনবরতই উত্তরোত্তর নানা প্রতিকূল অবস্থার চাপ বেড়ে যেতে থাকা সত্ত্বেও যে জাতি তার আপন অস্তিত্বকে ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে এবং পুনঃপুনঃ দমিত হওয়া সত্ত্বেও আবার নতুন ভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে জেগে উঠেছে, সে জাতিকে প্রাণহীন বলা যায় না। বর্তমান যুগে ভারতে যে ধার্মিক, সাংস্কৃতিক, ও রাজনৈতিক নতুন তৎপরতা দেখা যাচ্ছে তাঁকে মাঝে মাঝে পুনরভ্যুত্থান বলা হয়ে থাকে, যাতে প্রতিপক্ষদের মনে দারুণ বিক্ষোভ ও জ্বালা উপস্থিত হয়, কিন্তু বাস্তবিক তা আর কিছুই নয়। এ-জাতির পূর্ব চরিত্রেরই সেটা পুনরাবৃত্তি, অবস্থার পরিবর্তন অনুসারে

তদনুরূপ এক নতুন ধারা নিয়েছে মাত্র, এবং জনগণও তাতে অধিকতর ভাবে অংশগ্রহণ করছে, যদিও এখনও ততটা প্রকট নয়, কিন্তু এই জিনিসই ভারতের ইতিহাসে সহস্র সহস্র বৎসর ধরে চলে আসছে।

আর এ-কথাও বিশেষ ক'রে স্মরণীয় যে এখানকার এই সংস্কৃতির ধারার এমনি গুণ যে সমগ্র জাতির সাধারণ জীবনের মধ্যেও তা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। অন্যান্য দেশের অতীত ইতিহাসে দেখা যায় যে কেবল নির্দিষ্ট কয়েকজনের মধ্যেই যা কিছু উন্নতি ও ক্রিয়াশক্তির তৎপরতা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু বাকী জনসাধারণ তাতে অংশগ্রহণ করতে পারেনি—তারা গতানুগতিক ভাবে প্রাণধারণ ক'রে গেছে, ঐরূপ কোনো ঐশ্বর্যের সামান্য কিছুও তাদের মধ্যে দেখা যায়নি—এবং বর্তমান সভ্যতার ক্ষেত্রেও ঐরূপ তারতম্য আজও পর্যন্ত ঘোচেনি, যদিও সুযোগের অনেক বিস্তার হয়েছে এবং জ্ঞান ও চিন্তার উন্নতি আগের চেয়ে অনেক অধিক সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যেই ঘটেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে যদিও উচ্চশ্রেণীর লোকেদেরই প্রাধান্য ছিল এবং জীবনের ঐশ্বর্যগুলি বেশির ভাগ তাদেরই দখলে ছিল, তথাপি সাধারণ জনগণও অনেকটা তেমনি ভাবেই জীবনযাপন করত এবং পরবর্তী কালে সেই সংস্কৃতির ধারা আরো বেশি ক'রে তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, যদিও অপেক্ষাকৃত মৃদুতর তেজে।

এদের ধর্মজীবনের দিকটা অন্যান্য যে-কোনো দেশের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল; এরা এখানকার দার্শনিকদের তত্ত্বগুলি ও সাধুসন্তদের নির্দেশগুলি সরলভাবে অনায়াসেই হজম ক'রে নিতে পেরেছে; বুদ্ধের বাণী এরা সকলেই শুনেছিল এবং তাঁর অনুশাসনগুলির অনুসরণও করেছিল, এবং পরবর্তী যুগে আরো যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কথাও এরা গ্রহণ করেছিল; অনেক সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে এদের শিক্ষা হয়েছে, ভক্তদের ভজনগান ও বাউলের গান এরা সকলেই গেয়েছে, সুতরাং সূক্ষ্ম ও গভীর সৌন্দর্যপূর্ণ কাব্য-সাহিত্যের রস কিছু কিছু সকলেই উপভোগ করেছে; আমাদের ধর্মের ইতিহাসে তারাও অবদান জুগিয়ে যাওয়াতে তাদের মধ্যেও অনেক মহৎ ব্যক্তির নাম অমর হয়ে আছে, এমন কি নিম্নস্তরের পতিত জাতিদের মধ্যেও এমন সাধুসন্তের উৎপত্তি হয়েছে যাদের কাছে সমগ্র জাতি অকুণ্ঠ ভক্তিতে চিরদিন মাথা নত করেছে।

প্রাচীন হিন্দু যুগে সাধারণ জনেরও রাজনীতিতে ও দেশের শাসন

ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশ ছিল; বেদে যাদের বলেছে 'বিশঃ' তাদের রাজা ছিল তাদেরই ভিতরকার নেতা, আর এদের ভিতর থেকেও অথবা কোনো পবিত্র বংশ বা রাজবংশ থেকেও ঋষিরা জন্মগ্রহণ করত; সাধারণ জনগণ আপন আপন গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় প্রজাতন্ত্র গড়ে গ্রামশাসন করত, বড়ো বড়ো রাজ্য ও সাম্রাজ্যের অধীনে তা পৌর সঙ্ঘের মতো কাজ করত, প্রাচীন পুস্তকাদিতে যে সব রাজ্যপরিষদের বর্ণনা আছে তাতে কেবল সাধারণ বৈশ্যেরাই ছিল সভ্য, সেখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা ক্ষত্রীয় রাজাদেব স্থান ছিল না; এরা রাজাদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারত, অসন্তোষ প্রকাশের দ্বারা রাজাদের ইচ্ছানুরূপ কাজ থেকে নিবৃত্ত কবতে পাবত। হিন্দু রাজ্য যতকাল ছিল ততকাল এইরূপই চলেছিল। পবে যখন মধ্য এশিয়া থেকে অত্যাচারী সর্বগ্রাসী দস্যুরা ভারতে প্রবেশ ক'বে দেশ অধিকার করল, তখনও এই প্রাচীন রীতির কিছু কিছু টিঁকে রইল।

কাব্যে এবং শিল্পেও এখানকার জনগণ যথেষ্ট অংশগ্রহণ কবেছে, এবং তারই মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলধারা সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীন বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যাপীঠ ছাড়াও এই ভাবে সাধারণের মধ্যে মৌলিক শিক্ষার প্রচার হতো। তা ছাড়াও জনপ্রিয় যাত্রা নাটক প্রভৃতিব দ্বারাও সে কাজ সর্বসাধারণের মধ্যে হতে থাকত, আর গতকাল পর্যন্তও এখানে সেগুলি টিঁকে ছিল! তার থেকেই জনপ্রিয় ভাষাতে কত শিল্পরসিক ও খ্যাতনামা কবির সৃষ্টি হয়েছিল; এই প্রাচীন সংস্কৃতির ও মজ্জাগত সৌন্দর্যবোধের ধারা ভারতে বরাবর রক্ষিত হয়ে এসেছে নানা ধবনেব সুপটু কলাকৌশলীদের দ্বারা, কেবল আধুনিক সভ্যতার স্থূল বাস্তবতা ও সূক্ষ্মবোধহীনতার প্রভাবে তা আপাতত অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে বা বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে।"

ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি

"রামায়ণ ও মহাভারতে, প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে ও অমর কাব্যগ্রন্থগুলিতে, অসংখ্য শিল্পে ও ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে তখনকার ভারতের যে বিরাট বুদ্ধিমত্তার ও আধ্যাত্মিকতার ও অসাধারণ নৈতিক তেজের জীবন্ত ও অম্লান নিদর্শন আজও পর্যন্ত পাওয়া যায় তার গুপ্তরহস্য কী ছিল? তখনকার

বাস্তুকার ও যন্ত্রবিদ্‌গণের যে অতুলনীয় নির্মাণকার্যের নমুনা, তাদের চমকপ্রদ শিল্পকলা, বিজ্ঞানের ক্রিয়ার এক এক অদ্ভুত বিজয়গৌরব, তাদের পাণ্ডিত্য, স্মৃতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, অধ্যাত্মশাস্ত্র, অপূর্ব সমাজ গঠনের রীতি, এত কিছু ব্যাপারের মূল ভিত্তিতে কী ছিল? ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের, শিখ ও রাজপুতগণের যে অতুলনীয় বীরত্ব ও আত্মদান, তাদের যে অজেয় জাতিগত প্রাণতেজ ও সহগুণ, তারও ভিতরকার অবলম্বন কী ছিল? তাদের অদ্বিতীয় রকমের সভ্যতার ধারা যা বাহ্য ছাঁচেও যেমন বিরাট আর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেও তেমনি নিখুঁত, এর পশ্চাতে কী হেতু ছিল? গোড়া থেকে অন্তর ও মনের সমুচিত শিক্ষা ও অনবদ্য নিয়মরীতির নিষ্ঠা ব্যতীত সর্ববিষয়ে এতটা শ্রেষ্ঠত্ব বরাবর বজায় রাখা অসম্ভব। এরূপ আর্য সাফল্যের গুপ্ত রহস্যের সূত্র যদি তখনকার আশ্রমাদি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যে ইতিহাস আমরা পেয়েছি তার মাঝেই খুঁজতে যাই তাহলে ভুল হবে। আমাদের দেখতে হবে যে ঐ সকলের একেবারে আদি সূত্র ও আদি ভিত্তিতে কোন জিনিস ছিল।·

প্রাচীন আর্য সভ্যতার সর্বাধিক বড়ো শিক্ষা ও অনুশাসন ছিল 'ব্রহ্মচর্য'। ……এই একমাত্র ব্রহ্মচর্য শিক্ষার দ্বারা তারা সত্তার সকল শক্তিকে ও দেহের সকল ক্রিয়াকে মস্তিষ্কের অনুগামী হতে বাধ্য করেছিল। এতে কেবল যে মেধা বৃদ্ধি হয়েছে, ধীশক্তি বেড়েছে, স্মৃতিশক্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির সৃষ্টিনৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে, এবং তিন দিক থেকে স্মৃতির ও উদ্ভাবনাশক্তির ও বিচার বিশ্লেষণ শক্তির বিকাশ হয়েছে তাই নয়, কিন্তু মনের দিকের তীব্রতা, ধারণশক্তি ও প্রযোজনা শক্তির ক্রিয়াকেও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই কারণেই তাদের স্মৃতির ক্রিয়া ছিল এত প্রখর, তাদের বহুবিচিত্র সৃজন নৈপুণ্য ছিল এত পরমাশ্চর্য। ভারতের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠজন তাদের প্রতিভা ছিল বহুমুখী, তারা একরূপ কাজেও যতখানি সফল হতো অন্যরূপ কাজেও ঠিক ততখানিই সফল হতো, কাজের পরিবর্তনে তাদের সৃজনপ্রতিভা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতো না। তারা অতি সহজে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে একরূপ কীর্তির পরে অন্যরূপ কীর্তিরও প্রতিষ্ঠা করত।

এমন সহজভাবে অটুট উদ্যমের সঙ্গে তাদের পক্ষে এটা সম্ভব হতো কেবল ব্রহ্মচর্যের শিক্ষার গুণে। তারই দ্বারা তাদের আভ্যন্তরীণ সত্ত্বগুণ উন্নত ও ও উদ্দীপিত হয়ে উঠত।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে তিনরকম গুণ থাকে, সত্ত্ব, রজস্‌ ও তমস। এরই

সহস্ররূপ বৈচিত্র্যের দ্বারা মানুষের সকল কাজ অভিব্যক্ত হয় জ্ঞানে অথবা ক্রিয়ানুরাগে অথবা অজ্ঞানতায়। তার মধ্যে তমস্ হলো ধাতুগত অসাড়তা বা নিষ্ক্রিয়তা, যা জ্ঞানের আলোকে চাপা দিয়ে অজ্ঞানতাকে প্রকট করে, মানসিক জড়ত্ব এনে দেয়, কর্মশৈথিল্য ও বিস্মৃতি ও শিক্ষাগ্রহণে অনিচ্ছা আনে, কোনো জিনিসকে ভালো ক'রে বুঝতে ও চিনতে দেয়না। রজস্ গুণের তৎপরতা হয় অসংযত, রাগানুরাগ ও ভ্রান্তি ও আসক্তি ও পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি ওতে প্রকট হওয়াতে তা জ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন ক'রে দেয়। আর সত্ত্বগুণ হলো দীপ্তিদায়ক, যাতে প্রচ্ছন্ন জ্ঞানকে এমনভাবে বাহিরে উন্মীলিত করে যাতে তাকে বুদ্ধির পর্যবেক্ষণের মধ্যে আনা যায় ও স্মরণ ক'রে রাখা যায়। প্রকৃতির এই তিনটি গুণের স্বরূপ বুঝে তারা তমস্‌কে বর্জন ক'রে ও রজস্‌কে সংযত ক'রে সত্ত্বগুণকে জাগিয়ে তোলার শিক্ষাই দান করত। গুরু এমন ভাবে শিষ্যকে শিক্ষাদান করতেন যাতে তারা ভিতর থেকে ঐ দীপ্তিকে গ্রহণ করতে পারে। রজস্‌কে দমন করা হতো কঠোর নৈতিক নিয়মের দ্বারা, যাতে মন আত্মেচ্ছামুক্ত ও গর্বানুরাগ বর্জিত হতে পারে—এই ছিল চিরপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারিণ্ হওয়ার শিক্ষাপ্রণালী, আর এই ছিল আর্য সংস্কৃতির ও নীতির মূল ভিত্তি, ঐ সময়ের মধ্যে ভ্রান্ত বুদ্ধি উপস্থিত হলে তা গুরুর কাছে পুরোপুরি স্বীকার করতে হতো, এবং গুরু তাকে সুবুদ্ধির কথা পুনঃপুন আবৃত্তি করাতেন। তমস্ দূর করা হতো নৈতিক বিশুদ্ধির দ্বারা, যার ফলে তেজস্ হতো আবির্ভূত, আর তপস্যার শিক্ষার দ্বারা মানসিক শক্তি ও স্বচ্ছতা জমে উঠত। দীপ্তি জাগাবার তিনরকম উপায় ছিল,—আবৃত্তি, ধ্যান, ও আলোচনা। আবৃত্তির দ্বারা শব্দগুলি মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যেতো, যাতে তার অর্থ ভিতর থেকে ক্রমশ আপনা হতেই প্রকাশ পায়, অবশ্য সে আবৃত্তি তোতাপাখির মতো যান্ত্রিকভাবে নয়। তার সঙ্গে থাকবে মনের স্থির গ্রহিষ্ণুতা ও প্রতীক্ষায় নিমগ্ন থাকা, যাকে বলা হতো ধ্যান। ব্রহ্মচর্য ও সত্ত্বগুণই ভারতের মস্তিষ্ককে এত উন্নত করেছিল। এবং তার আরো পরিণতি হয়েছে যোগের দ্বারা।"

ভারতের সাম্প্রতিক অতীত

"পরবর্তীকালের ভারতীয় সমাজের মতো খুব কম সমাজই বিপত্তির ফলে এতটা তামসিক ও জড়তাপূর্ণ হয়েছে, এবং উত্তরোত্তর সংকীর্ণতর অবস্থা

পেয়েও এমন নিশ্চিন্ত হয়ে সেই জড়তাকেই পরমাদরে লালন করেছে। সেই কারণে এরা শুধু শাস্ত্রবচনকে যেমন শিরোধার্য ক'রে রয়েছে এমন আর কেউ নয়। এখন শাস্ত্র ও প্রচলিত সংস্কার রীতির দ্বারা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্রকর্মও অত্যন্ত বাঁধাবাঁধিভাবে নিয়ন্ত্রিত, শাস্ত্রবাক্য এবং তার ভাষ্যগুলির দ্বারা আমাদের চিন্তাগুলিও প্রতি পদে নিয়ন্ত্রিত,—বিশেষত এখন প্রকৃত শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষা তার ভাষ্যগুলিরই অধিক প্রাধান্য।

কেবল একটিমাত্র ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রাচীন মুক্তির পথ ও মৌলিকতা এখনও বজায় রেখেছি, যার থেকে আমাদের মহত্বগুলি পুনরায় অংকুরিত হতে পারে, তা হলো ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অনুভূতি। এরই নতুন নতুন উন্মীলন ক্রিয়াতে এবং এর অফুরন্ত উৎস হতে বারেবারেই নব নব প্রেরণা ও পুর্ণযৌবন প্রকাশের শক্তি উদ্ভূত হয়েছে। নতুবা অনেক কাল আগেই এ জাতিও সিজারের আমলের গ্রীস ও রোম ও দিগ্বিজয়ী ইসারহেডনের আমলের অ্যাসিরিয়া এবং খোসরোজের আমলের ইরানের মতো প্রাচীন মৃত জাতিগুলির সঙ্গে ভূগর্ভে বিলীন হয়ে যেতো। প্রায়ই এ কথা শোনা যায় যে আমাদের হিন্দুত্বের রীতিনীতির গুণেই আমাদের জাতীয় প্রাণ সম্পদ এখনও এতখানি সতেজ রয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় ওর ভিতরকার মূলসূত্রটি তার কারণ। জাতীয় জীবনে যে বারেবারে পরমাশ্চর্যরূপে লোকায়ত পুনরভ্যুত্থান ঘটেছে, তার জন্য প্রধানত দায়ী হলেন শংকর, রামানুজ, নানক ও কবীর, গুরুগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, রামদাস ও তুকারাম,—কিন্তু রঘুনন্দনও নয় বা নদীয়া ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরাও নয়।

কিন্তু ঐ সব ইষ্টার্থকামী শাস্ত্রবন্ধনের পাকে পড়ে, যে ভারতীয় বুদ্ধি সৌকর্য একদিন জগতের মধ্যে ছিল বিরাট ও মৌলিক, তা এখন উত্তরোত্তর ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। তাই এখন পরবর্তীকালের সর্বোৎকৃষ্ট কাজগুলিও হয়ে আসছে ব্যর্থ, সংকুচিত, নির্বীর্য···হজম করতে, প্রত্যাখ্যান করতে, সঞ্চয়ন করতে আমরা চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো কিছুতেই কৃতকার্য হতে পারিনি। · সারা জীবন ধরেই আমরা কত কিছু কাজ ক'রে যাই কিন্তু কেন করছি তা জানিনা, কত কিছু বিশ্বাস করি কিন্তু কেন বিশ্বাস করি তা জানিনা, জোরের সঙ্গে নিজেদের মতকে সমর্থন করি কিন্তু কোন অধিকারে করি তা জানিনা—হয়তো কোনো বইতে পড়েছি কিংবা কোনো ব্রাহ্মণের মুখে শুনেছি, হয়তো শংকর বলেছেন তাই বলছি, কিংবা হয়তো

আমাদের শাস্ত্রবাক্যকে কেউ তার নিজের মতে ব্যাখ্যা করেছে তাকেই নিয়ে পুনরুক্তি করছি। নিজের বলা কোনোটাই নয়, নিজের বুদ্ধির কথা কিছুই নয়, সবই ধার ক'রে পাওয়া।

"নতুন জ্ঞানধারার যেটকু আমরা বুঝেছি তা ইউরোপীয়দের কাছে শুনে, তারা আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ও আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে যেমন বুঝিয়েছে তাই বুঝেছি। ইংরেজদের থেকে যতটা উৎকর্ষ আমরা পেয়েছি—যদি তাকে উৎকর্ষই বলা যায়—তাতে আমাদের অধীনতার কুফল ঘোচানোর পরিবর্তে আরো দশগুণ বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে।......তার ফলে আমরা ইউরোপীয় প্রভাবেরই দাস হয়ে আছি, কখনো কখনো তা অতিমাত্রায় প্রকট হয়েছে, তার দ্বারা অন্য সকল প্রভাবকেই আমরা প্রতিরোধ করেছি, আর এই দাসত্বের দুরবস্থার পরিস্থিতির মধ্যে থেকে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্তও হচ্ছি না কিংবা বেঁচেও উঠতে পারছি না।

কিন্তু চাতুর্য ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির ভাব অবশ্যই আমাদের বজায় আছে ; বাহ্য চাকচিক্য দেখলে আমরা তার বেশ নকল করতে পারি ; কোনো একটা বিষয়ের খুঁটিনাটি প্রশ্ন নিয়ে বেশ প্রশংসনীয়ভাবে বিচার করার খেলা খেলতে পারি ; কিন্তু যে ভাবনা কাজের হবে এমন কিছু ভাবতে পারি না। কোনো কিছুর মর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি না। অথচ জীবনকে বুঝে সব কিছুর আসল মর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পারাই দরকার, তাতেই আমরা জাতি হিসাবে বাঁচতে পারি।"

ভবিষ্যতের কথা

"কেমন ক'রে আমরা আমাদের লুপ্ত বুদ্ধির মুক্তি ও নমনীয়তা ফিরে পাবো? যে রাস্তা ধরে আমরা তা হারিয়েছি সেই রাস্তা ধরেই আবার উল্টোদিকে উজানে যেতে হবে, অন্তত কিছুকালের জন্য। অর্থাৎ সকল বিষয়েই মনকে পুঁথিগত বা শাস্ত্রগত প্রাধিকারের গোলামী থেকে শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে নিতে হবে। সমাজ সংস্কারক অথবা ইঙ্গভাবাপন্ন কর্তাদের দল অবশ্য এটা চায়না। তারা বরং চায় যে চিরাচরিত সব কিছু অভ্যাস বর্জন ক'রে এবং যত কিছু অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে আমাদের মনের মধ্যে এখনকার সভ্য জগতের নতুন মুক্ত আলোক প্রবেশ করুক। কিন্তু তাদের

সেই উপদেশের অর্থ এই যে আমরা সায়নকে না মেনে ম্যাক্সমুলারকে মানি, শংকরের অদ্বৈতবাদ না মেনে হেকেলের অদ্বৈতবাদ মানি, লিখিত শাস্ত্রকে না মেনে অলিখিত ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রকে মানি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের গোঁড়ামিগুলোকে না মেনে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের ও বাস্তববাদী ইউরোপীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামিগুলোকেই গ্রহণ করি। গোলামী করার এমনতরো অদল বদলে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কারো মনই কখনো রাজী হতে পারেনা। পূর্বমান্য শৃঙ্খলগুলো যদি ভাঙতেই হয় তবে তা যথার্থ মুক্তির জন্যই হোক, সত্যের নাম নিয়েই হোক, ইউরোপের নাম নিয়ে নয়। আমাদের প্রাচীন দীপ্তিসূচক ভারতীয় প্রথাগুলো আমাদের কাছে এখন যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হোক, তার বদলে যদি অনুরূপ স্থূল যুক্তিগ্রাহ্য ইউরোপীয় জ্ঞানালোকের আকিঞ্চন করি, কিংবা যদি প্রচলিত হিন্দু অন্ধসংস্কারের বদলে বস্তুসর্বস্ব বিজ্ঞানের আধুনিকতর অন্ধসংস্কারগুলোকে অনুসরণ করতে থাকি, তাতে আমাদের ঠকাই হবে।

ভারতকে যদি আবার বেঁচে উঠে জগতে তার উদ্দিষ্ট কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করতে হয়, তাহলে সবচেয়ে প্রথম দরকার হলো ভারতীয় তরুণ যুববদের ভেবে দেখতে শেখা,—সকল বিষয়েই তাদের স্বাধীন ও সার্থক ভাবে চিন্তা করতে হবে, উপরভাসা ভাবে কিছু না দেখে গভীরে প্রবেশ করতে হবে, পূর্বধারণাকে দূর ক'রে অন্ধযুক্তি ও গোঁড়ামিকে তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতের দ্বারা খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলতে হবে, সকল রকমের ঘোরালো মনোভাবকে ভীমের গদার ঘায়ে চূর্ণ ক'রে ফেলতে হবে। ইউরোপীয় শিশুদের যেমন অতিরিক্ত কাপড়-চোপড় ঢাকা দিয়ে আপাদমস্তক জড়িয়ে রাখে, আমরা যেন আমাদের মস্তিষ্ককে সেই ভাবে জড়িয়ে না রাখি; দেবতাদেরই মতো যেন তা অবাধ শৃঙ্খলমুক্ত চিন্তার গতি ফিরে পায়। ভারতের বুদ্ধিমত্তার সহজাত সূক্ষ্মতার সঙ্গে উদার ব্যাপকতাও যেন তার থাকে এবং আপন শক্তি লাভে অভ্যস্ত হয়ে আপন মূল্যবোধের দ্বারা সহজেই নিজেকে পুনরুদ্ধার করতে শেখে।

অতীতের শিকল যদি পুরোপুরি ভাবে ছিঁড়তে না পারো, তাহলে কৃষ্ণকে গাড়ির চাকাতে বেঁধে রাখা সত্ত্বেও তিনি যেমন গাড়ি সমেত টেনে নিয়ে গিয়ে দুপাশের গাছ দুটোকে পর্যন্ত উপড়ে ফেলে সোজা পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন, তোমাদেরও তেমনি দুপাশের দুই বাধাকে উপড়ে সরিয়ে দিয়ে আত্মপরিণতি লাভ করতে হবে, সেই দুটি হলো মধ্যযুগের অন্ধসংস্কার, ও

বর্তমান যুগের একগুঁয়ে গোঁড়ামি। আগেকার কালের যা কিছু ভিত্তি গাঁথা ছিল তা এখন ভেঙে পড়েছে, এখন আমরা পরিবর্তনের মহাবন্যার জলে ভাসছি। এই প্লাবনের মধ্যে যদি আমরা অতীতের বরফের চাঙড়ের আশ্রয়কে এখনও আঁকড়ে থাকি, তাহলে শীঘ্রই সে বরফ যখন গলে যাবে তখন তা স্রোতের প্রবাহে নিরাশ্রয়দের জলের তলায় তলিয়ে নিয়ে যাবে। আর অনড় ভাবে জমানো পাঁকের মধ্যে পা রাখবার জায়গা খুঁজেও কোনো লাভ নেই, তা খোলা সমুদ্র জলও নয় আর শুক্‌নো ডাঙাও নয়, তা হলো হাতফেরতা বিলাতিয়ানা। ওর মধ্যে ডুবলে আমাদের দারুণ দুর্দশায় পড়ে মরতে হবে। তা নয়, আমাদের ভালো সাঁতার শিখে অপরিবর্তনীয় সত্যের নৌকার আশ্রয় ধরে নিতে হবে, তবেই আমরা শাশ্বত কালের কঠিন পাথরের ডাঙার উপর গিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারব।

আর এ কাজও আমরা যেন না করি,—দুই দিকের ভিতর থেকে যথেচ্ছ ভাবে এটা ওটা বেছে নিয়ে তার একটা খিচুড়ি ঘণ্ট পাকিয়ে আড়ম্বরের সঙ্গে যেন বলে না বেড়াই যে এই দেখ আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অপূর্ব সমন্বয় করেছি। যে দিক থেকেই আসুক, কোনো জিনিসটাকেই যেন আমরা ভাল ক'রে না বুঝে, কোনো প্রশ্ন পর্যন্ত না ক'রে নির্বিবাদে বিশ্বাস ক'রে মেনে না নিই। তাতে যে আমরা খাঁটী ভারতীয় থাকবনা কিংবা আমাদের হিন্দুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে, এমন ভয় করার কোনো কারণ নেই। ভারত চিরদিন ভারতই আর হিন্দুত্বও হিন্দুত্বই থাকবে, কেবল যদি আমরা নিজেদের তরফ থেকে ঠিক মতো ভাবতে শিখি। কিন্তু যদি আমরা ইউরোপকে আমাদের জন্য ভাবতে সুযোগ দিতে থাকি, তাতেই ভারতের বিপদ হবে, ভারত হয়ে দাঁড়াবে ইউরোপের হীন একটা নকল স্বরূপ।

আমাদের ভারতীয় চিন্তাধারা, ভারতীয় চরিত্র, ভারতীয় অনুভবাদি, ভারতীয় তেজ, ভারতীয় মহত্ত্ব, এইগুলির পুনরুদ্ধার করে জগতের বর্তমান সকল প্রকার দুরূহ সমস্যাকে সেই দৃষ্টিতে দেখে তার ঐরূপ ভারতীয় ভাবে সমাধান করা, আমাদের মতে এই হলো আমাদের জাতীয়তাবাদের প্রকৃত করণীয় কাজ।...তার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে আমাদের প্রাচীন ধর্মবাদের, দর্শনবাদের, শিল্প ও সাহিত্যসাধনার মূল উৎসে, এবং আমাদের অবিস্মরণীয় আর্য আদর্শ ও সেই আদর্শানুযায়ী মনোভাবের প্রভাব এনে ফেলতে হবে এখানকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টাতে।

বস্তুপ্রধান ও অপরিণত ইউরোপীয় ব্যবসাদারী শিক্ষার ফলে আমাদের মন ও চরিত্র ও রুচির যে অনেক অধঃপতন হয়েছে, একথা নবীন জাতীয়তাবাদীরা বরাবর বলে এসেছে। আমাদের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও হাতের সূক্ষ্ম কারিগরি কাজ ও চোখের সূক্ষ্মদৃষ্টির ক্রিয়াই ছিল আমাদের দেশের শিল্পসৃষ্টির বিশেষ গুণ, এবং তারই জোরে ইউরোপের বাজারে সর্বত্র ভারতীয় দ্রব্যজাতের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়ে আসত। সে সব কিছুই এখন নেই, কার্যতঃ সবই নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে এখনকার দিনের স্কুল ও ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে সেই আগেকার আধ্যাত্মিকতার ও মেধাবৃদ্ধির চর্চাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই আমাদের জাতি তার মৌলিকতা ও তার উচ্চ আস্পৃহা ও জীবন্ত তেজটুকু হারিয়েছে, অথচ কেবল সেই জিনিসই জাতিকে মুক্ত ও মহৎ করতে পারে। শিক্ষা পদ্ধতিকে আবার পাণ্টা রাস্তায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে যা আমরা হারিয়েছি তাকে আবার উদ্ধার করা, এই কাজেই আমাদের সর্বপ্রথমে নিজেদেরকে সর্বাংশে নিযুক্ত করতে হবে। যে মৌলিকতা ও আস্পৃহা ও তেজকে আমরা হারিয়েছি, সেগুলি নিতান্তই আমাদের প্রাণের পক্ষে প্রয়োজন। সুতরাং সব চেয়ে আগে সেইগুলিকেই আবার ফিরে পাওয়া বিশেষ আবশ্যক।

দেশের লোকের মন ও চরিত্র ও রুচিকে উন্নত করা, আগেকার সৌম্য ও সুদৃঢ় আর্য চরিত্র ও উচ্চ আর্য দৃষ্টিভঙ্গীকে ফিরিয়ে আনা, যে মনোভাব থাকাতে পার্থিব জীবনকে মনে হতো বিস্ময়কর ও মধুময় তাকে আবার অনুশীলন করা, যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও আস্পৃহার ফলে আমরা ছিলাম জাতিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীরতর হৃদয়বান, গভীরতর চিন্তাশীল ও প্রজ্ঞাশীল, তাকেই আবার জাগিয়ে তোলা, প্রয়োজনের গুরুত্ব হিসাবে তাই হবে আমাদের পরবর্তী কর্তব্য।…

আমাদের সামাজিক গঠনের সব কিছু ঠাটকে ও বিধান ব্যবস্থাকে যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতে হবে। কারণ তার একটা স্থায়ী মূল্য আছে। তা হলো আমাদের ধাতুগত জিনিস এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির সহায়ক। কিন্তু গত কয়েক শতাব্দী ধরে অস্থায়ীভাবে তা যেমন উদ্ধত ও আপোষমূলক আকার নিয়েছে তাকেই যেন আমরা ধরে না থাকি। তার ফল ব্যর্থ ও বিপজ্জনক হতে পারে। মূল ছাঁচটি গেছে ভেঙে; আবার বড়ো ক'রে সমৃদ্ধ ক'রে সেই ছাঁচকে গড়ে তুলতে হবে।…

তবে আমাদের ইউরোপীয় গণতন্ত্রবাদ ও তার ক্রিয়াপ্রণালী শিখে নিতে হবে। যাতে তার থেকে এর পরে আমরা আমাদের অতীতের সঙ্গে মানব জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সঙ্গে মিলিয়ে একটা নতুন কিছু গড়ে তুলতে পারি। গণতন্ত্রকে বজায় রেখে তার থেকে ব্যক্তিপ্রাধান্যকে ও বস্তুতন্ত্রবাদকে ছেঁটে বাদ দিতে হবে। মানবজাতির যে ভ্রাতৃত্ব ও সমত্ব ও স্বাধীনতার দিকে সহজাত প্রবণতা রয়েছে তাকে বজায় রেখে সঙ্গতি ও আধ্যাত্মিক মিলনের দিক দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

শিল্প ও বাণিজ্যের ক্রমোন্নতিকে থামিয়ে রেখে, যতদিন পর্যন্ত একটা নতুন ব্যবস্থা গড়ে না ওঠে কিংবা আমাদের সৌন্দর্যসৃষ্টি ও শিল্পকলা জগতে স্বীকৃতি না পায় ততদিন পর্যন্ত চুপ করে আমরা বসে থাকতে পারি না। যেমন রাজনীতিতে তেমনি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় পদ্ধতিগুলোকে রপ্ত ক'রে নিয়ে শেষে তাদের উপরেও উঠে যেতে হবে।···শিল্পকলাতে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হবার জন্য কোনো জাতির পক্ষে যথেষ্ট অর্থসমৃদ্ধ হবার প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু যথেষ্ট স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকা চাই। তাদের মধ্যে জাতীয় উৎকর্ষ এবং আশা-ভরসা ও উৎসাহ থাকা চাই। তবেই তারা ব্যাপকভাবে নিজেদের গুণগুলিকে ও ধারণাশক্তিকে প্রয়োগ ক'রে নিজেদের জাতীয় শিল্পরচনার পরাকাষ্ঠা ঘটাতে পারবে। এখনকার সামাজিক কাঠামোর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যে সব সস্তাদরের নীচু ধরনের জিনিস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে তার আওতাতে সূক্ষ্ম ও সুন্দর কারুকার্যের কোনো কলাশিল্প টিঁকতে পারেনা। যদি জনগণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে সমবায়ের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে উঠে মানুষের দারিদ্র্য ও জীবনসংগ্রাম হ্রাস পায়, তবেই তাদের শিল্পসৃষ্টি আবার সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। জগতের সর্ব মানুষের তেমনি উন্নয়ন ও পুনর্বিন্যাস ঘটানোই ভারতের উদ্দিষ্ট কর্মপ্রেরণার একটা অংশ। সেই কারণেই রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতিকে যোগ দিয়ে সেই দিকে আমাদের মনোনিবেশ করতে হয়েছে।

আমাদের দেশের মুক্তি আনতে এর কোনোটিকেই বর্জন করা চলবেনা, উপরন্তু তার সঙ্গে নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশীলনও যোগ করতে হবে। তারই ভিত্তিতে আমাদের সূক্ষ্ম শিল্প ও সংস্কৃতির পুনর্বিকাশ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হবে। অনেকে মনে করে যে আমাদের কেবল ধার্মিক ও নৈতিক পুনরভ্যুত্থানের দিকটা নিয়েই লেগে থাকা উচিত; দেশের কোনো কোনো উপযুক্ত নেতা

এবং উপদেষ্টা যে কেবল স্থূল রকমের রাজনীতি ও বাণিজ্য ব্যাপারের মধ্যে মাথা গলাচ্ছে এটা খুব পরিতাপের কথা। কিন্তু সেটা খুবই ভুল কাজ। দেশের নেতা যারা হবে তাদের প্রচেষ্টা হওয়া চাই সার্বভৌমিক ও সর্বতোমুখী।

অবতার যখন আসবেন, তখন তিনি কেবল ধর্মেরই পথপ্রদর্শক হবেননা, কিন্তু তিনি রাজনৈতিক নেতাও হবেন, শিক্ষাবিধির মহা প্রবর্তকও হবেন, সমাজ সংস্কারকও হবেন, সমবায় শিল্পের অধিনায়কও হবেন, আবার প্রাণের মধ্যে কবিত্বপূর্ণ বোদ্ধাও হবেন এবং শিল্পরসিকও হবেন। অর্থাৎ যে ভবিষ্যৎ ভারতীয় জাতি নতুন মূর্তিতে জেগে উঠে ভবিষ্যৎ জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করবে, তিনি হবেন তারই ঘনীভূত চুম্বকস্বরূপ এক বিশিষ্ট প্রতিমূর্তি।

বহু বহু যুগ আগেকার ভারত এখনও মৃত নয় এবং তার সৃষ্টিকার্যের শেষ কথা এখনও বলা হয়নি; সে এখনও জীবিত, তার নিজের জন্য ও জগতের সকল মানুষদের জন্য এখনও কিছু তার করবার আছে।

এবং এখানে যারা নতুন করে জেগে উঠবে তারা ইঙ্গভাবাপন্ন এক প্রাচ্য জাতি নয়, পাশ্চাত্যের এমন অনুগত ভক্ত নয় যারা তাদেরই অনুকরণে তাদেরই সাফল্যের ও বিফলতার পুনরাবৃত্তি ক'রে যেতে থাকবে, কিন্তু এদের সেই প্রাচীন অবিস্মরণীয় শক্তিকে ও এদের গভীরতর সত্তাকে এমনভাবে জাগিয়ে তুলবে যাতে আবার তারা পরমতম আলোর উৎসের দিকে মাথা তুলে তাদের সনাতন ধর্মের পূর্ণতর মর্মের পুনরাবিষ্কার করতে পারে।

ভবিষ্যতের ভার তরুণদের উপর। নতুন এক জগৎ তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে, আর তরুণেরাই তা তৈরি করবে। কিন্তু সে জগৎ হবে সত্যের, সৎসাহস ও নির্ভীকতার, ন্যায়ের, আস্পৃহার এবং সহজ সার্থকতার, এই আমরা চাই। যারা ভীরু, স্বার্থান্বেষী, যারা প্রথমে এগিয়ে এসে বড়ো বড়ো কথা বলে এবং অবশেষে সঙ্গীদের ফেলে পিছিয়ে পালায়, তাদের জন্য ভবিষ্যতে কোন স্থান নেই।...অকপট, শৌর্যবান, মুক্ত হৃদয়, অদম্য সাহস ও আস্পৃহাযুক্ত তরুণ যুবকেরাই হলো একমাত্র সুভিত্তি, যার উপর ভবিষ্যৎ জাতি গড়ে উঠতে পারে।...ভগবান তাঁর কাজের জন্য দোমনা পিছুটান লোকদের চাননা, আর এমন অব্যবস্থিত মনের কাউকেও চাননা যারা প্রথম ঝোঁকের উত্তেজিত ক্রিয়াকে পরে ঠিকভাবে বজায় রাখতে পারেনা।

দ্বিতীয় কথা, এদের পক্ষে কেবল নিজের কাজ বেছে নিলেই হবেনা, কিন্তু যারা এদের কম্‌রেড বা সঙ্গী হবে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এই

দলগত ভাবটিকে আঁকড়ে থাকা চাই, আর এমন সম্মানবোধ থাকা চাই যে নিজেকে বাঁচাতে দলের কাউকে বিপদে না ফেলা হয়, সবাই মিলে একত্রিত থেকে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে, নতুবা পরবর্তী জীবনে তারা কোনো কাজের হবেনা। যে কাজই করুক তারা যেন সংঘবদ্ধ হয়ে তা করে, তাতে যদি কষ্ট পেতে হয় তাহলে দলের সকলেই তা সমান ভাবে মেনে নেবে, যারা ভীরু ও কাপুরুষ তাদের তারা বর্জন করবে, কিন্তু একবার যখন সকলে একজোট হয়েছে তখন সে জোট যেন আর কিছুতেই না ভাঙে।

এই ভাব নিয়ে তোমরা কাজ করো, দেশানুরাগের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তির কথা না শুনে আপন বিবেক ঠিক রেখে আপন কর্তব্য ক'রে যাও, কিন্তু উৎসাহ থাকা সত্বেও হাল্কা মনে কিছু কোরোনা। এমন যেন না হয় যে প্রথমটায় কিছু না ভেবে কাজে নেমে গেলে, তার পরে দুর্বলতা বেরিয়ে পড়ল, যে কাজের জন্য ডাক পড়ল তাতে সাহসের সঙ্গে যোগ দিতে পারলে না—এটা জাতির পক্ষে অতীব কলঙ্কের বিষয়।"

('কর্মযোগিন্' পত্রিকা)

ভারতের নিজ বার্তা

"পুরাকালের ভারত ছিল সারা জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এক চিন্তাসাধক শান্তির প্রতিষ্ঠানের মতো। এর ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে ভারতের বাইরেকার মানুষদের থেকে পৃথক হয়ে থেকে এবং জগতের কোলাহল হতে তফাতে থেকে এদেশ শান্তির আশ্রমের মতো হয়ে নিজেদের অস্তিত্বের সমস্যা ও তার গূঢ় রহস্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টা নিয়েই চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল। সেই গভীর চিন্তাধারা যথাসময়ে ফলবন্ত হয়ে ক্রমে সমস্ত এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ল, এবং তার থেকে সভ্যতার সৃষ্টি হলো। এই ভারতের জ্ঞানীরা তখন দিকে দিকে সকলের কাছে আলোর বর্তিকা বহন ক'রে নিয়ে গেল; এরই অসীম প্রজ্ঞার কিছু কিছু অংশ নিয়ে কত দর্শনতত্ত্বের সৃষ্টি হলো; এরই বুদ্ধিক্রিয়ার কিছু কিছু টুকরো টাকরা নিয়ে পরে কত বিজ্ঞানের আবির্ভাব হলো।

তার পরে আড়ালের অবরোধ যখন ভেঙে গেল, হিমালয়ের দুর্গম দরজাগুলি পার হয়ে যখন অন্যান্য দুর্ধর্ষ জাতিরা এর মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল, তখন ভারতের শান্তি ঘুচে গেল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাকে অনেক

সংগ্রাম পার হতে হলো, কিন্তু সেই তুমুল গণ্ডগোলের মধ্যেও তার চিন্তা-প্রসূত সভ্যতার ধারা আরো উন্নত ও দৃঢ়তর হয়ে জনগণের দেশমাতাকে তারই দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত ক'রে রাখলে। আগেকার যুগের যে সব প্রজ্ঞার ফল তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন ও কিছুকালের জন্য বিস্মৃত হয়েছিলেন, আবার সেগুলিকে তিনি ফিরে পেলেন। এবার নতুন আলোর দৃষ্টিতে তিনি সেগুলিকে দেখতে শুরু করলেন আর পুনরায় সেগুলিকে নিজের অঙ্গীভূত ক'রে নিলেন। এই ভাবেই বেঁচে থেকে তিনি গ্রীকদের আক্রমণ সহ্য করলেন, সিদিয়ানদের সহ্য করলেন, ইসলামীদের সহ্য করলেন, তারপর একে একে ক্রীশ্চান ধর্ম এলো, বৌদ্ধ ধর্ম এলো, ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও বাস্তববাদ এলো, এখানকার প্রাচীন বিজ্ঞান ও ধর্ম দর্শনের সঙ্গে জগতের নতুন চিন্তাধারা মিশে গিয়ে এক নতুন রকমের দৃষ্টিভঙ্গী এলো।...

তথাপি এই যে হিন্দু সংস্কৃতি, এ এমন ক্ষীণ ও ফাঁপা জিনিস নয় যে সহজেই নষ্ট হতে পারে; অন্তত পক্ষে পাঁচ হাজার বছর এ জিনিস এমনি ভাবে টিঁকে আছে, তার মধ্যে এতে এমন শক্তি যথেষ্টই সঞ্চিত হয়েছে যার ফলে এ জিনিস আরো বহুকাল যাবৎ টিঁকে থাকবে নিশ্চয়।

* * *

এ জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন এই যে কেমন মনোভাব নিয়ে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুত্থান আনতে চেষ্টা করব।

দুই রকম জিনিস হতে পারে। হয় এই ভারতের অতীত কালের সুপরিণত জীবন চিন্তাকুশলতার ও আস্থাপ্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে অগ্রণী এবং আধ্যাত্মিক সত্যের ও অনুভূতির পরিবাহক হয়ে জগতের জড়বিজ্ঞানের মীমাংসাকে আরো উচ্চতর বিজ্ঞানের দ্বারা সংশোধিত ক'রে আপন গুহ্যতর শক্তিতে জগৎ মানবের সভ্যতাকে সমূহরূপে প্রভাবান্বিত করবার জন্য যে ভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল, এবার ভারতের পুনরভ্যুত্থানে সেই বহুকালের উদ্দিষ্ট কর্মই তার সফল হবে। নতুবা সে দেখা দেবে ইউরোপের বিশ্বস্ত ছাত্র রূপে, পাশ্চাত্যের থেকে ধার করা ভাবধারা ও জীবনপ্রণালীর অনুগামী হয়ে ও ইংরেজি রাজনীতি ও সমাজনীতির নকলনবিশ হয়ে। প্রথমটির বেলাতে চাই এর আস্পৃহা, অটুট বিশ্বাস, এমন অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকার যাতে সারা জগতের প্রশংসা ও বিস্ময় উৎপন্ন করে; কিন্তু দ্বিতীয়টির বেলাতে এর আত্মার

অতটা মহত্ব সম্ভব হবেনা বা তার প্রয়োজনও হবেনা, এমন সামান্য ও তুচ্ছ ধরনের পরিণাম আপনা হতে ধীরে ধীরে একটু সতর্কতার সঙ্গে ক্রমশ সহজেই এসে যাবে, তার জন্য কোনো রূপ ত্যাগ স্বীকার করতে হবেনা। প্রথমটির বেলাতে ভারতের নিয়তি হবে এমন এক মহাজাতিতে পরিণত হওয়া যে সারা জগতের সভ্যতাকে নবসংস্কারের ছাঁচে ঢেলে তার নেতাস্বরূপ হতে পারে, আর দ্বিতীয়টির বেলাতে সে হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা নিম্নতর অংশ মাত্র, যে তারই সামাজিক জীবনের ও রাজনৈতিক সুযোগ লাভের সুবিধাগুলি ভোগ করিবে, এক বিদেশী কেল্‌টিক জাতির বুদ্ধিগত আদর্শাদি মেনে চলবে। এই দুই রাস্তা রয়েছে আমাদের সম্মুখে। তার মধ্যে কোন আদর্শকে আমরা গ্রহণ করব,—আর আদর্শ মানে কেবল মুখের কথা না, সেই অনুযায়ী হবে আমাদের কার্যনীতি।...

খুব একটা বৃহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তার পর অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্য ও অসাধ্য আত্মত্যাগের অজুহাতে পিছিয়ে থাকা ঠিক সতর্ক বুদ্ধির লক্ষণ নয়, এ হলো অযোগ্যতার লক্ষণ। যদি সতর্ক ও হিসেবী হতে চাও তবে গোড়া থেকেই তাই হও। উদ্দেশ্যকে নীচু রেখে সেই দিকেই গুটি মেরে এগোতে থাকো। নতুবা লক্ষ্য থাকবে আকাশের দিকে, আর এদিকে মাটিতে পড়ে হামাগুড়ি দিতে থাকবে, আর মাঝে মাঝে আকাশের আদর্শের দিকে চোখ তুলে মনে করবে যে আমি ক্রমশ এগোচ্ছি, আর পিছনে যারা আছে তাদের ডেকে বলবে, 'হাঁ গো হাঁ, আসল আদর্শটা রয়েছে আমাদের আকাশেরই দিকে, কিন্তু যতক্ষণ মাটির উপর পড়ে আছি ততক্ষণ এখানেই তো কাজ করা চাই, অতএব এসো এখন গুটি মেরেই চলতে থাকি।'...তা নয়, হয় তোমার আদর্শকে মাটির স্তরে এনে নামাও, নতুবা ডানা গজিয়ে বা পুষ্পক রথে চড়ে আকাশে গিয়ে ওঠো। এর মাঝামাঝি রাস্তা কিছু নেই।...

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে এ জাতি বিশেষ কোনো এক উদ্দেশ্যে নিয়তিরই প্রেরণাতে অতীত যুগে আধ্যাত্মিক মার্গে অতখানি উন্নতিতে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিল, তার সেই উদ্দেশ্যই এখন আবার সফল হতে চলেছে।

যে অদ্ভুত রকমের নিভৃত পরিবেশের মধ্যে থেকে এ দেশ ব্যক্তিগত জ্ঞান ও প্রকৃতি ও ভাবধারাকে আয়ত্ত করেছে—যে ভাবে সারা জগতের সকল রকমের জলধারা প্রবাহিত হয়ে এসে ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনের

মহাসমুদ্রের স্থির জলে তলিয়ে গেছে। তাতে সমুদ্রের ব্যাপক স্থিরতা কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি—যাতে গীতার সার্বভৌমিক ছবিটা স্মরণ করিয়ে দেয়; আর যেভাবে এখানকার বিশেষ রকমের মৌলিক সমাজরীতি ধর্মরীতি ও দার্শনিক চিন্তাধারা এখনও পর্যন্ত রক্ষিত হয়ে থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টিঁকে আছে এবং তার কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি; আর যখন দেখা গেল যে বাইরের সমগ্র জগৎ এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেচে যে কঠোর বস্তুতান্ত্রিকতার চাপে মুমূর্ষু হয়ে উচ্চতর জ্ঞানের জন্য তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে, তখন এই ভারতের সেই প্রাচীন মহৎ আদর্শকে বরণ করলেই তার পূর্ণ আত্মপরিণতি সম্ভব হতে পারে; আরও যখন দেখা গেল যে ভারতের সব কিছু জিনিস বাতিল হয়ে গিয়ে ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে নিতান্ত অচল ও অপ্রয়োজন বোধে যখন তার মৃত্যু নিতান্ত আসন্ন হয়ে এসেছিল তখনই ভারত আবার নবীন তেজে হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল; আশ্চর্য উপায়ে নবজাগরণ হয়ে তার সব কিছু দুর্বলতা ঘুচে গিয়ে তা এক নবশক্তিতে পরিণত হলো; —এতগুলি যোগাযোগের ব্যাপারকে নিতান্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বলে আমাদের মনে হয় না, এগুলি অবশ্যম্ভাবী এবং সর্বনিয়ন্তা বিধাতা কর্তৃক এটাই পূর্বনির্দিষ্ট।…

ভারতের পুনর্জন্ম হবে এটা তেমনি অপরিহার্য, যেমন আকাশে আগামীকাল সূর্য উঠবে এটা অপরিহার্য, আর এই ত্রিশ কোটি মানবের বিরাট জাতি যখন তার বিশিষ্ট রকমের চরিত্রগুণ নিয়ে, অদ্বিতীয় রকমের ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শ নিয়ে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পূর্বসঞ্চিত তেজবৈভব নিয়ে নতুন জীবনে দেখা দেবে, তখন আধুনিক জগতের মধ্যে তা এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

ভারতের এই নবজন্ম হবে তার পক্ষেও মঙ্গলের এবং সমগ্র জগতের পক্ষেও মঙ্গলের; তার নিজের পক্ষে মঙ্গলের এইজন্য যে তার চিরদিনের স্বকীয় চরিত্র ও জাতিগত আদর্শ আবার সে ফিরে পাবে কিংবা নতুন ক'রে রচনা করবে; আর সারা জগতের পক্ষে মঙ্গলের এইজন্য যে সেখানে এক নতুন রকমের সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে যাতে সে এমন এক ধরনের নবশক্তির সন্ধান পাবে যার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছুই জানা ছিলনা, এবং এমন এক মানব প্রতিভা আবিষ্কার করবে যা আজ পর্যন্ত যে মনোভাব নিয়ে জগৎ পরিচালিত হয়ে এসেছে তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যদিও ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের জন্য এইরকমই অবস্থাপরিবর্তন জগতে তৈরিও হয়ে আসছিল…

কিন্তু এখনও এ জিনিস অঙ্কুরেই আবদ্ধ। কোন দিক নিয়ে যে দেখা দেবে তা এখনও কিছুই বলা যায়না…মোটের উপর আমরা এই দেখছি যে এক বিরাট মহাশক্তি নতুন জগতের নতুন পরিবেশের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখছে যে অসংখ্য রকমের সরু মোটা শিকল দিয়ে তার হাত পা রয়েছে বাঁধা, তার কতক বা অতীত দিনে নিজের হাতেই গড়া আর কতক বা সম্প্রতি বাহির থেকে আমদানি, এই সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বরূপে নিজেকে ঘোষণা ক'রে সারা জগতের উপর তার নিজের ছাপ লাগিয়ে দেবার জন্য সে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। চারিদিক থেকেই আমরা তাই শুনতে পাচ্ছি এই শৃঙ্খলভাঙার শব্দ, কোথাও বা ছিঁড়ছে কোথাও বা টুক্‌রো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু তার মুক্ত ক্রিয়া এখনও শুরু হতে পারেনি। এখনও তার চোখ ভালো ক'রে ফোটেনি, কুঁড়ির মুখ কেবল একটু খুলেছে মাত্র। শক্তিপ্রবলা এখনও জাগেনি।…

প্রথম প্রয়াসের আগে মাঝখানকার যে অনিশ্চয়তার ঘোলাটে ভাব এখন চলেছে, তাকে ভেদ ক'রে নতুন সৃষ্টি যে ঠিক কোনরূপ আকার নেবে তা আগের থেকে দেখতে চেষ্টা করা খুব কাজের হবেনা…একথা সব দিক দিয়েই সত্য, ধর্মের বা আধ্যাত্মিকতার চিন্তাধারার অথবা বিজ্ঞানের, কাব্য, শিল্প, সমাজনীতি বা রাজনীতি, সকল বিষয়েই তাই। এখন কেবল সূত্রপাতের সূত্রপাত মাত্র।…

কিন্তু এই পুনর্জন্ম, যা এখনও সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত হয়নি, তা যদি প্রকৃতই ভারতআত্মার পুনর্জন্ম হয় এবং নবশক্তিরূপে রূপগ্রহণ করে, তাহলে তার যা অন্তরতম পুরাতন সত্তা, তার যা প্রজ্ঞাপুরাণী, তা এমন সুদৃঢ় আকার নিয়ে অধ্যাত্মের পথে প্রকাশ পাবে যা ইতিপূর্বে কখনই হয়নি, এবং আমাদের জীবনের প্রতি দিক দিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই অধ্যাত্ম সূত্রই উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর ভাবে ক্রিয়া করতে থাকবে।

কিন্তু এখানে একটি ভুলবোঝার অথবা বুঝতে না চাওয়ার অথবা দুই-এরই সম্ভাবনা রয়েছে—তার খানিকটা যুক্তিসঙ্গত কারণ এই যে আমাদের আগেকার অত্যধিক ধর্মপ্রবণতা ও সন্ন্যাসাদি ও পরলোকতত্ত্বের আলোচনা নিয়েই যে ভারতীয় মন ও জীবন গড়ে উঠেছিল, সেই মনে সহজেই এরূপ কথাতে একটা সংকোচ ও অবিশ্বাসের ভাব আসতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে শিল্পে কাব্যে ও সমাজনীতিতেও আধ্যাত্মিকতা ঢোকানো,

এ কথার অর্থ কি,—আর আধ্যাত্মিকতার স্থর চড়িয়ে দিলেই যে শিল্প ও সাহিত্য কাব্য উচুদরের হয়ে উঠবে তারই বা অর্থ কি, আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তার দ্বারা কি লাভই বা হতে পারবে—যদিও এমন প্রশ্ন অজ্ঞানতারই ফল এবং ভারতীয়ের মুখে শোভা পায়না। এ হলো ইউরোপীয় মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি, এবং বহুকাল ধরেই আমরা এই মনে করতে অভ্যস্ত হয়েছি যে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা হলো এক দিকের জিনিস, আর বুদ্ধিগত ব্যবহারিক জীবন হলো অন্যদিকের জিনিস, দুটি একেবারে স্বতন্ত্র ব্যাপার আর দুই বিষয়ে বিভিন্ন রূপ সূত্র ধরেই তদনুরূপ ভাবে চলতে হবে। আরো এই সন্দেহ আসতে পারে যে আমরা বুঝি চাইছি—কর্মক্ষেত্র ছেড়ে ভারতকে দার্শনিকতা ধার্মিকতা ও অতীন্দ্রীয়বাদের দিকে টানতে এবং আধুনিক যুগের পার্থিব বিচারের রাস্তা ছেড়ে দিতে, তবেই আমরা একটা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ জাতি হয়ে আধুনিক জগতের অতিবাস্তব বিপরীত ধাক্কাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারব। স্থতরাং এক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার আদর্শ নিয়েই জাতির পুনর্জন্ম হবে; এ কথার প্রকৃত অর্থ কি তা আমাদের একটু বুঝিয়ে বলতে হবে।

প্রথমেই বলে রাখি, এ আদর্শের সেরূপ অর্থ আদৌ নয়। অবশ্যই এমন কথা আমরা বলতে চাইছিনা যে পার্থিব জীবনকে বৃথা বাহ্য আড়ম্বর জ্ঞান ক'রে সকলেই যত শীঘ্র সম্ভব সন্ন্যাসীর মতো বনে যাও, সামাজিক জীবনকে আশ্রমের আশ্রয়ে বা পর্বতগুহাতে চলে যাবার প্রস্তুতি হিসাবেই জানো, কিংবা এমন একটা স্থায়ী ধরনের জীবন তৈরি ক'রে নাও যার মধ্যে কোনো অগ্রগতি নেই, আছে কেবল একটা কিছু লক্ষ্য যার স্থূল পৃথিবীর সঙ্গে কিংবা মানবের পার্থিব উন্নতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। হয়তো কোনোকালে ভারতে এমনই একটা মনোভাব ঘটেছিল, কিন্তু তা কখনই স্থায়ী হয়নি। আর আধ্যাত্মিক মানে জাতির সত্তাকে কোনো এক বিশেষ ধর্মের অনুষ্ঠান বা অনুশাসনের ছাঁচে ঢালাই করা নয়, যা আগের কালে কোনো কোনো সমাজে ঘটেছিল এবং এখনও কোথাও কোথাও সেই পুরাণো অভ্যাস বজায় আছে। কিন্তু যে দেশে বহুপ্রকার ধর্ম্মমতের স্থান আছে, বিশেষ ক'রে যেখানে হিন্দুধর্ম, মুসলমান ধর্ম ও ক্রীশ্চান ধর্ম পাশাপাশি অবস্থান করছে, এবং ওর থেকে আরো নতুনতর কত কিছু শাখাপ্রশাখা গজিয়ে উঠেছে, সেখানে ইচ্ছা থাকলেও ওরূপ ধরনের কোন চেষ্টা করাই

অসম্ভব। আধ্যাত্মিকতা কোনো এক ধর্মের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক জিনিস এবং তার যা বৃহত্তর অর্থ আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে তাতে যে-কোনো বৃহত্তম ধর্ম বা এই সার্বভৌমিক বিশ্বধর্মের একটা অংশমাত্রই বা শাখামাত্রই তা হতে পারেনা; এই আধ্যাত্মিকতা বলতে আমরা বুঝব যার দ্বারা ভবিষ্যৎ মানব শাশ্বতকে খুঁজবে, সর্ব আত্মার পরমাত্মাকে চাইবে; যেখানে সকলেই এক এবং সকলেই সমান বলে জ্ঞান হবে, আর মানব জীবনের একটা উত্তরোত্তর বর্ধিত রকমের সত্য মূল্য জানা যাবে, যে মূল্য শাশ্বত ও দিব্য মূল্যের সঙ্গে তুল্য।

তা ছাড়া মানব জীবনের কোনোপ্রকার মহৎ লক্ষ্যকে, বর্তমান জগতের কোনোরূপ বৃহৎ সমস্যাকে, মানব সাধ্যের কোনোরূপ প্রচেষ্টাকে বা আত্মার উন্নতির ও প্রসারের কোনোরূপ ইচ্ছাকে, মানুষের শক্তি ও আনন্দ ও জ্ঞানদীপ্তি ও পূর্ণতা লাভের কোনোরূপ প্রয়াসকেই আমরা এর সীমাবহির্ভূত করতে চাইনা। আত্মা ছাড়া মন, আত্মা ছাড়া দেহ মানুষের হয় না। তেমনি মানুষের আধ্যাত্মিকতাও তার মনকে প্রাণকে বা দেহকে তুচ্ছ করতে পারেনা; বরং তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বড়ো করেই দেখবে, কারণ এইগুলিই হলো নিমিত্ত ও প্রয়োজনীয় যন্ত্র যার ভিতর দিয়ে মানুষের প্রাণ ও আত্মা বিকাশ পাবে। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ দেহ মন ও প্রাণের পুষ্টি ও সযত্ন শক্তিরক্ষার দিকে তেমনি গুরুত্ব দিয়েছিল যেমন প্রাচীন গ্রীক সভ্যতাও দিয়েছিল এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাও দিয়ে থাকে, যদিও বিভিন্ন ও বৃহত্তর উদ্দেশ্যে। সুতরাং যা কিছুর দ্বারাই এই সব জিনিসের সুষ্ঠু পরিণতি ঘটুক ও মুক্তক্রিয়া প্রকাশ পাক, বিজ্ঞান ও দর্শনের দিক দিয়ে বুদ্ধি বৃত্তির ক্রিয়া বাড়ুক, সমুন্নত সত্তার উপযোগী ছোটো বড়ো যা কিছুই শিল্পপ্রেরণা আসুক, দেহের স্বাস্থ্য ও শক্তি বাড়াবার জন্য যা কিছুই অনুশীলন করা হোক, জাতির অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য বাড়াবার জন্য যা কিছু ব্যবস্থা হোক, সকলই থাকবে এর অন্তর্গত; বস্তুত আমাদের ভুল ধারণা করে দেওয়া হয়েছে যে ভারতে দারিদ্র্যকেই জাতির উন্নয়নের কাম্য আদর্শ মনে করা হতো; তা কখনই সত্য নয়, আর রিক্ততা ও নিঃস্বতাকেই আধ্যাত্মিকতার প্রধান ভিত্তি বলে ধরা হতো এ কথাও ঠিক নয়,—তা ছাড়া ওর মধ্যে সাধারণ সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির ব্যবস্থাও দক্ষতার সঙ্গে করা হতো। তাদের যা লক্ষ্য

ছিল তা খুবই উচ্চমার্গের, কিন্তু তার ভিত্তি ছিল যথেষ্ট সুদৃঢ় ও বিস্তৃত, এবং এই সকল উপায়ের দিকে তারা যথেষ্ট সযত্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখত। যে নব ভারত গঠিত হবে তারও লক্ষ্য নবতর উপায়ে ঐ ধরনেরই থাকবে, ববং অপেক্ষাকৃত জটিলতর অবস্থার উপযোগী হবে, আরো সতেজ ও ব্যাপক ভাবে; কিন্তু তার মনের দিকের ক্রিয়াবৈচিত্র্যের ও বিভিন্নমুখী চেষ্টার কিছু হ্রাস হবেনা, বরং আগেকার চেয়ে বেশিই হবে। আধ্যাত্মিকতা কখনো একচোখো জিনিস নয়, তা সর্বতোমুখী হতে পারে।

কিন্তু তথাপি অস্তিত্বের সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী ও বস্তুতান্ত্রিক এবং মানসিক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে…

আমরা যখন দেহের স্বাস্থ্য ও শক্তি কামনা করি তখন তা কোন উদ্দেশ্যে? এ প্রশ্নের সাধারণ জবাব হবে ওরই আপন উদ্দেশ্যে। স্বাস্থ্য ও শক্তি আমাদের কাম্য বলে; কিংবা যাতে দীর্ঘ জীবন পেয়ে ওরই ভিত্তিতে আমাদের বুদ্ধির ও প্রাণের ও হৃদয়াবেগের পরিণতি লাভ হয়ে আমাদের সকল আশা মিটতে পারে। হাঁ, কথাটা সত্য বটে, কিন্তু আসলে তা এই হিসাবে যে দেহটি হলো আত্মারই অভিব্যক্তি, সুতরাং সেই হেতু এর সম্যক বিকাশ প্রয়োজন, যেহেতু সম্পূর্ণ মানবসত্তার সম্পূর্ণ কর্তব্য ধর্মের এও একটা অংশবিশেষ; তা ছাড়া এরই ভিত্তি সুদৃঢ় থাকলে তবেই মানুষ উচ্চতর ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে নিজের ভিতরকার দিব্যসত্তাকে আবিষ্কার ও তার বিকাশ ঘটাতে পারে। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে বলে শরীরম্ খলু ধর্মসাধনম্, তার মানে শরীরও ধর্মসাধনের উপায়, আমাদের সত্তার ভগবৎমুখী প্রয়াসের সহায়ক। আমাদের মনের দিকের সূক্ষ্মবোধের দিকেরও উন্নতি করা চাই যাতে মানুষ জীবনে আরো তৃপ্তি পায় অথবা মানুষের সূক্ষ্মতর প্রকৃতির বিকাশ হয়, এবং তাতে মানুষ বেঁচে থেকে নিজেকে সার্থক মনে করতে পারে। এই হলো সাধারণ মত। কিন্তু শুধু এই কথাই তো নয়, এগুলি যে আত্মারও অভিব্যক্তি। এর ভিতর দিয়ে মানুষ খোঁজে তার দিব্য মূল্য, এবং এই সব গুণের শক্তি ও তীব্রতা ও নমনীয়তা বেড়ে গেলে তখন সে জগতের দিব্য আদি সদ্‌বস্তুর কাছাকাছি গিয়ে পৌছতে পারে, তাকে আয়ত্তে আনতে পারে। শেষে নিজের সমগ্র জীবনকে তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঁধতে পারে। নীতি মেনে চললে তাতে ব্যক্তিজীবনে ও সামাজিক আচরণে একটা ভদ্ররকমের শৃঙ্খলা আসবে, তাতে সমাজ সুগঠিত হয়ে সংযত সুসঙ্গত ও ন্যায়পরায়ণ হওয়াতে সকলেরই পক্ষে

তা মঙ্গলের হবে, এই হলো সাধারণ মত। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নৈতিকতার অর্থ আরো গভীর। এর দ্বারা আমাদের কাজকর্ম এবং বিশে[ষ] ক'রে আমাদের সত্তার চরিত্রের ভিতরকার দিব্যতর অংশটুকু বিকাশ পা[য়,] তাতে ভগবৎ প্রকৃতির অভিমুখেই আমরা এগিয়ে যাই।

আমাদের সকল প্রকার লক্ষ্য ও প্রচেষ্টার বেলাতেও এই একই কথা সব কিছুই আধ্যাত্মিকতার অন্তর্গত হতে পারে, তাতে তার গভীরতা ও দিব্য মূল্য আরো অনেক বেড়ে যায়। যেমন দর্শনতত্ত্ব, পাশ্চাত্ত্যের পদ্ধতিতে এর অনুশীলন করতে গেলে আমরা বুদ্ধির নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে অস্তিত্ব রহস্যের আদি সত্যের অনুসন্ধান করব, বিজ্ঞানের কাছে যা কিছু জানা গেছে তারই উপরে পর্যবেক্ষণের যা কিছু কাজ করতে থাকব কিংবা যুক্তির পথ ধরে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করব, কিংবা উভয় প্রকারই একত্রে মিলিয়ে করতে থাকব। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলে আমরা সেই সত্যকে জানব কেবল বুদ্ধিমূলক বা বিজ্ঞানমূলক পর্যবেক্ষণের দ্বারা নয়, কিন্তু তা জানা যাবে ভিতরকার বোধির দ্বারা ও আভ্যন্তর অনুভূতির দ্বারা। দর্শনের কাজ হলো কিছুকে বাদ না দিয়ে বিভিন্নরূপ জ্ঞানের দ্বারা যতখানি যা জানা গেছে সেগুলিকে একত্রে সাজিয়ে গুছিয়ে দাঁড় করানো, এবং যে বিশ্বগত ও পরাৎপর অদ্বিতীয় সত্য রয়েছে তার সঙ্গে সংশ্লেষণমূলক সংযোগ স্থাপন করা। শেষ পর্যন্ত এর প্রকৃত মূল্য হলো সেইখানে যেখানে তা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পক্ষে ভিত্তিস্বরূপ হতে পারে এবং বিকাশমুখী মানব সত্তাকে দিব্য প্রকৃতির মধ্যে উন্নীত করতে পারে। বিজ্ঞান হলো কেবল জাগতিক জ্ঞান, যার দ্বারা বিশ্বরহস্য ও বিশ্বপ্রকৃতির ক্রিয়াপদ্ধতির মধ্যে আলোকপাত হয়। কিন্তু দর্শন কেবলই বাস্তবের জ্ঞান ও তার ব্যবহারিক ফলাফল নিয়ে, অথবা মানুষের জীবনের ও মনের বাস্তবগত ধারণা ও তৎপরতার দিক নিয়েই তার কাজ শুরু করে না; তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ও উৎকর্ষ তার কাছে নতুন রকমের গবেষণার ক্ষেত্র উন্মুক্ত ক'রে দেয়। এবং আত্মাকেই প্রথম সত্য বলে ধরে নিয়ে গভীর মনের ক্রিয়াতে যত কিছু মানসিক ও মানসোত্তীর্ণ বিজ্ঞানসত্য ও তার নূতন ও পুরাতন ফলাফল জানা গেছে সেগুলিকে জীবনের ও জড়জগতের ক্ষেত্রেও কাজে লাগায়। শিল্প ও কাব্যের আদিম লক্ষ্য ছিল মানুষের ও প্রকৃতির এমন প্রতিরূপ রচনা করা যাতে লোকের সৌন্দর্যবোধ তৃপ্ত হবে এবং জীবন সম্বন্ধে যে বুদ্ধিগত ধারণা ও

কল্পনা আসতে পারে তাকে শিল্পকৌশলে জাগিয়ে তুলবে; কিন্তু আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের লক্ষ্য এই হবে যে ওর চেয়েও বৃহত্তর যে জিনিস মানুষের মধ্যে লুকিয়ে আছে, আরো যে গভীরতর অধ্যাত্ম ও বিশ্বগত সৌন্দর্য পিছনে রয়েছে তাকে জাগিয়ে তোলো। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, এগুলির সম্বন্ধে সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা মানব জীবনের প্রথম অবস্থাতে প্রয়োজন আছে, যাতে অথবা সম্মিলিতভাবে মিলেমিশে বাস করতে ও উৎপাদন করতে পারি, আমাদের জীবনের কামনা বাসনাকে সফল করতে পারি, দেহ প্রাণ ও মনের উৎকর্ষের দিক দিয়ে মনুষ্যোচিতভাবে যথাসাধ্য অগ্রসর হতে পারি; কিন্তু আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিক থেকে ওতে আরো বেশি কাজ হবে। প্রথমত, জীবনের একটা স্থায়ী কাঠামো থাকবে যার মধ্যে থেকে মানুষ নির্বিবাদে আপন প্রকৃত আত্মার ও দিব্যত্বের সন্ধান ক'রে তাতেই উচ্চতর বিকাশলাভ করতে পারবে; দ্বিতীয়ত, তার জীবনের মধ্যে তার সত্তার পক্ষে ভগবত্তার উদ্দিষ্ট বিধানকে উত্তরোত্তর সার্থক করতে পারবে; তৃতীয়ত, সম্মিলিতভাবে তারা আলো, শক্তি, শান্তি, ঐক্য ও দিব্য সঙ্গতির দিকে অগ্রসর হতে পারবে যার জন্য মানবজাতি বরাবরই উপায় খুঁজছে। এত রকমের সম্ভাবনা রয়েছে ওর মধ্যে এবং এই অর্থেই আমরা চাইছি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও জীবনের ক্ষেত্রে তার প্রযোগ।

ভারতের পক্ষে সব চেয়ে ভালো কাজ হবে আপন প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে আপন স্বরূপ উন্মীলন করা, এবং তারই দ্বারা সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য কাজ করা। কিন্তু তার মানে এই নয়, যেমন অনেক সংকীর্ণ-মনার ধারণা, যে কালস্রোতে যা কিছুই নতুন জিনিস এসে পড়বে কিংবা পাশ্চাত্যের তরফ থেকে যা কিছু প্রথম আবিষ্কৃত ও সর্বস্বীকৃত শক্তিশালী হয়ে উঠবে তাকেও আমরা প্রত্যাখ্যান ক'রে চলব। এমন মনোভাব গ্রহণ করা বুদ্ধির দিক থেকেও মূঢ়তা আর কাজের দিক থেকেও অসম্ভব, তা হবে একটা অনাধ্যাত্মিক মনোভাব; প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কোনোরকম নতুন আলোকেই প্রত্যাখান করেনা, মানুষের আত্মোন্নতির কোনো জিনিসকেই বর্জন করে না। সেখানে শুধু আমাদের কেন্দ্রকে ঠিক রাখতে হবে, আপন সত্তার মূল ধারাকে ঠিক রাখতে হবে, আপন অন্তর্জাত প্রকৃতিকে ঠিক রেখে নতুন যা আসবে তাকে গ্রহণ ক'রে নিয়ে তাকে নিজের মতো ক'রে গড়ে নিতে হবে। ধর্মই হলো ভারতীয় মনের কেন্দ্রগত সর্বাগ্রচিন্তার ধারা; অনেকের কাছে

শুনি যে অতিরিক্ত রকমের ধর্মই ভারতের সর্বনাশ করেছে, কারণ ধর্মকেই আমাদের সমগ্র জীবনে অথবা সমগ্র জীবনটাকেই ধর্মে পরিণত করেছি, তাতেই আমরা জীবনে অকৃতকার্য হয়ে এত নীচে নেমে গেছি। এ কথার জবাবে আমি অন্য প্রসঙ্গে বলা কবির ভাষাতে বলতে চাইনা যে পতনেকিছু যায় আসেনা, যে ধূলাতে ভারত পতিত তাও অতি পবিত্র। পতন ও বিফলতা নিশ্চয়ই কাম্য নয়, আর ধূলাতে পড়ে থাকাও কোনো মানুষের পক্ষে বা জাতির পক্ষে গৌরবের কথা নয়। কিন্তু ওর যা কারণ দেখানো হয়েছে সেটা খুব ঠিক নয়। ভারতের অধিকাংশ মানুষ যদি প্রকৃতই তাদের সমগ্র জীবনকে ধর্মে পরিণত করত, তাহলে এখনকার মতো এ অবস্থা আমাদের হতোনা; কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবন অধার্মিক, আত্মকামী, স্বার্থপর ও বস্তুকামী হয়েছিল বলেই তার পতন হয়েছে। হয়তো আমাদের ভিতরকার একটা দিক ধর্মের বাহ্য ব্যাপার নিয়ে অতিমাত্রায় ঝুঁকেছিল, অর্থাৎ বাহ্য যত কিছু উৎসব অনুষ্ঠানাদি, নিয়ম পালন, ধর্মবিধির বাঁধাবাঁধির খুঁটিনাটি, যন্ত্রবৎ পূজাদির আচরণ, এবং অপরপক্ষে অন্যদিকে একেবারে সংসারত্যাগী কঠোর সন্ন্যাস, যাতে দেশের সর্বোৎকৃষ্ট মানসিক প্রতিভাগুলি আগেকার ঋষিদের মতো দেশের আধ্যাত্মিক প্রেরণার ও নবজীবনের আলোকদানের ভিত্তিস্বরূপ না হয়ে সমাজ থেকে বাদই হয়ে চলে গেল। কিন্তু পতনের মূল কারণ হলো সাধারণ ভাবে আমাদের সহজাত আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি গুটিয়ে সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া, বুদ্ধির তৎপরতা স্তিমিত ও জড়তাপ্রাপ্ত হয়ে গিয়ে স্বাধীনতা হারানো, মহৎ আদর্শগুলি হ্রাস পাওয়া ও স্বাভাবিক জীবনের তেজ নষ্ট হওয়া।

এক হিসাবে হয়তো ধর্মের বাড়াবাড়ি ঘটেছিল; ইংরেজিতে ধর্ম বলতে বেশির ভাগই বোঝায় বাহ্য সাম্প্রদায়িক রীতি, আচার পালন, বাহ্য নৈষ্ঠিক ক্রিয়াগুলি; ভারতীয় ভাষাতে এর সমুচিত প্রতিশব্দ কিছু নেই। কিন্তু ধর্ম বলতে যদি আমরা বুঝি পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক প্রেরণাকে অনুসরণ করা, এবং আধ্যাত্মিকতা বলতে যদি বুঝি উচ্চতর সত্তাকে জানা ও সেই দিব্য সত্তার মধ্যেই অবস্থান করা, সর্বময় ঐক্য বোধ ক'রে সত্তার সকল অংশকে যথাসম্ভব উন্নীত ক'রে তার দিব্য মূল্য উপলব্ধি করা,—তাহলে এই কথাই বলতে হয় যে তেমন ধর্মের কিছু বাড়াবাড়ি তো ছিলইনা বরং যথেষ্ট অল্পতাই ছিল— এবং যাও কিছু ছিল তাও ছিল একদেশদর্শী, সুতরাং তাকে যথেষ্ট ও যথোচিত

বলা যায় না। এর প্রকৃত প্রতিবিধান হবে ভারতের সেই যুগযুগান্তের আদর্শকে ছোটো না ক'রে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে ফিরে গিয়ে তার ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত করা, দেশের জাতীয় জীবনকে এই উচ্চতর আধ্যাত্মিক অর্থে প্রকৃতই একটা ধর্মে পরিণত করা। এখনকার পাশ্চাত্ত্যের যা কিছু দর্শন ও কাব্য ও শিল্প সকলই ক্রমে এই দিকেই মোড় নিচ্ছে, যদিও অল্পবিস্তর অজ্ঞাতসারে, কিন্তু ক্রমশ তার আলোকের মাত্রা বাড়ছে, আর এমনি মোড় নেবার ফলে তাদের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক আদর্শের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে সত্যের ক্ষীণ জ্যোতিরেখাও দেখা দিতে শুরু করেছে। কিন্তু তেমনি আদর্শের সম্বন্ধে জ্ঞানের ও তার সার্থক প্রয়োগের চাবিকাঠি রয়েছে ভারতের হাতে; উপযুক্ত প্রয়োগের অভাবে যা আগে ছিল অন্ধকার, তা এখন সে তার নতুন আলো দিয়ে সর্বত্র আলোকিত ক'রে তুলতে পারে; আগেকার পদ্ধতিতে যা কিছু ভুল ভ্রান্তি ছিল সে এখন তা সংশোধন ক'রে নিতে পারে; আগে যেখানে সে বেড়া দিয়ে তার আধ্যাত্মিক আদর্শকে বাইরের প্রভাব থেকে অবরোধ ক'রে রেখেছিল, এখন সে তার সেই বেড়া ভেঙে ফেলে তার মুক্ত আত্মাকে মুক্ততর ক্ষেত্রে বিস্তারদান করতে পারে। ভারত যদি ইচ্ছা করে তাহলে বর্তমান মানবজাতি যে সমস্যাগুলিকে নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে তার গতিকে সুনির্দিষ্ট এক নতুন দিকে ফিরিয়ে দিতে পারে, কারণ তার সেই প্রাচীন জ্ঞানের মধ্যে ওর সমাধানের উপায় নিহিত হয়ে আছে।

*　　*　　*　　*

বর্তমান যুগের জ্ঞান মানবজাতিকে বলছে, "হে মানব, তুমি এক ক্ষণস্থায়ী জীব মাত্র, প্রকৃতির দরবারে একটা পিঁপড়ে কিংবা একটা কেঁচো অপেক্ষা বেশি কিছু নয়, বিশ্বের মধ্যে স্বল্পজীবী ক্ষুদ্র একটি কণিকা মাত্র। অতএব যেটুকু তুমি বেঁচে থাকবে তা থাকো কেবল তোমার দেশের রাজ্যের কাজের জন্য, পিঁপড়েদের মতোই অনুসরণ ক'রে চলো তোমাদের দেশের শিক্ষিত পরিপালককে ও অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীকে।"...

কিন্তু বেদান্ত বলছে, "হে মানব, ভগবানও যা তুমিও তাই, তোমার প্রকৃতিও সেই একই জিনিস, তোমার আত্মাও তোমার প্রতিবেশীদের সঙ্গে অভিন্ন। অতএব জাগো, এগিয়ে চলো তোমার মূল দিব্যত্বের অভিমুখে, আর বেঁচে থাকো কেবল ভগবানের কারণে, যিনি তোমার মধ্যেও আছেন

আর অন্য সকলের মধ্যেও আছেন।” এ বার্তা তখন কেবল অল্প কয়েকজনকেই জানানো হতো, কিন্তু এখন সমগ্র মানবজাতিকে জানাতে হবে, তাদের উদ্ধারের জন্য।

* * * *

তোমাকে বাঁচতে হবে ভগবানের জন্য, কারণ ভগবান রয়েছেন তোমারও মধ্যে আর তোমার প্রতিবেশীর মধ্যে, ভগবান রয়েছেন তোমার দেশের মধ্যে আর তোমার শত্রুদেরও দেশের মধ্যে, ভগবান-রয়েছেন সমগ্র মানবে, বৃক্ষে লতায় প্রস্তরে ও সকল পশুর মধ্যে, ভগবান রয়েছেন জগতের মধ্যে ও জগৎকে ছাড়িয়ে, এই জেনে চলতে থাকলে তবেই তুমি জানবে যে ঠিক মুক্তির পথেই তুমি চলেছ।

তৃতীয় অধ্যায়

মানবের ভবিষ্য নিয়তি

মানব প্রগতিশীল জীব

মানবের মানবতাই শেষ কথা নয়, তার এখনও প্রগতি হয়ে চলেছে। কারণ মানবের স্তর থেকে আরো উচ্চে রয়েছে অনেক সমুজ্জ্বল স্তর, তা উঠেছে গিয়ে দিব্য অতিমানব স্তর পর্যন্ত। তাই হলো আমাদের ভবিষ্য নিয়তি এবং সেখানেই রয়েছে আমাদের মুক্তির সন্ধান এবং আমাদের বিরোধী শক্তিবিঘ্নিত ও সংকীর্ণ ঐহিক অস্তিত্বের ভিতর দিয়ে আমাদের আস্পৃহার মূল লক্ষ্য।

মানুষ বলতে আমরা বুঝি জীবন্ত দেহদুর্গের মধ্যে আবদ্ধ একটি মনকে। কিন্তু এই মনই যে হলো চেতনার সর্বোচ্চতম শক্তি তা নয়; কারণ আসল যা সত্য তা মনের দখলের মধ্যে নেই, মন কেবল অজ্ঞ সন্ধানী মাত্র। মনের উপরে রয়েছে এক অতিমানস বা বিজ্ঞানময় চেতনাশক্তি, যা মূল সত্যের শাশ্বত অধিকারী। মূলতঃ এই অতিমানস হলো শক্তিগর্ভ চেতনার উৎস, আপন প্রকৃতিতে সে একাধারে দিব্যতম জ্ঞাতা, ও স্রষ্টার অনন্ত জ্ঞান ও অসীম ইচ্ছার আধার। অতিমানসই অতিমানব হবে; বিজ্ঞানময় অতিমানবতাই ক্রমবিবর্তনের সুনির্দিষ্ট ও গৌরবমণ্ডিত পরবর্তী ধাপ, পার্থিব প্রকৃতি যেখানে গিয়ে পৌছবে।

মানব হতে অতিমানব, এই হলো পৃথিবীর বিবর্তনক্রিয়ার অভীপ্সিতা পরবর্তী উত্তরণ। এটা হওয়া অপরিহার্য, কারণ মূল আভ্যন্তরীণ আত্মার অভিপ্রায়ও তাই এবং প্রকৃতির অনুসৃত গতিপদ্ধতির সমুচিত যুক্তিসঙ্গতাও তাই।...

অতিমানবতা মানে যে বর্তমান মানবেরই আপন স্বভাবজাত গুণগুলির চূড়ান্তে আরোহণ তা নয়, তার যা কিছু শ্রেষ্ঠতর মানবীয় মহত্ব, ও জ্ঞান, শক্তি, বুদ্ধি, ইচ্ছা, চরিত্র, প্রতিভা, তেজ, সাধুতা, প্রেম, শুদ্ধতা ও পূর্ণতার আরো অধিকতর উন্নতি ঘটা তা নয়। অতিমানস এমন কিছু যা মনোময় মানব ও তার সকল সীমাকে ছাড়িয়ে গিয়ে এক অন্যতর জিনিস;

তা হলো মানব প্রকৃতির উপস্থিত চেতনা থেকে অনেক বৃহত্তম ও উচ্চতম এক বিশেষ চেতনা।

মানুষ নিজের মধ্যে এক আকাঙ্খা ভরা নস্যাৎ ছাড়া আর বেশি কিছু নয়। সে হলো এক ক্ষুদ্রতা, যা তার নাগালের অতীত বৃহত্ব ও বিরাট বৈভবের দিকে হাত বাড়ায়, বামন হয়ে উচ্চতার জন্য প্রলুব্ধ হয়। দ্যুতিময় বিশ্বমানসের মধ্যে তার মনটি এক আঁধারময় ক্ষুদ্র রশ্মি। তার প্রাণটি হলো নিত্যপ্রয়াসী ও নিত্য উল্লাসী, নিত্য দুঃখভোগী, আবেগোন্মুখ ও ব্যথাকাতর এক সত্তা,* অথবা কোনো কোনো মুহূর্তের জন্য অন্ধ ভাবে ও মূঢ়ভাবে বিশ্বজীবনের জন্য সুদূর-পিয়াসী। তার দেহটি হলো বাস্তববিশ্বের মধ্যে অতি নশ্বর কর্মক্লিষ্ট এক ক্ষুদ্র কণামাত্র। রহস্যজনক ভাবে উচ্চদিকে প্রগতিশীল প্রকৃতির পক্ষে তার শেষ অভিপ্রায় এমনই স্থায়ীজিনিস হতে পারে না। এর পরেও আরো কিছু আছে, মানুষ যা হবে; তার মাত্র কিছু কিছু ছাড়া ছাড়া আভাস ইঙ্গিত এ সম্বন্ধে অন্ধ অবিশ্বাসের কঠিন সংকীর্ণতার দেয়ালের ফাটল দিয়ে এখনই দেখা যাচ্ছে। মানুষের নিজের মধ্যে কোথাও রয়েছে এক অমর আত্মা, যার ভিতব থেকে এই সম্ভাবনার স্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝে ছুটে আসে বেরিয়ে; আর উপর থেকে এক শাশ্বত সত্তা তার প্রকৃতির ভিতরকার সেই আত্মাকে আচ্ছাদন দিয়ে তাকে সমর্থন দান করছে। কিন্তু সেই বৃহত্তম সত্তা ওর নিজের গড়া ব্যক্তিত্বের কঠিন ঢাকনিটাকে ভেদ ক'রে ভিতরে নেমে আসতে পারছেনা। আর ওর ভিতরকার আত্মাও তার আলোক থাকা সত্বেও ঘনতর বাহ্য আবরণের উপর আবরণের দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত হয়ে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ ভাবে চাপা পড়ে আছে। খুব অল্প কয়েকজন ছাড়া সকলেরই ভিতরকার আত্মা নিতান্তই অননুভূত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। মানুষের ভিতরকার যে গুহ্য আত্মা ও চৈত্যতেজ তা তাদের বাহ্যদৃষ্ট বস্তুদেহের অংশমাত্র হয়ে নেই, তা যেন তাদের প্রকৃতির উপরে উঠে তাকে ছাপিয়ে আছে। তা এই জড়দেহের মধ্যেই জন্মায়না, তা তার আপন জন্মধারা নিয়ে চলে এসেছে; মানব চেতনার কাছে তা উপস্থিত উপলব্ধ বস্তু নয়, তা এক সম্ভাবনাপূর্ণ বস্তু।

মানুষের মহত্ব সেখানে নয় যেখানে সে যতটা পর্যন্ত হয়ে আছে, কিন্তু তা সেইখানে যেখানে সে যতখানি সম্ভব অগ্রসর হতে পেরেছে। তার গৌরব এইখানে যে সে একটি বদ্ধ আধার ও জীবন্ত তৎপরতার গোপন

কারখানা স্বরূপ হলেও তারই মধ্যে কোনো দিব্য কারিগর তাকে অতিমানবতার জন্য প্রস্তুত ক'রে গড়ে তুলতে পারছে। সে আরো বেশি বৃহত্তর মহত্বের দিকে প্রবেশাধিকার পেয়েছে, যা ওর চেয়ে নিম্নতম আর কোনো সৃষ্ট জীব পায়নি, সেই কারণে সেও আংশিকভাবে ঐরূপ দিব্য পরিবর্তন আনবার সাহায্যকল্পে নিজেও এক কারিগর; ওতে তার চেতন সম্মতি ও সমর্থন, ঐদিকে তার উৎসর্গীকৃত ইচ্ছা ও সহায়কতা থাকা দরকার, যাতে তার দেহের মধ্যেই সে তার নিজেকে সরিয়ে তৎপরিবর্তে সেই সম্ভাব্য গৌরবকে নামিয়ে আনতে পারে। আর অতিমানস স্রষ্টাকে নামিয়ে আনার জন্য পৃথিবীর আহ্বানই হলো তার প্রকৃত অস্পৃহা।

পৃথিবী যদি ডাকে আর পরাৎপর যদি তাতে সাড়া দেয়, তাহলে সেই বিরাট ও মহান রূপান্তর এখনই ঘটে যেতে পারে।...

এটা বেশ লক্ষণীয় যে প্রকৃতি ইতিমধ্যেই যে বড়ো বড়ো ধাপগুলি অতিক্রম ক'রে উদ্দিষ্ট পরিবর্তনের দিকে অপরিমিত ভাবে এগিয়ে গেছে, তার ফল তার আগেকার সামান্যতর অগ্রগতির তুলনায় অনেক বেশি। নিত্য মূল্যবান ও ব্যাপকতর অভিব্যক্তির দিকে তার অতি আশ্চর্য উন্মীলন হয়েছে, তার সৃষ্টির মধ্যে নূতন কিছু আলো এসেছে এবং তার তাৎপর্যের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের এই জগতের মধ্যে সমান্তরালভাবে যে সকলেই সমান পর্যায়ে আছে তা নয়, ছোটো বড়োর তারতম্যের মধ্যে দেখা যায় এমন কতকগুলি প্রাধান্যের বিকাশ যা পর্বতচূড়ার উচ্চতা নিয়ে পরমতের দিকে মাথা উঁচু ক'রে ওঠে।

মানুষ যে এক মনোময় সত্তা, তাই সে ভাবে যে এই মনই হলো বুঝি বিশ্বের মধ্যে প্রধানতম নিয়ন্তা ও কর্তা ও স্রষ্টা, এবং এর ক্রিয়া চূড়ান্ত ও অপরিহার্য। কিন্তু তা ভুল ধারণা; এমন কি জ্ঞানের পক্ষেও মন একমাত্র সম্ভাব্য যন্ত্র নয়, একমাত্র অভীপ্সু ও আবিষ্কর্তা নয়। প্রকৃতির বিরাট অবচেতন বা অচেতন ক্রিয়া, ও দেবতার অমোঘ অতিচেতন ক্রিয়ার মাঝখানে, মন হলো এক আনাড়ির হস্তক্ষেপের মতো প্রচেষ্টা মাত্র।

মন স্থির ও চিন্তাশূন্য অবস্থায় থাকলে যতখানি ভালো কাজ করতে পারে, মনের নিজের ক্রিয়াচঞ্চল চেষ্টাতে তা সে কখনই তেমন পারে না।

মন যখন স্থির হয়ে থাকে, তখন তার সেই বিশুদ্ধ নীরবতার মধ্যে সত্য তার সত্য কথাটিকে শুনিয়ে দেবার সুযোগ পায়।

মনের চিন্তা দিয়ে সত্যকে কখনই আয়ত্ত করা যায়না, তা সম্ভব হয় কেবল নীরব দৃষ্টি নিয়ে অপেক্ষায় থেকে এবং তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে। সত্য অবস্থান কবে শাশ্বত উচ্চস্থানের নির্বাক জ্যোতির মধ্যে, বুদ্ধির তর্কাতর্কিব কোলাহলেব মধ্যে সে নেমে এসে মাথা গলায় না।

মনেব চিন্তা বড জোর হতে পাবে সত্যেব গায়ে জড়ানো জমকালো পবিচ্ছদ মাত্র, তাব আসল দেহটা নয়। শুধু সেই পরিচ্ছদটিকে না দেখে যদি তার ভিতব দিয়ে লক্ষ্য কবতে পাবো তাহলে হয়তো তার দেহটাব কিছু আভাসমাত্র পেতে পাবো। সত্যেব একটা চিন্তা-দেহ থাকতে পাবে, কিন্তু সে হলো স্বতঃস্ফূর্ত অতিমানস চিন্তা ও বাক্য যা সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয়েই বেবিয়ে আসে দিব্যজ্যোতির ভিতব থেকে, মনের কষ্টকল্পিত নকল জিনিস বা জোড়াতালিব জিনিস নয়। অতিমানসের চিন্তাও সত্যে গিয়ে পৌছবার রাস্তা নয়, কিন্তু তা সত্যকে ব্যক্ত কববার একটা উপায়, কারণ অতিমানসেব মধ্যে সত্য আত্মজ্ঞাত বা আত্মস্থ। অতিমানস সেই দিব্যজ্যোতির থেকে নিক্ষিপ্ত এক বাণ স্বরূপ, কিন্তু সেখানে পৌছবাব সেতু নয়।

নিজের ভিতবের দিকে সকল চিন্তা ও বাক্য হতে তুমি ক্ষান্ত হও, নিজেব মধ্যে অচঞ্চল ভাবে আত্মসমাহিত হও, উপবে চাও আলোর দিকে আব বাহিবে চাও তোমার চারিপাশ ঘেবা বিরাট বিশ্বময় চেতনার দিকে। উত্তরোত্তর সেই জ্যোতিব ঔজ্জ্বল্যেব সঙ্গে ও তার বিশালতাব সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাও। তবে তখন সত্য উপর থেকে তোমার মধ্যে প্রতিভাত হয়ে তোমার অন্তরে ও বাহিবে প্রবাহিত হতে থাকবে।

কিন্তু মনের পক্ষে নীরবও হওয়া চাই, আর গভীব ভাবে বিশুদ্ধও হওয়া চাই। মন নীরব না হলে সে পরমতম সত্যের আলো এবং বাণীকে গ্রহণ করতে পারেনা, কিংবা গ্রহণ করলেও তার সঙ্গে নিজের উদ্ভট মতামত ও আনুমানিক বক্তব্যগুলো মিশিয়ে ফেলে। আর মন যদি অশুদ্ধ থাকে তাহলে নীরবতার ফাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়ে যত বিভ্রান্তিকর আলো ও মিথ্যার কণ্ঠ স্বর, নিজেরই দাম্ভিক প্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি, কিংবা গুপ্ত যত কিছু গর্ব, আকাঙ্খা, লোভ, লালসা বা কামনার সাড়া। তখন ভগবৎ বাক্যের পরিবর্তে দৈত্য এবং অসুরগণই সেখানে কথা বলতে শুরু করবে।

নীরব থাকা অপরিহার্য, কিন্তু তার সঙ্গে উদার উন্মুক্ততাও থাকা চাই।

মন যদি নীরব না হয়ে সক্রিয় ও অহংকারমুখর হয় তাহলে যা কিছুই তার মিলুক তাকে বিকৃত ও বিরূপ ক'রে তুলবে। আর মনের যদি যথেষ্ট প্রসার না থাকে তাহলে সত্যের শক্তি ও সৃজন কুশলতাকে সে ধারণ করতে পারবে না। কিছু আলো তার মধ্যে প্রবেশ করলেও তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে ও ক্রিয়াবর্জিত হয়ে যায়; এমনি বিজাতীয় ও বিরুদ্ধ রকমের মনের স্তরের মধ্যে নেমে এলে সেই উচ্চ শক্তি ব্যর্থ ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে আবার ফিরে যায় আপন উচ্চতার মধ্যে। আর যদিও বা কিছু থেকে যায়, তা যেন হয় কর্দমে প্রোথিত মুক্তার মতো; প্রকৃতির কোনো পরিবর্তনই তাতে ঘটেনা, কিংবা যা কিছু হয় তার ক্ষীণ আভা সংকীর্ণ ভাবে উঠতে চায় কেবল চূড়ান্তের দিকে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক জগতে তার খুব কমই রেখাপাত হয়।

পূর্ণতাকামী আত্মার আকূতি

কিন্তু আমাদের মানব চেতনা ও তার ক্রিয়াগুলির মধ্যে যুক্তি বুদ্ধির দিকটা ছাড়াও আরো একটা অত্যাবশ্যক জিনিস আছে, যাতে মানুষকে অন্যান্য পশুদের থেকে একেবারে তফাৎ করেছে; কেবল যে আমাদের মনেরই একটা অংশ নিজের অপূর্ণতা মনে মনে টের পেয়ে থাকে তা নয়, আমাদের মধ্যে একটা চৈত্য অংশ রয়েছে যা তাকে প্রত্যাখ্যানও করে। এই অপূর্ণতা সম্বন্ধে আত্মার যে অসন্তোষ তা হলো পার্থিব জীবনের একটা নিয়ম, আত্মা আস্পৃহা করে যে আমাদের প্রকৃতির ভিতর থেকে সকল অপূর্ণতা ঘুচে যাক, কেবলই যে সে কামনা করে এমন এক স্বর্গ যেখানে চলে গেলে তার সকল অপূর্ণতা আপনি অসম্ভব হয়ে পড়বে তা নয়, সে চায় যে এখানেই এই জীবনেই যেন বিবর্তনমুখী সংগ্রামের দ্বারা সব অপূর্ণতাগুলিকে জয় করা যায়, যেগুলি আমাদের সত্তার মধ্যে থাকাও যেমন এক নিয়ম তেমনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠাও এক নিয়ম; এগুলিও দিব্যেরই জিনিস—এই দিব্য অসন্তোষ, আর দিব্য আকূতি। ওর মধ্যেই রয়েছে এক ভিতরকার শক্তির অন্তর্নিহিত আলো, যা সর্বদাই বজায় থাকে, যাতে ভগবান কেবল আমাদের আধ্যাত্মিক গোপনীয়তার মধ্যে শুধু লুকিয়ে না থেকে প্রকৃতির বিবর্তনমুখে নিজেকে বিকাশ ক'রে আনতে পারেন।

অনামা আলো

মানুষের জ্ঞানবৃত্তির মধ্যে সবটাই যে কেবল যুক্তিগত বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য ইচ্ছাতেই পরিপূর্ণতা নয়, ওর মধ্যে তা ছাড়া আরো রয়েছে গভীরতর, বোধিজনক, আশ্চর্য শক্তিশালী, কিন্তু অতি অস্পষ্ট ও অস্ফুট ও অপরিণত রকমের এক আলো, যার কোন নাম আমরা জানিনা। কিন্তু তার প্রকৃতি হলো এক ধরনের আলোকদীপ্তি এনে ফেলা, যা বুদ্ধির নীরস আলোও নয় কিংবা হৃদয়ের রসপ্লাবিত আলোও নয়, কিন্তু যার দীপ্তি সূর্যরশ্মির মতো, বিদ্যুতের শিখার মতো। সে অবশ্য বুদ্ধিকে ও হৃদয়কে সাহায্য দেবার জন্য তার অধিকারভুক্ত হয়ে জ্যোতির্বিকাশ করতে থাকে; কিন্তু তা ছাড়াও ওর একটা আলাদা রকমের প্রবেগ আছে যা বুদ্ধিকে অতিক্রম ক'রে যায়। সেই বেগের দ্বারা সে দীপ্তিমান ক'রে তুলতে চায় আমাদের জ্ঞান সত্তাকে, আমাদের নৈতিক ও সূক্ষ্মবোধ সত্তাকে, আমাদের ভাবসত্তা ও কর্ম-সত্তাকে, এমন কি স্নায়বিক ও আবেগময় সত্তাকেও। সে আমাদের অন্তরশ্রুত বাক্য শোনায় বিদ্যুৎবিকাশের মতো অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়, গুহ্য বা চৈত্য রহস্যময় ও ঔজ্জ্বল্যময় এক অসাধারণ রকমের আলো জ্বেলে দেয় মনোময় মানবের অন্তরে, এমন এক সত্যকে তার কাছে প্রতিভাত করে যা বুদ্ধির ও বিজ্ঞানের সত্যের চেয়েও অধিকতর সত্য, এমন এক অধিকার যা নৈতিক বিধানগত পুণ্যাদির চেয়েও অধিকতর দিব্য, এমন এক সৌন্দর্য্য যা শিল্পীর কল্পনা ও তার সাধনার সৌন্দর্যের চেয়েও অধিকতর গভীর ও ব্যাপক ও মোহনীয়, এমন এক দিব্য আনন্দানুভূতি যার কাছে সাধারণ সব কিছু আনন্দ ম্লান হয়ে যায়, যা স্নায়বিক সব কিছু প্রকার অনুভবের উপরে চলে যায়, তা এমন এক দিব্যতর জীবনের সম্ভাবনা ও ক্রিয়াতৎপরতা এনে দেয় যা মানুষের সাধারণ প্রেরণার ও দৃষ্টির ও সাধারণ জীবনধারার বহির্ভূত। তার ফল প্রথমে বুদ্ধি থেকে শুরু করে তার নিম্নতর সকল অংশে বহু বিভিন্নরূপে ও ছিন্ন ছিন্ন ভাবে ও বিভ্রান্তিজনক ভাবে দেখা দেয়, কিন্তু পরে শত বিকৃতির মধ্যেও শেষ পর্যন্ত ঐরূপ অপূর্ব জিনিসই সে এনে ফেলতে চায়। ধর্মরীতি ও পুণ্যানুষ্ঠানগুলি সেই আলোক ধরতে পারলেও তাকে চেপে মেরে ফেলে কিংবা নির্বাপিতপ্রায় করে ফেলে; চিরপ্রচলিত ধর্মীয় ব্যাপারে একে নিয়ে নির্দয়ভাবে মূলধন খাড়া ক'রে ব্যবসাও করা হয়; তথাপি এ সেই আলো

যাকে মানুষের ধর্মপ্রাণ আকৃতি ও আধ্যাত্মিকতা অনুসন্ধান করে ফিরছে, এবং সে জ্যোতি অতিশয় স্তিমিত হলেও তবু তার কিছু প্রভা টিঁকে থাকবেই॥

দিব্য অতিমানব

কি তোমার কাজ, কি তোমার সত্তার লক্ষ্য, কিসের জন্য তুমি এখানে রয়েছ? বস্তুত তোমাকে দিব্য অতিমানবে পরিণত হয়ে ভগবানের কাজের এক পূর্ণ আধার স্বরূপ হতে হবে। অন্য যা কিছুই কাজ তোমাকে করতে হোক, তা কেবল তোমাকে প্রস্তুত ক'রে তোলার জন্য, তার মধ্যে জয়ের আনন্দও আছে অবার পতনের দুঃখও আছে, সব কিছু ঐ একই উদ্দেশ্যে। আসল লক্ষ্যও তাই আর আসল অভিপ্রায়ও তাই, নতুবা জীবনের পথে নিজের জন্য শুধু কিছু আনন্দলাভ বা শক্তিলাভ করাই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হলো তোমার সত্তাকে বৃহৎ ক'রে তুলে তাতেই আনন্দলাভ করা। জীবনের পথে চলতে যে আনন্দটুকু পাও তার কারণ, যে তোমাকে ঐদিকে টানছে সে সঙ্গে সঙ্গে তোমার পথের সাথী হয়েই রয়েছে, আর তোমাকে যে আরোহণ শক্তি দেওয়া হয়েছে তা তোমার আপন চূড়ান্তে উঠবার জন্যই।

তোমার কর্তব্য বলতে যদি কিছু থাকে, তবে এইই সেই কর্তব্য; যদি জানতে চাও যে তোমার জীবনের কি লক্ষ্য হবে, তবে এইই সেই লক্ষ্য হোক; জীবনে যদি সুখ চাও, তবে এর চেয়ে বড়ো সুখ ও আনন্দ আর কিছু নেই, বাকী সব কিছু আনন্দই ভঙ্গুর বা সীমায়িত, যেমন হয় স্বপ্নের আনন্দ বা ঘুমের আনন্দ বা নিজেকে ভুলে থাকার আনন্দ। কিন্তু এ হলো তোমার সমগ্র সত্তার সামগ্রিক আনন্দ। যদি বলো যে তোমার সত্তা কি জিনিস, তবে জানবে যে স্বয়ং ভগবানই তোমার সত্তা, বাকী যা কিছু রয়েছে সমস্ত তারই ভাঙাচোরা কিংবা বিকৃত রূপ। যদি সত্যকে খোঁজো, তবে এইতো সেই সত্য। একেই নিত্য সামনে রাখো, সব কিছুতে এরই অনুগামী হয়ে থাকো।

যে দেখেছিল পর্দার আড়াল থেকে আর সেই পর্দাকেই ভেবেছিল আসল মুখ, সে ঠিকই বলেছিল যে তোমার লক্ষ্য হলো নিজেকে আত্মসার্থক করা; তাছাড়া আরো সে ঠিকই বলেছিল যে মানুষের প্রকৃতিই হলো

নিজেকে ছাপিয়ে ওঠা। সত্যই তার প্রকৃতিই তাই, আর ভগবানের লক্ষ্যও সেই আত্ম-উত্তরণ।

তাহলে তোমার কোন আত্মাকে উত্তীর্ণ হয়ে কোন আত্মাতে পরিণত হতে হবে? এই কথাটি ঠিক জানা চাই, এ বিষয়ে যেন কোনো ভুল না ক'রে ফেল; কারণ নিজেকে না জানার এই ভুলই যত কিছু দুঃখ শোকের আদি উৎস, এবং তাই হলো যত পদস্খলনের হেতু।

তোমাকে নিজেকে যেমন দেখাচ্ছে, যেমন মানুষ বলে নিজেকে তুমি জানো, আপাতদৃষ্টিতে যে পুরুষ তুমি, তাকেই তোমায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কে তুমি সেই মানুষটি? সে হলো একটি মনোময় সত্তা, যে জীবন ও জড়দেহের দাস হয়ে আছে; আর যেখানে সে তাদের দাস নয় সেখানে সে হচ্ছে নিজের মনের দাস। কিন্তু এ বড়ো কঠিন রকমের গুরুভার বহনের দাসত্ব; কারণ মনের দাস হয়ে থাকা মানেই বাহুবাঁধন মেনে সীমাবদ্ধ রকমে মিথ্যার দাস হয়ে থাকা।

আর যে আসল আমিত্বে তোমাকে পরিণত হতে হবে, তোমার সেই 'আমি' রয়েছে তোমার মন ও জীবন ও জড়দেহের যবনিকার আড়ালে। সেই হবে তোমার প্রকৃত আধ্যাত্মিক ও দিব্য অতিমানব, সেই তোমার প্রকৃত পুরুষ। কারণ মনঃসত্তার উপরেও যা আছে তাই হলো অতিমানব। সেই হবে তোমার মন ও জীবন ও দেহের প্রভু; এখন তুমি যে প্রকৃতির হাতের যন্ত্র মাত্র হয়ে তার পায়ের তলায় পড়ে আছো, সেই তখন তার উপরকার রাজা হয়ে তাকেই আনবে পায়ের তলায়। সে তখন আর দাস না থেকে হবে মুক্ত পুরুষ, অনেক অংশে বিভক্ত না থেকে সে এক হয়ে দাঁড়াবে, মৃত্যুর দ্বারা আচ্ছন্ন না থেকে সে হয়ে যাবে অমর, অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন না থেকে সে হবে দীপ্তিময়, দুঃখ শোকের ক্রীড়নক হয়ে না থেকে সে হবে আনন্দময়, দৌর্বল্যে নতমস্তক হয়ে না থেকে সে হবে প্রবল শক্তিতে উন্নত। সান্তের অধিকারী হয়েও সে অনন্তের মধ্যে অবস্থান করবে। এইভাবে ভগবানের মধ্যে থেকে তুমি তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে। একেই বলে নিজেকে পাওয়া এবং নিজেকে হওয়ানো, সব কিছু এর থেকেই চলে আসবে।

নিজের মধ্যে তুমি মুক্ত হও, তার মানে নিজের দেহে মনে ও জীবনে মুক্ত হও। কারণ তোমার নিজের ভিতরকার যে আত্মা সে মুক্ত।

ভগবানের সঙ্গে ও সকল জীবের সঙ্গে এক হয়ে যাও; নিজের অহংএর

মধ্যে জড়িয়ে থেকোনা, নিজের আত্মার মধ্যে অবস্থান করো। সেই আত্মার মধ্যেই ঐক্য।

নিজেকে অমর জ্ঞান করো, মৃত্যুকে বিশ্বাস কোরোনা; কারণ তোমার নিজের মৃত্যু হবে না, তোমার দেহেরই মৃত্যু হবে। কারণ আত্মা অবিনশ্বর ও অমর।

অমর হওয়া মানে সত্তায় ও চেতনায় ও আনন্দে অন্তহীন হয়ে থাকা, কারণ আত্মা অনন্ত, যা সান্ত হয়ে বেঁচে আছে তা সেই অনন্তেরই ইচ্ছাতে।

এসব জিনিস যখন তোমার মধ্যে রয়েছে, তখন তুমি তাই হয়ে দাঁড়াতেও পারো; যদি এসব তোমার মধ্যে না থাকে তাহলে কিছুতেই তা হতে পারতেনা। কারণ যা আছে ভিতরে, তাই কেবল বাইরের সত্তাতে প্রকাশ পেতে পারে। তুমি যা হয়ে আছো তার চেয়ে যখন অন্যরকম হতে পারো, তখন এই বর্তমান স্বরূপের দাস হয়ে থাকবে কেন?

অতএব ওঠো, নিজেকে উত্তরণ ক'রে নিজের পূর্ণ স্বরূপে উপনীত হও। তুমি একজন মানুষ, আর মানুষের প্রকৃতি হলো নিজের চেয়ে নিজেকে বড়ো ক'রে তোলা। মানুষ আগে ছিল মানব-পশু, এখন সে পশুমানবের চেয়ে বড়ো হয়েছে। সে এখন চিন্তক, শিল্পী, সৌন্দর্য-রসিক। এই চিন্তকের চেয়েও তাকে বড়ো হতে হবে; তাকে জ্ঞানদ্রষ্টা হতে হবে; শিল্পীর চেয়ে বড়ো হয়ে তাকে স্রষ্টা হতে হবে; সৌন্দর্য-রসিকের চেয়ে বড়ো হয়ে তাকে নিজে সৌন্দর্যময় ও আনন্দময় হতে হবে। দেহী হয়ে সে চায় দেহের অমর অভঙ্গুরতা; প্রাণী হয়ে সে চায় প্রাণের অমরতা ও সত্তার শক্তির অসীমতা; মন ও আংশিক জ্ঞানের অধিকারী হয়ে সে চায় চরম জ্ঞানালোক ও পরম দৃষ্টি।

এইগুলি পেলে সে হবে অতিমানব; মনকে ছাড়িয়ে তাকে অতিমানসে গিয়ে উঠতে হবে। তাকে দিব্য মানসই বলো বা দিব্য জ্ঞানই বলো বা অতিমানসই বলো,—তা হলো ভগবৎ ইচ্ছা ও ভগবৎ চেতনারই শক্তি ও আলো। এই অতিমানসের দ্বারাই সেই পরমাত্মা নিজেকে দেখতে নিজেকে সকল জগতের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, তার দ্বারাই তিনি এর মধ্যে থেকে সকল জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। এই প্রকারেই তিনি স্বরাট সম্রাট, আত্মনিয়ন্তা ও সর্বনিয়ন্তা।

অতিমানসই অতিমানব; সুতরাং মনের উপরে উঠলেই সেই অবস্থা হবে।

অতিমানব হওয়া মানে দিব্য জীবন লাভ করা, দেবত্বে উত্তীর্ণ হওয়া; দেবতাগণ ভগবানেরই শক্তি। মানুষ হয়ে তুমিও হও সেই ভগবানের শক্তি।

দিব্য সত্তায় পরিণত হয়ে তোমার মধ্যে সেই পরমাত্মার চেতনা ও আনন্দ, ইচ্ছা ও জ্ঞান তোমাকে অধিকার ক'রে তোমাকে নিয়ে ও তোমার ভিতর দিয়ে তা যেন ক্রিয়া করে, এই হলো অর্থ।

এই হবে পর্বত চূড়ায় উঠে তোমার রূপান্তর। নিজের মধ্যে ভগবানকে আবিষ্কার ক'রে সব কিছুতে তাঁকেই অভিব্যক্ত করবে। তাঁর মধ্যেই থেকে তাঁর আলোতেই দীপ্তিমান হ'বে, তাঁর শক্তিতেই কাজ করবে, তাঁর আনন্দেই আনন্দ পাবে। সেই অগ্নি, সেই সূর্য, সেই মহাসাগর হয়ে সেই আনন্দ, সেই বৃহত্ত্ব ও সেই সৌন্দর্যে তুমিও সুন্দর হবে।

এর যদি কিছু একটু অংশমাত্রও করতে পারো, তবে তুমি অতিমানবত্বের প্রথম ধাপে পৌঁছে গেছ।

অহংবোধ ও অতিমানবতা

যদি কেবল অতিমানব হয়ে ওঠার অভিপ্রায় নিয়েই এই যোগের পথে প্রবেশ করো, তবে তা হবে প্রাণগত অহংকারের কাজ, এবং তাতে ওর মূল উদ্দেশ্যই বিফল হবে। যারা ঐ অভিপ্রায়কেই সামনে রেখে কাজ করে তাদের শেষ পর্যন্ত পস্তাতেই হয়, আধ্যাত্মিক দিক দিয়েই হোক বা অন্য-দিক দিয়েই হোক। এই যোগের আসল লক্ষ্যই হলো, প্রথমত, দিব্য চেতনার মধ্যে প্রবেশ ক'রে তার মধ্যে আপন স্বাতন্ত্রিক অহংকে নিমজ্জিত ক'রে দেওয়া (যার ফলে আসল যে প্রকৃত ব্যক্তিসত্তা, যা তোমার সেই সীমাবদ্ধ দাম্ভিক ও স্বার্থপর মানবীয় অহং নয় কিন্তু যা ভগবানেরই এক অংশবিশেষ, তাকেই তুমি খুঁজে পাবে), আর দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর বুকে সেই অতিমানস চেতনাকে নামিয়ে আনা, দেহ মন প্রাণের রূপান্তর ঘটাবার জন্য। আর যা কিছু হবার তা এই দুটি লক্ষ্যের ফলেই হবে, কিন্তু তা এই যোগের মূল উদ্দেশ্য নয়।

অভীষ্ট লক্ষ্য

এই জান্তব ও অহংপূর্ণ চেতনার মধ্যে দিব্য সত্তাকে জানা ও আয়ত্ত করা ও তাতে পরিণত হওয়া, আমাদের স্বল্পালোকিত বা তমসাবৃত স্থূল

বস্তুমগ্ন মানসিকতাকে বিশুদ্ধ অতিমানসিক আলোতে প্রদীপ্ত ক'রে তোলা, যেখানে কেবল ক্ষণিকের সন্তোষ ও যত দৈহিক পীড়া ও মানসিক যন্ত্রণার দ্বারা চাপা পড়ে পড়ে তিক্ত হয়ে উঠছে সেখানে একটি শান্তির ও স্বয়ং-স্থায়ী আনন্দের অবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে জগৎ বলতে বোঝায় কেবল কতকগুলি স্থূল যান্ত্রিক প্রয়োজনের সমষ্টি সেখানে এক অন্তহীন মুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা, যে দেহ নিত্য পরিবর্তনশীল ও মৃত্যুপরিণামী তার মধ্যে অমর জীবনকে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করা—এই কাজই আমাদের দেওয়া হয়েছে জড়ের মধ্যে ভগবানের অভিব্যক্তি নিরূপণ করতে, এবং পার্থিব বিবর্তনক্রিয়ার দ্বারা প্রকৃতির এটাই আসল লক্ষ্য।

ব্যক্তির নিয়তি

আমাদের এই অহংগত আত্মবিকাশের অন্তর্বর্তী অবস্থায় চলার পথ হলো অবিদ্যা ও বহু বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে, যার মধ্যে কেবল দুঃখভোগ ও মৃত্যুরই প্রাধান্য; এতদ্রূপ বৈচিত্র্যের মধ্যেও যখন বিদ্যা এসে অবিদ্যার সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যেতে পারে, তখনই আমরা পূর্ণভাবে অমরত্ব ও আনন্দকে আয়ত্ত করতে পারি। তখন সকল সম্ভূতির উপরে উঠে পরম অজাত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে আমরা নিম্নতর জন্মলাভ ও মৃত্যুর কবল হতে মুক্ত হয়ে যাই; তখন মুক্তভাবে স্বেচ্ছায় দিব্য প্রকারের সম্ভূতিকে বরণ ক'রে নিয়ে অমরত্বের আনন্দের দ্বারা মৃত্যুকে দখল ক'রে নিতে পারব এবং মানবজাতির মধ্যে তারই সচেতন আত্মবিকাশের প্রদীপ্ত কেন্দ্রস্বরূপ হতে পারব।

কর্মের মধ্যে আনন্দ

তোমার সকল কর্মের মধ্যে এই তিনটি জিনিস থাকে,—কর্মের মালিক, কর্মী ও কর্মযন্ত্র। নিজের মধ্যে এই তিনটিকে ঠিক ভাবে জানা ও আয়ত্তীভূত করা, তাই হলো কর্মের গুপ্তরহস্য ও তার মধ্যেই মিলবে কর্মের আনন্দ।

প্রথমে নিজেকে জানো ভগবানের কর্মযন্ত্ররূপে, এবং তোমার ঐ যন্ত্রের মালিক বা প্রভুকে স্বীকার ক'রে নাও। যন্ত্রটি হলো সেই বাহ্য বস্তু যাকে তুমি 'আমি' বলছ; তা হলো মনের বিশেষ একটি ছাঁচ, শক্তির একটা

প্রবেগ, একটা যান্ত্রিক গঠন যার মধ্যে নানা রকমের কলকব্জা ও তার বিন্যাস। একেই যেন কর্মী বা কর্মের কর্তা বোলোনা; তা কখনো হতে পারেনা। বিনীত ভাবে, অনুগত ভাবে, ভক্তিভাবে ও আনন্দের সঙ্গে নিজেকে একটি দিব্য যন্ত্র বলেই মেনে নাও।

পরম প্রভুর বিশুদ্ধ একটি যন্ত্র যদি হতে পারো, এর চেয়ে গর্ব ও গৌরব আর কিছুতে নেই।

প্রথমে শেখো কেমন ক'রে সুবাধ্য হতে হয়। তরবারি কখনো নিজে বেছে নেয়না যে কোনখানে সে আঘাত করবে, ধনুকের বাণ কখনো প্রশ্ন করেনা যে কোন স্থানে তাকে নিক্ষিপ্ত হতে হবে, যন্ত্রের স্প্রীং-আঁটা কলগুলো কখনো নিজেরা বিচার করেনা যে কোনরকম বস্তু তার দ্বারা উৎপন্ন হবে। এ সব জিনিস সাব্যস্ত করা হয় প্রকৃতির অভিপ্রায় ও কর্মরীতি অনুসারে, আর তোমার সচেতন যন্ত্রটি যতই ভালোভাবে তার প্রকৃতির সেই মূলগত ও অভিপ্রেত নিয়মকে জানতে ও তার আজ্ঞা পালন করতে শিখবে, ততই শীঘ্র তার কাজগুলি সম্পূর্ণভাবে ও নির্দোষভাবে সুসম্পন্ন হবে। আত্মনির্বাচিত স্নায়ুদুর্বল ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াতে অথবা দেহ মনের যন্ত্রগুলির বিপরীত প্রকার বিদ্রোহক্রিয়াতে সকল কাজই পণ্ড হবে।

ভগবানের নিশ্বাসবায়ুতে তুমি চালিত হতে শেখো, ঝড়ে ওড়া পাতার মতো; নিজেকে তাঁর হাতে ছেড়ে দাও উদ্যত তরবারির মতো, কিংবা লক্ষ্য ভেদোন্মুখ তীরের মতো। তোমার মনকে করো যন্ত্রের স্প্রীংএর মতো, তোমার শক্তিতেজকে করো যন্ত্রের দ্রুতচালিত পিষ্টনের মতো, তোমার কাজগুলি হোক যেন পেষাইকরা ও পিটে সোজা করে দেওয়া লোহার দুরমুষের মতো। তোমার কথাগুলি হয় যেন নেহাইএর উপর হাতুড়ি পেটার টংকার শব্দের মতো, এবং এঞ্জিন চলার শব্দের মতো, এবং দেশে দেশে ভগবানের শক্তি বিঘোষণের তূরীভেরীর মতো। যে কাজ তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ও যা তোমাকে করতে দেওয়া হয়েছে তা যেমনভাবে পারো যন্ত্রের মতোই ক'রে যাও।

দেখ, তরবারিরও একটা আনন্দ আছে সংগ্রামলীলাতে। তীরেরও আনন্দ আছে শোঁ করে ছুটে যাওয়াতে, এই পৃথিবীরও আনন্দ আছে ঘূর্ণিতভাবে আকাশমার্গে প্রদক্ষিণ ক'রে ছুটতে, সূর্যেরও পরমানন্দ আছে জ্বলন্ত দ্যুতির ঐশ্বর্য ছড়িয়ে তার চিরন্তন ব্যোমযাত্রাতে। হে আত্মচেতন মানব-

যন্ত্র, তুমিও তোমার আপন ভূমিকার নির্দিষ্ট কর্মগুলির মধ্যে তেমনিভাবে আনন্দকে অভিনন্দন ক'রে নাও।

তরবারি কখনো নিজে চায়নি যে তাকে ঐভাবে গড়া হোক, আর তাকে যে ব্যবহার করছে তাকে কোন বাধা দিতেও সে যায়না, কিংবা যখন ভেঙে যায় তখন তার জন্য শোকও করেনা। তার তৈরি হওয়ার মাঝেও আছে একটা আনন্দ, ব্যবহৃত হওয়ার মাঝেও আছে আনন্দ, ফেলে রেখে দিলে তার মাঝেও আছে আনন্দ, এমন কি ভেঙে গেলে তাতেও আছে আনন্দ। সকল অবস্থায় সমান সেই আনন্দকে তুমি আবিষ্কার করো।

তুমি যন্ত্রকে ভুল করেছ কর্মকারক ও কর্মকর্তা বলে, তোমার কামনার ভ্রান্ত মোহে কেবল নিজের পছন্দমত অবস্থা ও নিজের লাভ ও নিজের সাফল্যই খুঁজেছো, সেই কারণেই তোমাকে যত কিছু কষ্ট ও যন্ত্রনা ভুগতে হয়েছে, আর বারে বারে জ্বলন্ত অগ্নিচুল্লীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে হচ্ছে, বারে বারে পুনর্জন্ম ও পুনর্গঠন নিতে হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রকৃত মানোবোচিত শিক্ষা সম্পূর্ণ না হয়।

আর সব কিছুরই কারণ ঐগুলি রয়েছে তোমার অপূর্ণ প্রকৃতির মধ্যে। এখানে বিশ্বপ্রকৃতিই হলো কর্মকর্তা,—আর কোনরূপ কাজে সে নিযুক্ত হয়ে আছে? সে গড়ে তুলছে এই সব অপরিণত মন প্রাণ ও জড়দেহের উপাদানগুলিকে নিয়ে সম্পূর্ণ সুগঠিত সম্পূর্ণ এক চেতন সত্তাকে।

* * *

তার পরে নিজেকেও জানবে কর্মী বলে। কারণ এটা বুঝতে হবে যে তোমার প্রকৃতিই হলো কর্মী, আর তোমার আপন প্রকৃতি আর সর্বময়-প্রকৃতিকেও নিয়ে সবই তুমি।

এই যে প্রকৃতি-সত্তা এ কেবল তোমার নিজের নয়, আর তোমাতেই সীমাবদ্ধ নয়। তোমার এই প্রকৃতিই সূর্য ও সৌরমণ্ডল গড়েছে, পৃথিবী ও তার জীবসমূহের সৃষ্টি করেছে, তোমাকে আর তোমার সব কিছুকে ও তুমি যা কিছু দেখতে পাচ্ছ সকলই সৃষ্টি করেছে। ঐ প্রকৃতি তোমার বন্ধু এবং তোমার শত্রু, তোমার মাতা এবং তোমার হন্তা, তোমার প্রেমিক ও তোমার পীড়ক, তোমার আত্মার আত্মীয় ভগ্নী ও অনাত্মীয়, তোমার সুখ ও তোমার দুঃখ, তোমার পাপ ও তোমার পুণ্য, তোমার বল ও তোমার দৌর্বল্য,

তোমার জ্ঞান ও তোমার অজ্ঞানতা। অথচ এ সবের মধ্যে ঠিক কোনোটাই নয়, কিন্তু এমন কিছু যা কেবল ওর নানারূপ প্রয়াস ও প্রতিবিম্ব মাত্র। কারণ এই সব কিছুরই পশ্চাতে রয়েছে, এক আদি আত্মজ্ঞান ও তার সঙ্গে অনন্ত শক্তি ও অসংখ্য গুণ।

কিন্তু তোমার নিজের মধ্যে রয়েছে একটা বিশিষ্ট ক্রিয়া, একটা নিজস্ব প্রকৃতি ও ব্যক্তিগত কর্মশক্তি। তাকেই অনুসরণ ক'রে যাও ক্রমবিস্তারী নদীর মতো, যতক্ষণ পর্যন্ত আপন মূল উৎসে গিয়ে না পৌঁছে যাচ্ছ।

অতএব তোমার দেহটিকে জেনো জড়বস্তুর একটি গ্রন্থি, মনটিকে জেনো বিশ্ব মানসের একটি উড়ন্ত আবর্ত, জীবনকে জেনো চিরপ্রবাহিত জীবন-তরঙ্গের একটি ঘূর্ণী। তোমার শক্তিকে জেনো সকল জীবেরই শক্তি, তোমার জ্ঞান এমন এক আলোর স্ফুলিঙ্গ মাত্র যা কারোই সম্পত্তি নয়, আর তোমার কাজগুলি তোমার জন্যই তৈরি হয়েছে, তোমার ভ্রমাত্মক ব্যক্তিত্বের দ্বারা সাধিত হতে।

সে কাজ যখন হয়ে যাবে, তখন তোমার প্রকৃত ব্যক্তিসত্তার সত্যে ও শক্তিতে, গৌরবে ও সৌন্দর্যে ও জ্ঞানে মুক্ত আনন্দ লাভ করবে, এবং এগুলির নিবৃত্তিতেও সেই আনন্দ থাকবে। কারণ সব কিছুই হলো সেই পরম পুরুষের নাটকীয় মুখোস মাত্র ও সেই আত্ম-ভাস্করের আত্ম-প্রতিকৃতি।

কেন নিজেকে সীমায়িত ক'রে রাখবে? নিজেকে অনুভব করো, যে-খড়্গ তোমাকে আঘাত করছে তার মধ্যেও, যে-বাহু তোমাকে আলিঙ্গন করছে তার মধ্যেও; আকাশের জ্বলন্ত সূর্যের মধ্যেও এবং পৃথিবীর ছন্দায়িত নৃত্যের মধ্যেও, সুদূরে উড্ডীয়মান চিল পাখির মধ্যেও আর মধুকণ্ঠী পাপিয়ার সঙ্গীতের মধ্যেও, যা কিছু হয়ে গেছে ও যা কিছু এখন হচ্ছে ও যা কিছু নিকট ভবিষ্যতে আসন্ন সবেরই মধ্যে। কারণ তোমার কোনো যে অন্ত নেই, তাই সবরকম আনন্দই তোমার পক্ষে সম্ভব।

কর্মী প্রকৃতি তার কর্মেও আনন্দ পায় এবং তার পরমপ্রিয় প্রভুর জন্য সে কর্ম করছে বলে তাতেও আনন্দ পায়। সে নিজেকে জানে তাঁরই চেতনা ও তাঁরই শক্তি বলে, তাঁরই জ্ঞান ও তাঁরই জ্ঞানসঞ্চয়ণ বলে, তাঁরই ঐক্য ও তাঁরই আত্ম-বিভক্তি বলে, তাঁরই সত্তার অসীমতা ও সসীমতা বলে। তুমি জানো যে তুমি নিজেও এই সব কিছু; পরমপ্রিয়ের যে আনন্দ তাতে তুমিও অংশগ্রহণ করো।

অনেকে আছে যারা নিজেকে জানে কর্ম বলে বা কর্মের যন্ত্র বলে বা কর্মের কারখানা বলে, কিন্তু তারা কর্মকারিকাকে পরম প্রভু বলে ভুল করে; এও একটা মস্ত ভুল। যারা এমন ভ্রমে পতিত হয় তারা ওর সর্বোচ্চ ও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ক্রিয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌছতে পারেনা।

যে যন্ত্র সেও তার নিজস্ব প্রতিরূপের মধ্যে সীমায়িত, যে বিশ্বময় কর্ম-কারিকা সেও তার নিজস্ব ধারার মধ্যে সীমায়িত, কিন্তু কেউই আসল মালিক নয়, কারণ কেউই সেই পরম মহাজন নয়।

* * *

অবশেষে নিজেকেই জানো সেই পরম প্রভু বলে; কিন্তু একে কোনো আকার দিতে যেওনা, এর কোনো গুণ ব্যাখ্যা করতে যেওনা। আপন সত্তায় তার সঙ্গে এক হয়ে যাও, আপন চেতনাতে তার সঙ্গে মিলে যাও, আপন শক্তিতে তারই ইচ্ছা পালন করো, আপন আনন্দে তার সঙ্গে জড়িত হয়ে সাযুজ্য লাভ করো, আপন দেহে প্রাণে মনে তাকেই সফল করো। তখন তোমার ভিতরকার একটি চোখ খুলে গিয়ে সেই একমাত্র পরম সত্য পুরুষ বেরিয়ে এসে দেখা দেবে,—যে তুমি অথচ তুমি নও, যে অন্যান্য সকলই এবং সকলের চেয়েও বেশি, যে তোমার সকল কর্মের নিয়ন্তা এবং ভোক্তা, যে কর্মীর মালিক ও কর্মেরও যন্ত্র, যে বিশ্বময় আপন তাণ্ডব নৃত্যে পদক্ষেপের তালে তালে অপার আনন্দে উল্লসিত, অথচ নিঃশব্দ ও নিঃসঙ্গ হয়ে তোমার অন্তরের গভীরতম কন্দরে তোমার আত্মার নীরবতার মধ্যেও বিরাজ করছে।

সেই পরম প্রভুর পরমানন্দ আয়ত্তের মধ্যে এলে তখন তোমার কিছুকেই আর জয় করবার রইলনা। কারণ তিনি তো নিজেকেই দিয়ে দেবেন এবং সব কিছু জিনিসে ও সব কিছু জীবের দেওয়া-পাওয়া ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তোমার অংশ থাকবে, আর যার কোনো অংশ হয়না তাও তিনি তোমায় দিয়ে দেবেন।

তোমার সত্তার মধ্যে তোমার নিজেকে ও সকল কিছুকেই বিধৃত ক'রে তুমি তাই হয়ে দাঁড়াবে যা তুমিও নয় এবং অন্যান্য কিছুও নয়। কর্মের এইই হলো চূড়ান্ত উদ্‌যাপন।

* * *

বানর, মানব ও অতিমানব

এমন এক প্রকার অস্তিত্ব যা এই মানুষের মতোই থাকবে অথচ এখনকার যেরূপ স্থায়ী অবস্থা তার থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে তা একেবারে বদ্‌লে যাবে—এটা সম্ভব জেনে মানুষের অতীত ও বর্তমানের অনুষঙ্গের দ্বারা জড়িত মনের পক্ষে ধারণা করা সহজ কথা নয়। আমরা আমাদের সম্ভাব্য উচ্চতর বিবর্তনের সম্পর্কে সেই ধরনের মনোভাবের অবস্থাতেই এখন রয়েছি, যে ভাব ছিল পূর্বে ডারুইনের তত্ত্বের আদিম বানরজাতির মধ্যে। তারা সেই আদিম যুগের গভীর বনের গেছো জীবন যাপন করতে করতে কখনো কল্পনাই করতে পারতনা যে এই পৃথিবীতে একদিন এমন এক প্রাণী দেখা দেবে যে তার ঐরূপ বাহ্য ও আভ্যন্তর অস্তিত্বের মধ্যেই বুদ্ধি নামক একটি নতুন রকম বৃত্তিকে লাভ করতে ও ব্যবহার করতে পারবে, এবং তারই জোরে তার সকল রকমের প্রবৃত্তি ও অভ্যাসকে স্ববশে আনতে পারবে—তার বাস্তব জীবনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে, নিজের জন্য পাথরের ঘরবাড়ি বানাতে পারবে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে দখলের মধ্যে আনবে, সমুদ্রে ভেসে বেড়াবে, আকাশে উঠবে, সভ্য আচরণ নীতি গড়ে তুলবে, তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অনেক উপায় উদ্ভাবন করবে। আর যদি সেই বানর-মনের পক্ষে এমন কিছু ধারণা করা সম্ভবও হতো, তথাপি সে ভাবতেই পারতনা যে প্রকৃতির কোনো অগ্রগতির ক্রিয়াতে কিংবা ইচ্ছাশক্তির কোনো সুদীর্ঘ প্রয়াস ও প্রবণতার দ্বারা সে নিজেই একদিন ঐরূপ প্রাণীতে পরিণত হবে। কিন্তু মানুষের এখন বুদ্ধি রয়েছে বলে এবং তার সঙ্গে অধিকন্তু কল্পনাকে ও বোধিকে কাজে লাগাতে পারছে বলে, সে তার এখনকার অস্তিত্বের চেয়ে উচ্চতর অস্তিত্বের সম্বন্ধে কিছু একটু ধারণা করতে পারে, এবং এমন কি তার বর্তমান অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে ঐরূপ উন্নততর অবস্থায় ব্যক্তিগত ভাবে উন্নীত হওয়ার সম্বন্ধে অনুমানও করতে পারে। সেই চরম অবস্থা সম্বন্ধে তার ধারণা এই যে তার নিজের মনের সহজাত আস্পৃহাতে যা কিছুই ভালো বলে কাম্য তার সমস্তই পুরোপুরি সফল হবে,—অর্থাৎ তার জ্ঞানের মধ্যে কোনো ভ্রমের ছায়ামাত্র থাকবেনা, আনন্দের মধ্যে কোনো দুঃখকষ্টের চিহ্নমাত্র থাকবেনা, তার সামর্থ্যের ব্যতিক্রমমাত্র থাকবেনা, শুদ্ধতা ও প্রাচুর্যের মধ্যে কোনো কিছু খুঁত বা সংকীর্ণতা থাকবেনা। মানুষ তার দেবতাদের সম্বন্ধে এইরূপই ধারণা করে; এইরূপ ধারণা অনুসারেই, সে তার

স্বর্গও কল্পনা করে। কিন্তু তার বুদ্ধিতে এমন ধারণা আসেনা যে এই পৃথিবীর ও এই মানবজাতির পক্ষেও ঐরূপ হওয়া সম্ভব। সে ভগবান ও স্বর্গ সম্বন্ধে যে স্বপ্নকল্পনা করে তা বস্তুতপক্ষে তার নিজেরই চরম পূর্ণতার স্বপ্ন; তথাপি এটা যে তার নিজেরই চরম পরিণতির লক্ষ্যরূপে বাস্তবে উপলব্ধি হবে এ কথা মেনে নিতে পারা তার পক্ষে ততটাই কঠিন, যতটা কঠিন ছিল আদিম বানরজাতির পক্ষে বিশ্বাস করা যে সে নিজেই কোনো একদিন এই ভবিষ্য মানবে পরিণত হবে। মানুষ হয়তো তার কল্পনাতে ও ধর্মভাবের আস্পৃহাতে তখনকার মতো একটা এরূপ পরিণতি ধারণায় আনতে পারে; কিন্তু যখনই তার বুদ্ধিবৃত্তি প্রকট হয়ে সেই কল্পনাকে ও উত্তরণকামী বোধিকে চাপা দেয়, তখনই সে তার ধারণাকে এই কঠিন বাস্তবের জগতে একটা উদ্ভট রকমের অন্ধকল্পনা মাত্র বলে সাব্যস্ত ক'রে নেয়। এটাকে তখন সে এক অসম্ভবের কামনামূলক মানসিক কাল্পনিক চিত্ররচনা বলেই ধরে নেয়। তখন সম্ভব হয় তার কাছে কেবল যা বাস্তব-সাপেক্ষ ও সীমায়িত, বড়ো জোর অনিশ্চিত রকমের কিছু জ্ঞান ও সুখ ও শুভ ও শক্তি লাভ, এই পর্যন্ত।

মানুষের জীবনের লক্ষ্য

মানুষ নিজেকে এই বিশ্বমাঝে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবে, এই তার জীবনের প্রথম কাজ। কিন্তু তা ছাড়াও বিবর্তনের ফলে শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে ছাড়িয়ে উঠবে; তার অপূর্ণ ও আংশিক সত্তাকে সে বাড়িয়ে বাড়িয়ে পূর্ণ সত্তায় পরিণত করবে, তার আংশিক চেতনাকে সর্বসম্পূর্ণ পূর্ণ চেতনাতে নিয়ে আসবে; সে তার আপন পরিবেষ্টনের উপর এবং জগতের ঐক্য ও জগৎ-সঙ্গতির উপরেও নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করবে; সে তার আপন ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করবে, কিন্তু তা ছাড়াও সেই ব্যক্তিত্বকে বৃহৎভাবে বিশ্বআত্মার স্বরূপ বলে জানবে এবং অস্তিত্বের একটা বিশ্বগত আধ্যাত্মিক আনন্দ উপভোগ করবে। তার হওয়া চাই একটা সমগ্র রূপান্তর, যা কিছু অন্ধকার ও অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে তার সম্যক সংশোধন ও বিশুদ্ধীকরণ, মনের মধ্যে যা কিছু ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা রয়েছে তার সংস্কার, এরং শেষ পর্যন্ত তার জ্ঞান ও ইচ্ছা-ক্রিয়ার ও অনুভূতির ও কর্মের ও চরিত্রের একটা মুক্ত সঙ্গতি ও দীপ্তিপ্রাপ্তি,—এই হলো তার প্রকৃতির সুস্পষ্ট অভিপ্রায়; সৃষ্টিশক্তি তার বুদ্ধিবৃত্তির উপরে এই আদর্শকেই আরোপ করেছে, তার মন ও প্রাণবস্তুর মধ্যে এই

প্রয়োজনের বীজ বপন ক'রে দিয়েছে। কিন্তু এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে কেবল যদি সে নিজেকে বাড়িয়ে এক বৃহত্তর সত্তা ও বৃহত্তর চেতনাতে নিয়ে আসে; তার আপাতদৃষ্ট যে আংশিক ও সাময়িক প্রকৃতি বর্তমান, যথেষ্ট আত্মবিস্তার ও আত্মপূরণ ও আত্মবিবর্তনের দ্বারা তার থেকে যে প্রকৃতি তার আপন সত্তার ও আত্মার মধ্যে গোপনে রয়েছে,—এই অভিব্যক্ত অস্তিত্বের মধ্যেই সেই প্রকৃতিকে বাস্তবে এনে দাঁড় করানো, এই হলো তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই বিশ্ব প্রপঞ্চের মধ্যে তার পার্থিব জীবনের পক্ষে এরূপ পরিণতি ঘটবে এই আশাই তার অস্তিত্বের যুক্তিসঙ্গত কারণ। এই আপাতদৃষ্ট বাহ্য মানুষটি যে ক্ষণস্থায়ী সত্তা রূপে বাস্তব দেহের চাপে ও সংকীর্ণ গণ্ডীর মনস্তত্ত্বের মধ্যে কয়েদী হয়ে আছে, তার থেকে মুক্ত হয়ে তাকে হতে হবে সেই আসল আভ্যন্তরীণ বৃহত্তর মানুষটি, যে নিজের ও নিজের পারি-পার্শ্বিকের দাস না হয়ে প্রভু, যে তার সত্তায় সারা বিশ্বগত। এর চেয়ে সহজ ভাষাতে বলতে গেলে, এই সাধারণ মানুষটিকে পরিণত হতে হবে এক দিব্য মানবে; যারা মৃত্যুর সন্তান তাদের নিজেকে জানতে হবে অমৃতের সন্তান বলে। এই কারণেই মনুষ্য জন্মকে বলা হয়ে থাকে বিবর্তনের মোড় ফেরা, পার্থিব প্রকৃতির একটি সন্ধিক্ষণের অবস্থা।

অতিমানসের প্রকৃতি

এই পার্থিব জীবনে দিব্যজীবন প্রাপ্তি, যে আদর্শকে আমরা গ্রহণ করেছি, তা সম্ভব হতে পারে কেবল আমাদের সত্তার আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের দ্বারা, এবং আমাদের প্রকৃতির আমূল রূপান্তর বা বিবর্তন বা সম্পূর্ণ ওলটপালটের দ্বারা। পৃথিবীতে আমাদের এই দেহী সত্তা তার মন প্রাণ ও দেহের আড়ালে থেকে তারই অধীন হয়ে রয়েছে, সেই আড়ালের উপরে উঠে গিয়ে তাকে তার নিজস্ব আধ্যাত্মিক স্বরূপে পূর্ণ চেতনা লাভ করতে হবে, এবং তার প্রকৃতিকেও সেই মন প্রাণ দেহের চেতনাশক্তির কবল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বৃহত্তর চেতনাতে ও সত্তার বৃহত্তর শক্তিতে ও আত্মার বৃহত্তর মুক্ত জীবনে এনে ফেলতে হবে। তার আগেকার আড়াল বা আবরণগুলি অবশ্য ঘুচবেনা, কিন্তু তা আর আড়ালরূপে অপূর্ণ জিনিস হয়ে না থেকে প্রকৃত অভিব্যক্তিরূপে বিকাশ পাবে। পরিবর্তনের দ্বারা তার মধ্যে আসবে এক জ্যোতির্ময় অবস্থা, অধ্যাত্ম জীবনের শক্তি, তা হবে আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের

এক আধার স্বরূপ। কিন্তু এমন অবস্থা আসতে পারেনা যদি মন প্রাণ দেহকে কোনো উচ্চতর সত্তার শক্তি ও প্রভাব এসে অধিকার ক'রে তার রূপান্তর ঘটিয়ে না দেয়, আর সে শক্তি হলো সেই অতিমানসের শক্তি যা আমাদের অপূর্ণ মনঃপ্রকৃতির অনেক উপরে, জৈব বস্তু ও জৈব প্রকৃতির অনেক উপরে, নিছক বস্তু প্রকৃতির অসংখ্যগুণ উপরে।

অতিমানস হলো মূলতঃ এক সত্যচেতনা বা ঋতচেতনা। সে চেতনা আমাদের অজ্ঞানময় চেতনা হতে একেবারে মুক্ত,—অর্থাৎ যে বর্তমান চেতনা আমাদের এখনকার বিবর্তনমুখী অস্তিত্বের ভিত্তিস্বরূপ, এবং যার ভিতর থেকে আমাদের প্রকৃতি নিত্য চেষ্টা করছে আত্মজ্ঞানে ও বিশ্বজ্ঞানে পৌছে আসল চেতনা লাভ ক'রে বিশ্বের মধ্যে আমাদের অস্তিত্বের আসল অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে। এই অতিমানস নিজেই এক সত্যচেতনা, তাই এর মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত অস্তিত্ব শক্তি আপনা হতেই অন্তর্নিহিত; এর গতি অতি ঋজু ও সরাসরি লক্ষ্যভেদী, এর ক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ এবং তা সীমাহীনও হতে পারে। তার কারণ পূর্ণ জ্ঞানই এর নিজস্ব প্রকৃতি; জ্ঞান একে অর্জন করতে হয়না, তা আপনা হতেই অধিকৃত; এর পদক্ষেপ অচেতনা বা অজ্ঞানতা হতে কোনো অপূর্ণ-আলোর দিকে নয়, কিন্তু সত্য হতে আরো বৃহত্তর সত্যের দিকে, সঠিক অনুভব হতে আরো গভীরতর অনুভবের দিকে, বোধি হতে আরো বোধির দিকে, চরম দীপ্তি হতে চরমতম সীমাহীন দীপ্তির দিকে, ব্যাপ্তি হতে ক্রমশ বিরাটতর ব্যাপ্তি ও শেষ পর্যন্ত আনন্ত্যের দিকে। এর চূড়ান্তে রয়েছে দিব্য সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা, কিন্তু এর সর্বোচ্চের চূড়ার দিকে ধাপে ধাপে ক্রমোত্তরণের গতিপথে সকল সময়েই তা সকল প্রকার অজ্ঞানতা ও ভ্রান্তি হতে মুক্ত; এর প্রারম্ভেও আছে সত্য এবং আলো, আর সর্বক্ষণ সেই সত্য ও আলোর ভিতর দিয়েই এর যাত্রা। এর জ্ঞানও যেমন চিরসত্য, এর ইচ্ছাও তেমনি চিরসত্য; কখনো একে হাতড়াতে হয়না, কখনো পদস্খলিত হতে হয়না। এই অতিমানসের মধ্যে ভাবাবেগ ঘটলেও তা কখনো সত্যভ্রষ্ট হয়না, কখনো কোনো ভুলচুক হয়না, ঠিক পথ হতে একটুও বিচ্যুত হতে হয়না, এ সুন্দরের ও আনন্দের কখনো অপলাপ করেনা, দিব্য সারল্যকে মোচড় দিয়ে বিকৃত করেনা। এখানে আমাদের স্বাভাবিক অপূর্ণতার ও অজ্ঞানতার মধ্যে যে নিন্দা অবিশ্বাস ও অপব্যবহারের নানা স্থূল কারণ থাকে, সেদিকে অতিমানসবোধ কখনো ভুলেও পা দেয়না। এমন

কি অতিমানসের কোনো অসম্পূর্ণ উক্তিও সত্য হতেই অধিকতর সত্যের দিকে নির্দেশ করে, এর অসম্পূর্ণ ক্রিয়াও সম্পূর্ণতর ক্রিয়ার দিকেই অগ্রসর হয়। অতিমানসের দ্বারা যে জীবন ও তার ক্রিয়া পরিচালিত হয় তা আপনা হতেই সকল প্রকার মিথ্যা ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত, যা আমাদের ভাগ্যে নিত্যই ঘটে; সম্পূর্ণ নিরাপদে এ আপন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারে। এই সত্যচেতনা যদি এখানে তার নিশ্চিত ভিত্তি স্থাপন করতে পারে, তাহলে দিব্য জীবনের বিবর্তন অতি সহজ আনন্দেই অগ্রসর হতে পারবে, আর সে যাত্রা হবে আনন্দেরই জ্যোতির্ময় পথে।

সর্বসম্পূর্ণতার ডাক

আমাদের সর্বসত্তায় এক নতুন উচ্চতাতে উঠে থাকবার জন্যই আমাদের প্রতি আহ্বান দেওয়া আছে; কিন্তু সে উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছবার জন্য আমাদের শক্তিক্রিয় অংশগুলিকে প্রকৃতির অনিশ্চিত গহ্বরের মধ্যে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তার থেকে ভারমুক্ত হয়ে আত্মার আনন্দময় শান্তির মধ্যে যাবার চেষ্টার দরকার হবেনা; ওটা অক্লেশেই করা যেতে পারে এবং তাতে প্রচুর শান্তি এবং মুক্তিও মেলে, কিন্তু স্বয়ং প্রকৃতি আমাদের কাছে এই চায় যে আমরা যেমন আছি তেমনি থেকে সমগ্র ভাবেই যেন সেই আধ্যাত্মিক চেতনাতে উঠে গিয়ে আত্মার সর্বাঙ্গীন ও বহুধা রূপে অভিব্যক্ত শক্তিতে পরিণত হই। প্রকৃতির পূর্ণ সত্তার পূর্ণ লক্ষ্যই হলো সম্পূর্ণভাবে রূপান্তর; এই হলো তার আত্ম-উত্তরণমূলক বিশ্বগত এবং অন্তর্নিহিত প্রেরণা। এই কারণেই প্রকৃতির কর্মপদ্ধতি এমন হয়নি যাতে সে এক নূতন রকম সূত্র ধরে নিজেকে আরো উচ্চতর ভাবে প্রকট করে; সেই যে কাম্য উচ্চতার চূড়া তা অতীব সংকীর্ণধার পর্বত শৃঙ্গের মতো নয়, ওর বিস্তার যথেষ্ট এবং ওতে জীবনের এমন বৃহত্তর ক্ষেত্র এনে দেয় যেখানে সেই নূতন আদর্শ ব্যক্ত হবার মতো যথেষ্ট পরিসর ও সুযোগ পায়। তা যে কেবল সেই নূতন আদর্শেরই যথাসম্ভব বিস্তার ও বৃদ্ধি ঘটায় তাই নয়; যা ছিল নিম্নতর তাকেও সে উচ্চতর মূল্যের জিনিসে এনে ফেলতে পারে; এই দিব্যজীবন বা আধ্যাত্মিক জীবন কেবল যে মন প্রাণ দেহের আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটিয়েই কাজ শেষ করবে তা নয়, কিন্তু পূর্বে ঐগুলি তার আপন স্তরে থেকে যতটা পর্যন্ত কাজ

করতে পারছিল তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ ব্যাপকতর ও পূর্ণতর ভাবে করতে পারবে। আত্ম-উত্তরণের জন্য আমাদের মন প্রাণ দেহের স্বাভাবিক অস্তিত্বকে নষ্ট করবার কোনো দরকার নেই, কিংবা আধ্যাত্মিকতা আনতে তাদের খাটো করবার কিংবা বিকল করবারও কোনো দরকার নেই; সেগুলিকে বরং আরো বৃহত্তর ও পূর্ণতর ও বলবৎ ক'রে তোলা যেতে পারে; দিব্য পরিবর্তন এসে পড়লে তখন ওরা এতরকম সম্ভাব্য ক্রিয়াতে পারদর্শী হবে যা পূর্বেকার অনাধ্যাত্মিক অবস্থাতে ছিল অসাধ্য ও অভাবনীয়।

জয়ের আনন্দ

…আত্মগুপ্তি ও আত্ম-অবগতির যে অপূর্ব লীলা এবং তার যা চূড়ান্ত মোহনীয়তা, এর মতো উদ্যমজনক আনন্দ কোনো চেতন সত্তা অন্য কিছুতেই পেতে পারেনা। এই যে এক বিজয়লাভ, যাতে সকল বিঘ্নই হয় পরাজিত, যাতে হয় জ্ঞানে জয়, শক্তিতে জয়, সৃষ্টির অসম্ভাব্যতার উপরে সৃষ্টির সম্ভাব্যতার জয়, প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও নানা কষ্ট ও পরীক্ষার উপর অবশেষে এই জয়ের আনন্দ, এর চেয়ে বেশি সুখ মানুষের পক্ষে হতে পারেনা। এ হলো দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে মিলনের তীব্র আনন্দ, যে মূল সত্তা থেকে আমরা পৃথক হয়ে ছিলাম তারই সঙ্গে পুনরায় মিলবার আনন্দ। অজ্ঞানতার মধ্যেও একটা আকর্ষণ আছে কারণ তা আমাদের মধ্যে এনে দেয় আবিষ্কারের আনন্দ, এক নবতর ও অদৃষ্টপূর্ব সৃষ্টির বিস্ময়, আত্মার এক মহৎ দুঃসাহসিক অভিযান; এই যাত্রার মধ্যে ও অনুসন্ধানের মধ্যে ও তার প্রাপ্তির মধ্যে আনন্দ আছে, এই সংগ্রাম ও রাজ্য দখলের মধ্যে আনন্দ আছে, শ্রম ও তার পুরস্কার লাভের মধ্যে আনন্দ আছে। অস্তিত্বের হর্ষই যদি সৃষ্টির গোপন কাম্য হয়, তবে এও একরকম অস্তিত্বের হর্ষ; একে সৃষ্টির আপাতদৃষ্ট কূট ও বিপরীত প্রকার লীলার হেতু অথবা অন্তত পক্ষে তার এক অন্যতর হেতু বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত পুরুষের এমন ধরনের পছন্দের কথা বাদ দিলেও, যে মূল মহা অস্তিত্ব নিজেকে বিকাশ করতে নিজেকে অচেতনার মধ্যে নিমজ্জিত করেছে তার ভিতরেও একটা অন্তর্নিহিত নিগূঢ় সত্য আছে; তার ফল বিপরীতের মধ্যে এসে সচ্চিদানন্দের এক নূতন রকমের পুনর্নিশ্চয়তা।

অনন্তের নানা প্রকারে আত্মাভিব্যক্তি করবার অধিকার আছে এ কথা যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এইরূপ ভাবে তাঁর অন্যতর অভিব্যক্তির সম্ভাবনাও সহজেই বোধগম্য হতে পারে এবং তারও একটা সুগভীর তাৎপর্য আছে বলে ধরে নিতে হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্ণ যোগ

ভূমিকা

জীবনের দিক ও যোগের দিক, দুইদিক থেকেই বলা যেতে পারে যে সমগ্র জীবন একটা যোগই, চেতন ভাবেই হোক বা অচেতন ভাবেই হোক। কারণ যোগ বলতে আমরা বুঝি আত্ম-পরিপূর্ণতার জন্য একটা নিয়মিত প্রচেষ্টা, সত্তার মধ্যে যে সকল বৈভব অস্ফুট ও অব্যক্ত রয়েছে তাকে ব্যক্ত করার দ্বারা—এবং মানবীয় ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত যে মহা অস্তিত্ব সকল মানুষের মধ্যে ও সারা জগতে আংশিকভাবে চতুর্দিকে আমরা প্রকাশিত দেখছি তার সঙ্গে মিলিত ও যুক্ত হওয়ার দ্বারা। কিন্তু বাইরে যা দেখছি তার পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখব যে সকল জীবনই হলো প্রকৃতির এক বিরাট যোগ, প্রকৃতিও চেষ্টা করছে তার সকল অব্যক্তকে নিত্য আরো অধিকতর ভাবে ব্যক্ত করবার জন্য এবং নিজেকে তার দিব্য উৎসের সঙ্গে মিলিত করবার জন্য। তার এই মহৎ উদ্দেশ্য যাতে তাড়াতাড়ি ও দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধ হয়, সেই কারণে পৃথিবীর মধ্যে সে এই সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যে চিন্তাশক্তি দিয়ে তার মধ্যে আত্ম-সচেতনা আসার উপায় ও ইচ্ছার দ্বারা ক্রিয়া করবার ব্যবস্থা ঘটিয়েছে।...অতএব প্রকৃতি মাতার বিরাট উর্ধ্বোত্তরণ প্রচেষ্টার মধ্যে সাধারণ প্রাকৃতিক উপায়াদির দ্বারা যা কিছু সর্বব্যাপী ভাবে শৈথিল্যের সঙ্গে ও মন্থর গতিতে করা হচ্ছে, নির্দিষ্ট রকমের যোগ পদ্ধতি হলো তারই সংক্ষিপ্তসার বেছে নিয়ে তাকে গুটিয়ে ঘনীভূত করে এনে আরো প্রবেগযুক্ত ও তীব্র ক'রে তোলা, এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। যোগ সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গী নিলেই যোগের পদ্ধতিগুলিকে সঠিক ভাবে ও যুক্তিযুক্ততার সঙ্গে সংশ্লেষণ করবার একটা ভিত্তি খুঁজে পাবে। তখন আর যোগকে গুহ্য রকমের কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার, যার সঙ্গে সাধারণ জগৎক্রিয়ার কোনো সম্পর্কই নেই এমন বলে মনে হবেনা, কিংবা জগৎ প্রকৃতির আত্মপরিণতির পক্ষে তার ভাবগত ও বিষয়গত দুই-রূপ ক্রিয়ার উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার যোগ নেই বলেও মনে হবেনা। প্রকৃতি

আগের থেকেই যে শক্তিকে অভিব্যক্ত করেছে বা ধীরে ধীরে ক্রমশ সাধারণ ভাবে সংযোজনা করছে, এ হলো তারই অতি তীব্রতর ও সাধারণাতীত ভাবের বিশিষ্ট প্রয়োগ।

মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক রকমের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াগুলি ঘটে থাকে, তার সঙ্গে সম্পর্কে রেখে তাকে নিয়েই যোগ পদ্ধতিগুলির কাজ, যেমন স্বাভাবিক বিদ্যুৎশক্তি ও বাষ্পশক্তিকে সংহত ক'রে নিয়ে বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক ভাবে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। আর সেই বিজ্ঞানেরই মতো রীতিমত পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা, ব্যবহারিক বিশ্লেষণের দ্বারা ও পুনঃপুনঃ ফললাভের দৃষ্টান্তের দ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হয়েছে, তার থেকেই এগুলিও গড়ে উঠেছে। যেমন, রাজযোগ নির্ভর করে এই অনুভূতির উপর যে আমাদের আভ্যন্তর উপাদানগুলিকে এবং তার সমন্বয়কে, তার ক্রিয়াকে ও তার ক্রিয়াশক্তিকে পৃথক করাও যায় বা লয়প্রাপ্ত করাও যায়, আবার নতুন রকমের সমন্বয় ঘটিয়ে তার দ্বারা আশ্চর্য রকমের কিছু অসম্ভব কাজও করা যায়, কিংবা নির্দিষ্ট প্রকার আভ্যন্তরীণ পদ্ধতিতে নূতন রকমের রূপান্তর ও সংশ্লেষণও ঘটানো যায়। তেমনি, হঠযোগও নির্ভর করে এই অনুভূতির উপর যে আমাদের স্বাভাবিক জীবনে যে সব শক্তি ও তার ক্রিয়াগুণ বাঁধাধরা নিয়মে কাজ করছে এবং যা আপাতত অপরিহার্য, তাকেও শাসনাধীন ক'রে নিয়ে ক্রিয়াগুলিকে বদলানো বা স্থগিত করা যায় এবং তার ফলে এমন অসম্ভব জিনিস ঘটানো যায় যা অন্যের কাছে ভোজবাজির মতো পরমাশ্চর্য বলে মনে হবে, বিশেষত তাদের কাছে যারা এ পদ্ধতির কোনো সূত্র ধরতে পারেনা।…যোগ নামক একটি সাধারণ আখ্যার অন্তর্গত যে সকল নানা পদ্ধতি রয়েছে, তার ভিত্তি হলো প্রকৃতির এক স্থায়ী সত্যের উপর মনস্তাত্ত্বিক অনুশীলনের প্রণালী, যার দ্বারা আমাদের জীবনের স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলির উপর এমন সব শক্তিলাভ ও সাফল্যলাভ করা যায় যার বীজ ভিতরেই অস্ফুটভাবে ছিল এবং জীবনের সাধারণ ক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে যেগুলি সহজে প্রকাশ হতে পারেনি।

…যোগের পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে চলা এবং তাতে বিরল রকমের সাফল্য লাভ করার চেষ্টায় অনেক বিপত্তি এবং ক্ষতিও ঘটতে পারে। যোগী ব্যক্তি নিজেকে সাধারণ অস্তিত্ব থেকে সরিয়ে নেওয়াতে তার উপর বিশেষ কোনো দখল তার থাকেনা; সে তার আপন মানব তৎপরতাগুলি থেকে বঞ্চিত

ও রিক্ত হয়ে আত্মিক সম্পদই আহরণ করে, বাহ্যের মৃত্যু ঘটিয়ে আভ্যন্তরীণ মুক্তি ক্রয় করে। ভগবানকে যদি বা পায়, জীবনকে সে হারায়, কিংবা যদি বাইরের দিকে ফিরে জীবনকে জয় করতে যায় তাহলে তাতে আবার ওদিকে ভগবানকে হারিয়ে ফেলার আশংকা থাকে। সেইজন্যই আমরা ভারতে দেখতে পাই যে জাগতিক জীবন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সিদ্ধির মধ্যে এতটা দুস্তর অমিল দাঁড়িয়ে গেছে, এবং যদিও ঐতিহ্য ও আদর্শ অনুসারে ভিতরের আকর্ষণ ও বাইরের চাহিদার মধ্যে একটা বিজয়ী রকমের সঙ্গতি স্থাপনের কথা, কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত বাস্তবে খুব কমই দেখা যায়। বস্তুত কোনো ব্যক্তি যখন তার দৃষ্টিকে ও ক্রিয়াশক্তিকে ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যোগের পথে পা দেয়, তখন সে আমাদের সমষ্টিগত অস্তিত্ব প্রবাহের ভিতর থেকে ও মানুষের লৌকিক উন্নতি প্রচেষ্টার দিক থেকে অবশ্যম্ভাবী রূপে বাদ পড়ে গেল বলেই ধরে নেওয়া হয়। এ ধারণা এতই দৃঢ়তর হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর প্রচলিত দার্শনিক ও ধর্মীয় মতে এ ধারণাকে এত বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যে সকলেই এখন মনে করে যে যোগের জন্য কেবল সংসারকে ত্যাগ করাই দরকার বলে নয়, এটাই যোগের সাধারণ লক্ষ্য। কিন্তু কোনো যোগেরই সংশ্লেষণ যথার্থভাবে সম্পূর্ণ ও সন্তোষজনক হতে পারেনা, যার মধ্যে ভগবানকে ও প্রকৃতিকে মিলিয়ে দেওয়া মুক্ত ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলে ধরা হয়নি, কিংবা যার সাধনাপদ্ধতির মধ্যে ভিতরের ও বাইরের কাজ-গুলির ও অনুভূতিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য এনে দুই জিনিসকেই সর্বতোভাবে মিলিয়ে নিয়ে চলার কোনো অনুমোদন ও অনুভূতি নেই।...যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সার্থকতা তখনই সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হবে, যখন মানুষের সচেতন যোগ প্রকৃতির অবচেতন যোগের মতো বাহ্যতঃ জীবনের সঙ্গেই সংলগ্ন হয়ে থাকবে, এবং আমরা এর সাধনা প্রণালী ও সিদ্ধিলাভ দুই দিক দেখেই আরো জোরের সঙ্গে পুরোপুরি দীপ্তিপূর্ণ অর্থে বলতে পারব—"সর্ব জীবনই যোগ।"

মানুষের সমগ্র সত্তা, প্রকৃতি ও জীবন হলো এই পূর্ণযোগের অধিকারেরই মধ্যে। এ যোগ মানুষের দেহটিকে তার মন বা হৃদয়ের চেয়ে কম দরকারী বলে মনে করেনা, এবং এর সিদ্ধি ঘটলে তখন তার মুক্ত ও রূপান্তরপ্রাপ্ত সত্তার সকল অংশেই একটা সঙ্গতিপূর্ণ দিব্যত্ব অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

স্থূলদেহকে সুপরিণত ভাবে রক্ষা ক'রে তার ভিতরকার মনকে সুসম্পূর্ণ ক'রে তোলা, এই হলো প্রকৃতির লক্ষ্য, এবং আমাদেরও তাই লক্ষ্য হওয়া

উচিত, যাতে সুপরিণত দেহ ও মনের মধ্যে আত্মার পরমতম ক্রিয়াগুলি উদ্‌ঘাটিত হয়। আমাদের মানসিক জীবন যেমন দৈহিককে রদ ক'রে না দিয়ে বরং তার অধিকতর উন্নতি ও সার্থকতা ঘটাতে চেষ্টা করে, তেমনি আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনও যেন আমাদের বুদ্ধিগত, সূক্ষ্মবোধগত ও প্রাণগত ক্রিয়াগুলির দিক রদ ক'রে দিতে না চেয়ে বরং তার উত্তমতর রূপান্তর ঘটাতে চেষ্টা করে।...

পরম জ্ঞান তাকেই বলব যাতে ভগবানকে বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত দুই ভাবেই উপলব্ধি ও গ্রহণ করা যায়, আর পূর্ণ যোগ তাকেই বলব যাতে সেই পরাৎপরকে জেনে এবং পেয়ে আবার এই বিশ্বের প্রাঙ্গনে ফিরে আসা যায়, এবং লব্ধ শক্তিকে বজায় রেখে মুক্তভাবে অস্তিত্বের বিরাট সোপান বেয়ে নামা ওঠা করা যায়।...

বেদান্তের সেই সূত্র, যে আত্মা তাবৎ সর্বভূতের মধ্যে বিধৃত, সর্বভূতও বিধৃত সেই আত্মার মধ্যে, এবং সব কিছু আত্মারই সম্ভূতি, তাই হলো এই সর্বগ্রাহী পূর্ণ যোগের মূল সূত্র।

আত্মা হলো বিশ্বগত অস্তিত্বের শীর্ষ স্বরূপ, জড়দেহ হলো তার নিচেকার ভিত্তিস্বরূপ, আর মন হলো এই দুইএর সংযোগরজ্জু। আত্মা থাকে গুপ্ত-ভাবে লুক্কায়িত, তাকে করতে হবে প্রকাশিত; মন আর দেহ এই দুই মাধ্যমের দ্বারা সে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে। আত্মা হলো যোগেশ্বরের প্রতিরূপ; মন আর দেহ এই দুটি উপায়স্বরূপ তিনি আমাদের দিয়েছেন, যার ভিতর দিয়ে তাঁর সেই প্রতিরূপকে বাহ্য অস্তিত্বের মধ্যে প্রকাশ করা যাবে। সর্ব প্রকৃতি হলো সেই লুক্কায়িত সত্যকে উত্তরোত্তর ব্যক্ত করবার প্রচেষ্টা, সেই দিব্য প্রতিরূপ উত্তরোত্তর আরো সার্থকভাবে যাতে রূপায়িত হয়ে উঠতে পারে।

১। পূর্ণযোগের লক্ষ্য

আধ্যাত্মিক বিবর্তন

জগতে এমন যুগ ছিল যখন অন্ততপক্ষে কোনো কোনো দেশের সভ্যতায় আধ্যাত্মিক সিদ্ধির জন্য প্রবল ভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণ করার খুবই প্রচলন ছিল এবং সর্বত্রই এ বিষয়ে অনুশীলন হতো, যা এখনকার অপেক্ষা অথবা গত

কয়েক শতাব্দীর মধ্যে যতটা দেখা যায় তার অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। কিন্তু এখন আবার নতুন ক'রে এ প্রচেষ্টার ধারা বেড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে, এবং অতীতে যে পর্যন্ত পৌছেছিল তার থেকে শুরু ক'রে আরো উচ্চতর ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে উঠতে চাইছে। কিন্তু তথাপি বরাবরই, এমন কি বৈদিক যুগেও অথবা মিশরের বহু অতীত যুগেও, আধ্যাত্মিক সিদ্ধি বা গুহ্য জ্ঞানের অধিকার মাত্র কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সমগ্র সাধারণের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়েনি। সাধারণভাবে মানবজাতি বিবর্তিত হয়ে চলেছে মন্থর গতিতে পর্যায়ক্রমে তার সকল স্তরের ভিতর দিয়ে, প্রথমে স্থূলমানুষ ও প্রাণময় মানুষ থেকে ক্রমে মনোময় মানুষ পর্যন্ত। তার ভিতর থেকে অল্প কয়েকজনই বেড়া ডিঙিয়ে এগিয়ে এসে গুহ্য ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার খুলে বিবর্তনের গতিকে আরো ত্বরান্বিত ক'রে দিতে মনোময় মানুষ থেকে তার আরো উপরে উঠে আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক সত্তায় পরিণত হবার জন্য রাস্তা প্রস্তুত ক'রে দিয়েছে। কখনো কখনো এই অল্প সংখ্যক মনীষীদের প্রভাব খুবই প্রবল হয়ে উঠেছে, যেমন বৈদিক ভারতে, মিশরে বা কিংবদন্তী অনুযায়ী অ্যাটল্যান্টিসে, এবং তাতে জাতীয় সভ্যতার উপর আধ্যাত্মিক বা মিষ্টিক ভাবধারার সুস্পষ্ট ছাপ পড়ে গেছে ; কখনো বা তারা পৃথক হয়ে গিয়ে গোপনে নিজেদের সম্প্রদায়ের বা সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছে, যাতে স্থানীয় সাধারণ সভ্যতা তার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে আপন স্থূল অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের মধ্যেই নিমজ্জিত থেকে কেবল পার্থিব জ্ঞানালোকের অনুসরণ ক'রে সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিবর্তন চক্রের গতি সর্বদা উপরদিকেই থাকে, কিন্তু তা ঘুরে ঘুরেই ওঠে, সোজা উপরে ওঠেনা। তাই এই গতিচক্রের ধারা দেখে মনে হয় যে এর মধ্যে বুঝি উত্থান পতন আছে, কিন্তু ওর মধ্যে যা আসল কথা তা এই যে বিবর্তনের পথে যতটা লব্ধ হলো তা থেকে যায়, কিংবা সাময়িকভাবে যদিও তা ঢাকা পড়ে যায় তথাপি আবার কালক্রমে নবযুগের উপযোগী ভাবে নূতন আকারে তা পুনঃপ্রকাশ করে।

এই সৃষ্টি অতিমানস থেকে সম্ভূত হয়ে ধাপে ধাপে একেবারে জড় পর্যন্ত নীচে নেমে গেছে, এবং তার প্রত্যেক ধাপেই তদুপযোগী জগতের বা রাজ্যের বা স্তরের বা অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তাই এই বস্তুজগতের সৃষ্টির বেলাতে সেই মহাচেতনাকে নীচে নেমে এসে আপাতদৃষ্ট নিশ্চেতনার মধ্যে

নিমজ্জিত হতে হয়েছে। এখন আবার সেই নিশ্চেতনার ভিতর থেকে বেরিয়ে ধাপে ধাপে ক্রমশ উপরে উঠতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আধ্যাত্মিকের ও অতিমানসের চূড়াতে পৌছে তার শক্তিকে এই জড়ের মধ্যে অভিব্যক্ত করতে না পারে। কিন্তু এই নিশ্চেতনার মধ্যেও এক গোপন চেতনা রয়েছে যা কাজ ক'রে যাচ্ছে, এবং এ কথা বলা যেতে পারে যে সে কাজ করছে তার নিজস্ব একরূপ নিবর্তিত ও লুক্কায়িত বোধির দ্বারা। জড়ের প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে, জীবনেরও প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে সেই গোপন বোধি অবস্থানুযায়ী তৎপরতা নিয়ে যবনিকার আড়াল থেকে কাজ করে, সৃষ্টিশক্তির যখন যেমন দরকার পড়ছে তাই বুঝে। জড়ের মধ্যে যে বোধি আছে তা বস্তুজগতের তাবৎ সকল ক্রিয়াকে বিধৃত ক'রে আছে, ইলেক্ট্রন থেকে শুরু করে সূর্য ও গ্রহাদি পর্যন্ত, এবং তারও ভিতরকার সব কিছুতে। তেমনি জীবনের মধ্যে যে বোধি আছে তা জড়দেহস্থ জীবনের ক্রিয়াকে উন্নতিকল্পে নয়ন্ত্রিত ক'রে চলেছে, এবং তারই ফলে মন হয়েছে বিবর্তিত, যার বাহন হয়েছে মানুষ। আবার এই মানুষের মধ্যেও তার উন্নয়নমুখী সৃষ্টিক্রিয়া চলেছে —সেখানেও তার উন্নয়নের অবস্থানুযায়ী ভিতরে ভিতরে সেই বোধির বিকাশ হচ্ছে। এমন কি বোধির অস্তিত্বকে বা প্রাধান্যকে যে অস্বীকার করে এমন একজন গোঁড়া বিজ্ঞানীও তার পিছনে মানসিক বোধি না থাকলে এক পা অগ্রসর হতে পারে না, কোনদিকে অগ্রসর হবে বা কখন কি করবে তা ঠিক করতে পারে না। সুতরাং সব কিছুর গোড়াতেও আছে বোধি, মাঝখানেও আছে বোধি, আর পরিণতিতেও আছে বোধি।

কিন্তু এই বোধি কেবল তখনই তার নিজস্ব স্বরূপ নিতে পারে, যখন তুমি তোমার মনের রাজ্যকে ছাড়িয়ে আধ্যাত্মিকের রাজ্যে গিয়ে ওঠো। তখনই সে তার যবনিকার অন্তরাল থেকে সামনে বেরিয়ে আসে এবং তার যথার্থ প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে সুপ্রকাশ করে। মানুষের এই মনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরো একরূপ বিবর্তনের প্রাথমিক ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে যার দ্বারা আধ্যাত্মিকের ও অতিমানসিক সত্তার অবস্থাকে প্রস্তুত ক'রে তোলা যাবে এর কাজ দুটি ধারা নিয়েছিল, এক হলো প্রকৃতির মধ্যে এবং আমাদের বস্তু জগতের পক্ষে অজানা অন্যান্য জগতের ও স্তরের মধ্যে গোপনে অবস্থিত যে গুহ্য শক্তিগুলি রয়েছে তার আবিষ্কার, এবং দ্বিতীয়ত মানুষের ভিতরকার আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তার আবিষ্কার। অ্যাটলান্টিসের সম্বন্ধে কিংবদন্তীগুলি যদি সত্য হয়

হলে সেখানে তখন গুহ্য জ্ঞানের চূড়ান্ত উন্নতি ঘটেছিল, তার পর আর
ধিক অগ্রসর হতে পারেনি। আর ভারতে বৈদিক যুগে দ্বিতীয় প্রকার
াবিষ্কারের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আত্মাবিষ্কারের যথেষ্ট নজির রয়েছে, গুহ্য
ানের দিকটা তার কাছে ছিল গৌণ। এমন কথা আমরা বলতে পারি
় ভারতে তখন বোধির রাজ্যের যুগই প্রথমে আসে, তার পরের যুগের
ানুষদের বুদ্ধিমূলক মন তার থেকে পরবর্তী দর্শন ও বিজ্ঞান গড়ে তোলে।
কন্তু এটা বোঝা যায় যে তখনকার সাধারণ লোকেরা সম্পূর্ণ বাস্তবের
রেই অবস্থান করত। তারা বাস্তব প্রকৃতিরই প্রতিরূপ হিসাবে নানা
দবতাদের আরাধনা করত, তাদের কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব রকমেরই অভিষ্টলাভ
কামনা করত। বৈদিক ঋষিরা তাদের সাধনার ফলে অন্তর্দৃষ্টি ও শ্রুতি ও
অনুভূতির শক্তির দ্বারা ভিতরকার যে সব তথ্যের সন্ধান পেয়েছিল, সেগুলি
সাধারণ জনগণের কাছ থেকে গোপন রাখা হতো, কেবল নির্দিষ্ট রকমের
দ্রষ্টা ও জ্ঞানীদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকত—আর তারা এই গোপনীয়তাকে
বরাবরই সযত্নে পরিপোষণ করত। আধ্যাত্মিকের স্তরে বোধির এমন অপূর্ব
বিকাশ নিশ্চয়ই তার পূর্বেকার সঞ্চিত জ্ঞানধারা থেকে এমন দ্রুতবেগে
পুনারাবির্ভূত হতে পেরেছিল। ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস বিশ্লেষণ
করলে দেখা যাবে যে সেই বোধিমূলক জ্ঞান ঐরূপ চূড়ান্তে উঠে যাবার
পরে নীচে নেমে এসে নীচেকার স্তরের বিবর্তিত চেতনাকে তার অন্তর্ভুক্ত
ক'রে নিতে চেষ্টা করেছে, যাতে চূড়ান্তের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তার
যোগস্থাপনা ঘটতে পারে। তাই বৈদিক যুগের পরেই বুদ্ধিগত দর্শনাদির বহু
অভ্যুদয় ঘটতে দেখা গেল, যা সেই আধ্যাত্মিক সত্যকেই ভিত্তি ক'রে নবতর-
ভাবে সেই চূড়ান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করেছে,—তা বৈদিক ঋষিদের মতো
সরাসরি বোধির দ্বারা বা গুহ্য অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা নয়, কিন্তু মনের বুদ্ধিমূলক ও
ভাবমূলক যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তার দ্বারা। সেই সঙ্গে যোগ পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হলো
যাতে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের জন্য চিন্তক মনকেই প্রয়োগ করা হতো এবং
সেই সঙ্গে মনকেও অধ্যাত্মগত ক'রে ফেলা হতো। তার পর থেকে চলল
দর্শনের ও যোগ প্রণালীর উন্নতির যুগ, যখন সিদ্ধিলাভের জন্য উত্তরোত্তর
ভাবপ্রবণ ও সৌন্দর্যবোধক সত্তাকে হৃদয়ানুভূতির ভিতর দিয়ে সাধনায় নিযুক্ত
করা হতে থাকল, মানুষের ভাবময় স্তরকে অধ্যাত্মের স্তরে নিয়ে যাবার জন্য।
এর সঙ্গে দেখা দিল তান্ত্রিক ও অন্যান্য পদ্ধতি, যাতে মনের ইচ্ছা, প্রাণের

ইচ্ছা ও স্নায়বিক ইচ্ছাকেও এককালে অধ্যাত্মকরণের যন্ত্রস্বরূপ ও ক্ষেত্রস্বরূপ ক'রে নেওয়া হতো। হঠযোগ প্রভৃতির দ্বারা দেহকে দিব্যত্বলাভ করাবার চেষ্টার মধ্যেও ঐ একই রকমের সিদ্ধিলাভের প্রয়াস দেখা যায় জীবন্ত জড়-দেহ সম্পর্কে; কিন্তু দেহের ভিতরকার আত্মার যে কতটা শক্তি ও কি তার নিজস্ব প্রণালী তার আবিষ্কার বাকী থেকে যায়। যাই হোক আমরা এখন বলতে পারি যে বিশ্বগত মহাচেতনা জড়ের মধ্যে নেমে আসার পরে দুটি ধারা নিয়ে তার বিবর্তনের কাজ চালিয়েছে, এক হলো আরোহণের দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মাকে আবিষ্কারের অভিমুখে, অন্যটি হলো অবতরণের দ্বারা পূর্ববিবর্তিত মন প্রাণ দেহের ভিতর দিয়ে এসে ঐগুলির মধ্যেও অধ্যাত্ম চেতনাকে নামিয়ে আনা, এবং এই উপায়ে বিশ্বসৃষ্টির কোনো নিগূঢ় অভিপ্রায়কে সার্থক করা। আমাদের যোগ হলো মূলতঃ ঐ ধারাকেই চুম্বকভাবে সমন্বিত ও সম্পূর্ণ ক'রে নেওয়া, যাতে অতিমানস স্তরের যথাসম্ভব সর্বোচ্চ চূড়াতে উঠে সেখানকার শক্তি ও চেতনাকে প্রাণ মন দেহের স্তরে নামিয়ে আনা যায়।

এখনকার দিনের সভ্যতার ব্যবস্থা হলো বস্তুতান্ত্রিক, ও তার সঙ্গে বুদ্ধিকে ও প্রাণ-প্রচেষ্টাকে কেবল বাহের দিকে নিয়োগ, যা তোমাদের কাছে এমন পীড়াদায়ক বোধ হতে থাকে। কিন্তু এরূপ অবস্থান্তর ঘটা হয়তো অপরিহার্য ছিল। কারণ মন প্রাণ দেহের অধ্যাত্মকরণ ও এই স্থূল দেহের বস্তুময় চেতনার মধ্যেই আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করা যদি কাম্য হয়, তাহলে এমন এক যুগ আসা দরকার ছিল যখন জড়বস্তু ও জড়জীবনকেই সবচেয়ে প্রাধান্য দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে এই বাস্তব অস্তিত্বের ভিতরকার প্রকৃত সত্য আবিষ্কারের দিকেই নিযুক্ত রাখতে হয়। এক দিকে সব কিছুকে ও এমন কি বুদ্ধিকে পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে বস্তুগত ক'রে ফেলাতে আধ্যাত্মিক সাধকের পক্ষে তা পীড়াদায়ক বোধ হচ্ছে, কিন্তু অন্যদিকে এই লাভ হয়েছে যে আমাদের জড়জীবনকে একটা গুরুত্বপূর্ণ মূল্য দেওয়া হচ্ছে যা আগেকার আধ্যাত্মিকতার মধ্যে অস্বীকার করা হয়ে আসছিল। এখন আধ্যাত্মিক সাধনাতেও এই জড়জীবনকে তার অন্তর্গত ক'রে নেবার দরকার হচ্ছে, তাতে পার্থিব চেতনার মধ্যে বিবর্তনের জন্য আধ্যাত্মিক চেতনার নেমে আসার পক্ষে সাহায্য হচ্ছে। এর চেয়ে বেশি আমরা কিছু দাবি করতে পারি না; বর্তমান অবস্থার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে মানুষের ভিতরকার

আধ্যাত্মিকতাকে প্রায় চেপে মারা হয়েছে ; কিন্তু এবার এই দুই বিপরীতের ঠোকাঠুকিতে এবং উপরের প্রভাব তার উপর এসে পড়লে তখন যা গড়ে উঠবে তা হবে প্রকৃত আধ্যাত্মিক।

অতিমানসিক বিবর্তনের উদ্দেশ্য

আমরা যে কাজ করছি তাতে যদি সফল হই, তাহলে তা হবে একটা আরম্ভ মাত্র, সমাপ্তি নয়। পৃথিবীতে এক নব চেতনার ভিত্তিস্থাপন— যে চেতনার অতঃপর অসংখ্য প্রকার অভিব্যক্তির সম্ভাবনা থাকবে।...

যদি উদ্দেশ্য হতো জড়দেহের আবরণীর ভিতর থেকে আত্মাকে উদ্ধার ক'রে আনা, তাহলে তার জন্য অতিমানস-করণের কোনো প্রয়োজন ছিল না। আধ্যাত্মিক মুক্তি ও নির্বাণই হতো তার পক্ষে যথেষ্ট। যদি উদ্দেশ্য হতো অতিভৌতিকের স্তরে উঠে যাওয়া, তবে তার জন্যও অতিমানস-করণের প্রয়োজন ছিল না। যে কোনো স্বর্গের দেবতার প্রতি নিবিষ্ট ভক্তি সাধনের দ্বারা সেই স্বর্গে উঠে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে বিশেষ অগ্রগতি হয় না। ঐ সকল উপরের জগতের প্রত্যেকটি হলো বিশিষ্ট ধরনের, তার ধারা এবং সেখানকার স্থায়ী নিয়মকানুন তদনুযায়ী সুনির্দিষ্ট। কিন্তু ক্রমোন্নত বিবর্তনের ক্রিয়া হতে পারে কেবল এই পৃথিবীতে, সুতরাং পৃথিবীই হলো অগ্রগতির কাজের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র। অন্যান্য জগতের সত্তারা এক জগৎ থেকে অন্য জগতে গিয়ে উঠতে পারেনা। যে যার নির্দিষ্ট জগতে চিরস্থায়ী হয়েই থাকে।

খাঁটী অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বলবেন যে সকলই ব্রহ্ম, জীবন একটা স্বপ্ন মাত্র, অনস্তিত্বমূলক, কেবল ব্রহ্মের অস্তিত্বই সত্য। তুমি যখন মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করবে তখন কেবল দেহপাত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বাঁচবে—তার পরে জীবন বলতে কিছুই আর থাকবেনা।

তারা রূপান্তরে বিশ্বাস করেনা, কারণ মনপ্রাণ দেহ মায়া মাত্র, ভ্রান্তি,— কেবল সত্য বস্তু আসলে হলো নিরাকার নিঃসম্পর্কীয় আত্মা বা ব্রহ্ম। জীবন হলো একটা আপেক্ষিক সম্বন্ধযুক্ত ব্যাপার ; বিশুদ্ধ আত্মার মধ্যে জীবন ও তার সম্বন্ধ সবই লোপ পায়। এমন মায়ার বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়ে লাভ কি আছে, যতই রূপান্তর ঘটাও তবুতো সে মায়া ছাড়া অন্য কিছুই হবার নয়? ওদের কাছে 'নির্বাণের জীবন' বলে কিছু নেই।

কেবল অল্প কয়েকটি যোগ আছে যাতে কোনোরূপ রূপান্তর চায়, কেবল অজ্ঞানতা হতে জ্ঞানে রূপান্তর ছাড়া। তাতে আবার আদর্শের বিভিন্নতা আছে—কখনো বা চাওয়া হয় দিব্য জ্ঞান বা শক্তি, কিংবা দিব্য বিশুদ্ধি বা নৈতিক বিশুদ্ধি, বা দিব্য প্রেম।

আমাদের আসল কাজ হলো অজ্ঞানের প্রতিকূলতাকে দূর করা, যাতে প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন হতে দিতে চায়না। তাকে যদি হটিয়ে দেওয়া যায়, তখন আর পূর্বোক্ত প্রাচীন ঐ সব আদর্শের দ্বারা কিছুমাত্র আটকাবেনা।

রূপান্তরের যোগ

রূপান্তর বলতে আমি কেবল প্রকৃতির কিছু পরিবর্তন এমন অর্থ করছিনা —যেমন সাধু পুণ্যাত্মা হওয়া বা নৈতিক চরিত্রের শুদ্ধি বা যোগসিদ্ধি (তান্ত্রিকের মতো) বা চিন্ময় দেহ প্রাপ্তি—এসব আমি চাইছিনা। রূপান্তর শব্দটি আমি ব্যবহার করি এক বিশিষ্ট অর্থে,—ওতে চেতনার এমন বিশিষ্ট রকমে সমগ্র ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হবে যাতে সমগ্র সত্তার বৃহত্তর ও উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিবর্তন সুনিশ্চিতরূপে অনেকখানি এগিয়ে যাবে, এবং স্থূল পশু জগতে প্রথম যখন মনযুক্ত প্রাণী আবির্ভূত হয়েছিল তখন যেমন পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার চেয়ে আরো বৃহৎ ভাবের ও ব্যাপক ভাবের ও সম্পূর্ণভাবের এই পরিবর্তন ঘটতে পারবে। এর চেয়ে কম যদি কিছু হয় কিংবা অন্তত পক্ষে যদি ঐরূপ ভিত্তিতে তার প্রকৃত সূচনাও না ঘটে, যদি ঐরূপ পরিণতির দিকে কিছু মৌলিক রকমের অগ্রগতি না হয়, তাহলে আমার এই রূপান্তরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেনা। কোনো আংশিক রকমের সিদ্ধি লাভ, যা মিশ্রিত ধরনের ও অনিশ্চিত ভাবের জিনিস, তেমন কিছুতে আমার জীবন ও যোগ সম্বন্ধে যা দাবি তা মিটবেনা।

সিদ্ধির আলোকপ্রাপ্তি ও চেতনার অবতরণ এক জিনিস নয়। সিদ্ধি-লাভ হলেই যে তার সঙ্গে সমগ্র সত্তার রূপান্তরও হবে এমন কথা নয়; ওতে কেবল হয়তো চেতনার উচ্চ অবস্থাতে কিছু উন্মীলন বা উন্নয়ন বা বিস্তার লাভ হয় যাতে পুরুষ-অংশের কিছু উপলব্ধি আসে, কিন্তু প্রকৃতি-অংশ প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে যায়। আধ্যাত্মিক চেতনার চূড়ান্তে উঠে হয়তো উপলব্ধির দীপ্তিলাভ কিছু ঘটে কিন্তু নীচেকার অংশগুলি যা ছিল তাই থেকে

যায়। আমি এর বহু বহু দৃষ্টান্ত দেখেছি। সেই আলো কেবল মনেতে বা তার খানিকটা অংশের মধ্যে নেমে এলেই চলবেনা, কিন্তু স্থূলদেহে পর্যন্ত এবং তারও নীচে পর্যন্ত সমগ্র সত্তার মধ্যে নেমে আসা চাই, তবেই প্রকৃত রূপান্তর হবে। কেবল মনের মধ্যে আলো এলে তাতে হয়তো মনেরই বা তার কিছু অংশের কোনোরূপ একটা আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু তাতে প্রাণপ্রকৃতি কিছু বদলাবে না ; আবার প্রাণের মধ্যে সেই আলো এলে হয়তো প্রাণেরই ক্রিয়াগুলির বিশুদ্ধতর ব্যাপ্তি হবে অথবা প্রাণময় সত্তা নীরব নিশ্চল সুস্থির হতে পারবে, কিন্তু দেহ ও তার দেহচেতনা যেমন ছিল তেমনি থাকবে, কিংবা এমন কি তা অসাড়বৎ হয়ে যেতে পারে বা তার ভারসাম্য বিগ্‌ড়ে যেতে পারে। আর কেবল আলো নেমে আসাই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে সমগ্র উচ্চতর চেতনা এবং তার শান্তি, শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ সবই আসা চাই। তদ্ভিন্ন এমনও হতে পারে যে সেই জিনিসের অবতরণে তুমি মুক্তি লাভ করলে বটে, কিন্তু তবু নির্দোষ ভাবে পরিণতি লাভ করলেনা, অথবা তোমার আভ্যন্তরীণ সত্তায় সমূহ পরিবর্তন এনে দিলে কিন্তু বাহ্য সত্তা রয়ে গেল অশুদ্ধ যন্ত্রের মতো, যা অপটু বা অসুস্থ বা বিকাশে অক্ষম। শেষ কথা, সাধনার দ্বারা রূপান্তর আসা কখনো সম্পূর্ণ হয়না, যতক্ষণ পর্যন্ত সত্তাটি অতিমানসপ্রাপ্ত হতে না পারছে। কেবল চৈত্যচেতনাপ্রাপ্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়, তা শুধু আরম্ভ মাত্র ; এমন কি অধ্যাত্মগত হওয়া এবং উচ্চতর চেতনা নেমে আসাও যথেষ্ট নয়, তাও মধ্য অবস্থা মাত্র ; অন্তিম সিদ্ধিতে পৌঁছতে অতিমানস চেতনা ও শক্তির ক্রিয়া অবশ্য প্রয়োজন। তার চেয়ে কম কিছু ব্যক্তিগত ভাবে কারো হয়তো যথেষ্ট মনে হতে পারে, কিন্তু পার্থিব চেতনার যে সুনিশ্চিত অগ্রগতি হওয়া প্রয়োজন তার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

আমার যোগ যে সকল দিক দিয়ে একটা আন্‌কোরা নতুন জিনিস এ কথা আমি কখনই বলিনি। আমি একে 'পূর্ণ যোগ' বলি এই কারণে যে এর মধ্যে প্রাচীন বহু প্রকার যোগ পদ্ধতির সার জিনিসগুলিকে একত্রে সম্মিলিত ক'রে সব দিকের পূরণ করে নেওয়া হয়েছে—এর যা নূতনত্ব তা কেবল এর লক্ষ্য সম্বন্ধে, এর মতলবের এবং এর প্রণালীর সমগ্রতার দিক দিয়ে।···

প্রাচীন যোগ পদ্ধতিগুলির সঙ্গে তুলনায় এর যা নূতনত্ব তা এই—

(১) যেহেতু এই যোগ জগৎ সংসার ও জীবনকে বর্জন ক'রে উপরের স্বর্গে উঠে যেতে বা নির্বাণে চলে যেতে চায়না, এতে চায় জীবনের ও

অস্তিত্বের একটা পরিবর্তন আনতে এবং তা গৌণভাবে নয়, তাই হলো এর কেন্দ্রগত ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। অন্যান্য যোগে যদিও ঊর্ধ্ব চেতনার ঐ ধরনের একটা অবতরণ ঘটে যায়, তথাপি তা হবে উচ্চে আরোহণেরই একটা পরবর্তী ফলস্বরূপ—সেখানে আরোহণটাই থাকবে মুখ্য কথা। আর এই যোগে সেই আরোহণ হবে প্রথম ধাপ, কেবল ঐ চেতনার পরবর্তী অবতরণের উপায় স্বরূপ। প্রথমে আরোহণের দ্বারা নূতন চেতনাকে আয়ত্ত ক'রে তাকে পরে নামিয়ে আনা, তাই হলো এই যোগের সাধনার মুখ্য এবং চরম কথা। এমন কি তন্ত্র এবং বৈষ্ণব ধর্মও চেয়েছে জীবন্মুক্তি; এর বেলাতে কিন্তু চাই জীবনেরই দিব্য পরিণতি ও পূর্ণতা।

(২) যেহেতু এর কাম্য উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত কারণে ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভ নয়, কিন্তু পার্থিব চেতনার কিছু উন্নয়ন, যা তোমারই বিশ্বাতীতে উঠে যাওয়া নয়, কিন্তু যাতে হবে সমূহ বিশ্বগত উন্নতি। এর দ্বারা অতিমানস শক্তিকে এখানে এমন সক্রিয় ও সুস্থায়ী ভাবে পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে এনে ফেলা হবে যা কখনই হয়নি, এমন কি আধ্যাত্মিক জীবনেও হয়নি, এবং তা হবে সরাসরি ভাবে কার্যকরী।

(৩) যেহেতু ঐ লক্ষ্যে পৌছতে এমন এক উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে যার শেষ ফলও যেমন সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ তার পদ্ধতিও তেমনি সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ, অর্থাৎ চেতনার ও প্রকৃতির সমূহ পরিবর্তন, এবং যাতে প্রাচীন পদ্ধতি গুলির সবেরই সাহায্য নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা আংশিক ক্রিয়ারূপে ও অন্যান্য বিশিষ্ট রকমের মুখ্য ক্রিয়াগুলিকে সাহায্য দানেরই জন্য। মোটের উপর এই পদ্ধতি বা অনুরূপ কোনো পদ্ধতি কখনও পূর্বেকাব কোনো যোগে নির্দেশিত বা অনুসৃত হয়েছে বলে আমি জানিনা। তা যদি দেখতাম তাহলে এই ত্রিশ বছর ধরে আমাদের এ পথ কেটে সৃষ্টি ক'রে নেবার জন্য বৃথা সময় নষ্ট না ক'রে অতি সহজে কদম চালে সেই আগেকার রচিত পথ ধরে সোজা আমার লক্ষ্যে গিয়ে পৌছে যেতাম, যদি তেমন কোনো পথ আগের থেকে পরিকল্পিত হয়ে গড়ে পিটে পীচঢালা মসৃণ হয়ে সুনির্দিষ্ট ও সাধারণগম্য হয়ে থাকত। আমাদের এ যোগ কোনো প্রাচীন পথকে অনুসরণ ক'রে চলা নয়, নতুন রকম এক আধ্যাত্মিক অভিযান।

অধ্যাত্মকরণ ও অতিমানসিক রূপান্তর

আধ্যাত্মিক সিদ্ধি ও অতিমানস প্রাপ্তি যদি এক জিনিস হতো, যেমন আমার পাঠকেরা ভেবে থাকে বলছ, তাহলে আগেকার যুগযুগান্তরের যত সাধু ও ভক্ত ও যোগী ও সাধকেরা সকলেই হয়ে যেতো অতিমানসিক সত্তা, আর তাহলে আমি এতাবৎ অতিমানস নিয়ে যা কিছু লিখেছি সবই হতো অনাবশ্যক বাহুল্যমাত্র আর অনর্থক। তাহলে যে কেউ আধ্যাত্মিক অনুভূতি পেতো সেই হয়ে যেতো অতিমানস সত্তা; এই আশ্রমটি তাহলে তো অতিমানস সত্তায় ভরে যেতোই, আর ভারতে অন্যান্য যত আশ্রম আছে সেখানেও তাই হতো। আধ্যাত্মিক অনুভূতি আভ্যন্তরীণ চেতনাতে স্থায়ী হয়ে তাকে বদলে দিতে পারে, ইচ্ছা হলে তাকে রূপান্তরিতও করতে পারে; সর্বময় ব্রহ্ম, সব কিছুর মধ্যে আত্মা ও আত্মার মধ্যে সব কিছু, বিশ্বময়ী শক্তির দ্বারাই সব কিছু ঘটছে,—এ সমস্তই উপলব্ধি হতে পারে। তুমি বিশ্ব আত্মার মধ্যে মিশেও যেতে পারো, কিংবা চরম ভক্তি বা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে পারো। কিন্তু তবুও তোমার বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে বুদ্ধি কিংবা বড় জোর বোধিগত মন তার চিন্তার কাজ ক'রে যাবে, মন ক'রে যাবে তার ইচ্ছার কাজ, প্রাণময় সত্তায় চলতে থাকবে দুঃখ সুখের অনুভব, দৈহিক সংগ্রামের ফলে কষ্টভোগ ও রোগ ও মৃত্যু কাজ ক'রে যাবে যথানিয়মে। কেবল এইটুকু পরিবর্তন আসবে যে অন্তরাত্মা এই সব লক্ষ্য করতে পারবে নিজে অবিচল থেকে, এবং পূর্ণ সমতার ভাব নিয়ে। কিন্তু এগুলিকে প্রকৃতির অপরিহার্য অংশস্বরূপ বলেই জানবে। অন্ততপক্ষে যতক্ষণ তুমি ঐ বাহ্য প্রকৃতির ভিতর থেকে আপন আত্মাকে গুটিয়ে না নিচ্ছ ততক্ষণ এগুলি সবই অপরিহার্য হয়ে থাকবে। কিন্তু এমন ধরনের রূপান্তর আমি চাইছি না। আমি যে প্রকার অতিমানসিক রূপান্তর চাই তাতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ জ্ঞানশক্তি, অন্যরূপ ইচ্ছাশক্তি, অন্যরূপ দীপ্তিপূর্ণ ভাবধারা ও সূক্ষ্মবোধ, অন্যরূপ প্রকৃতির দেহচেতনা, এইগুলিই আসা দরকার।

দৈহিক রূপান্তর

শ্রীচৈতন্যের বা রামলিঙ্গমের বেলাতে যাই কেন হয়ে থাক, তাঁদের দৈহিক রূপান্তর যে রকমেরই হোক, তার সঙ্গে দেহের অতিমানসিক রূপান্তরের যে

বিশেষ লক্ষ্য তার কোনো সম্পর্কই নেই। তাঁদের নব দেহপ্রাপ্তি বলতে যা বোঝায় তা স্থূলদেহের নয়, অথবা তা ছিল সূক্ষ্মদেহের, যা পার্থিব জীবনের পক্ষে উপযোগী ছিলনা। তা যদি হতো তাহলে তাঁরা ঐভাবে পৃথিবী থেকে সরে যেতেন না। দেহের অতিমানসিক রূপান্তর আনার উদ্দেশ্য এই যে সেই দেহ এই পার্থিব জীবনে যতক্ষণ থাকবে ততকাল তা পার্থিব দেহের উপযোগী হয়ে থেকে সেইরূপ দেহ-চেতনার বিকাশ করতে থাকবে। এ হবে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক বিবর্তনের এক ধাপ অগ্রগতি, কিন্তু অতিভৌতিক জগতের দিকে উঠে যাবার জন্য নয়। অতিমানস যোগের পক্ষে এইরূপ দৈহিক অতিমানসগত পরিবর্তন আনা সব চেয়ে বেশি কঠিন কাজ, এবং তা নির্ভর করে চেতনার কতখানি পরিবর্তন ঘটলে তবে তা সম্ভব হতে পারে ততখানি বর্তমানে আনতে পারা যায় কিনা তারই উপর, কিন্তু এর যা অগ্রগতির ধারা তা অন্যান্য যোগের লক্ষ্যধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং এ কথা নিয়ে তর্কবিচার ক'রে বিশেষ কোনো লাভ নেই—আগে তোমাকে সাধারণভাবে মন-প্রাণ-দেহগত চেতনাকে যথেষ্ট পরিমাণে অতিমানসগত ক'রে আনতে হবে—তার পরে তখন দেহের অতিমানস রূপান্তরের প্রশ্ন সম্বন্ধে ভাবা যাবে। আগে আসা চাই চৈত্য এবং আধ্যাত্মিক রূপান্তর, তবেই দেহ পর্যন্ত সমগ্র সত্তার অতিমানস রূপান্তর সম্বন্ধে আলোচনা কার্যকরী হবে।

…আমার কাজ কেবল পৃথিবীর ব্যাপার নিয়ে, এর বাইরে আরো যে সব জগৎ আছে তাদের জন্যে কিছু নয়। আমি যা চাই তা এই পৃথিবীরই জন্য অভীষ্টসিদ্ধি, এর বাইরে কোনো সুদূর চূড়ান্তে উড়ে যেতে নয়। অন্যান্য যোগে এই জীবনটাকে বলে মায়া বা ক্ষণিকের খেলা, কেবল অতিমানসের যোগই বলছে যে অভিব্যক্তির ক্রমবিকাশ ঘটাবার জন্যই ভগবান এর সৃষ্টি করেছেন, এবং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো প্রাণ ও দেহকে সম্পূর্ণরূপে সুপরিণতিতে নিয়ে আসা। অতিমানস কথাটির মানে ঋতচেতনা বা সত্যচেতনা ছাড়া কিছুই নয়, এবং তা এখানে নেমে আসা মানে জীবনের মধ্যে তার পুরোপুরি সত্যকে আর মধ্যে তার চেতনার স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করা। অবশ্য তার জন্য তোমাকে সেই সত্যের নাগাল পেতে আরো উচ্চ থেকে উচ্চতর চূড়াতে গিয়ে উঠতে হবে, কিন্তু যতই উপরে উঠবে ততই তাকে নীচে নামিয়ে আনতে পারবে। জীবন আর দেহ এখন যেমন অজ্ঞান, অপূর্ণ ও অশক্ত অবস্থায় রয়েছে, চিরকালই যে তাই থাকতে হবে এমন হতে পারেনা;

কিন্তু আরো পূর্ণতর প্রাণশক্তি ও দেহশক্তি লাভ করাকে একটা আনন্দবর্জিত ও উষ্ণতাবর্জিত অবাঞ্ছিত আলাদা কিছু মনে করবারই বা কি কারণ আছে? এখনকার অবস্থার দেহপ্রাণ যতদূর পর্যন্ত আনন্দ পেতে পারে, তা প্রাণ মনের বা স্নায়ুগুলির বা কোষগুলির একটা সীমাবদ্ধ সাময়িক উত্তেজনা মাত্রই হয়ে থাকে, যা অপূর্ণ জিনিস, আর ক্ষণিকের মধ্যেই তা বিলীন হয়ে যায়; কিন্তু অতিমানসিক পরিবর্তন এলে তখন যাবতীয় সমস্ত কোষগুলি, সমস্ত স্নায়ুগুলি, সমস্ত প্রাণ ও মনের শক্তিগুলি তার চেয়ে সহস্রগুণ আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকবে, সে আনন্দের তীব্রতা অবর্ণনীয়, এবং তা বিলীন হবার জিনিস নয়… অতিমানসিক প্রেম মানে আত্মার সঙ্গে আত্মার, মনের সঙ্গে মনের, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের একটা সুগভীর মিলন, এবং তাতে দেহচেতনা হবে একত্ববোধের বাস্তব অনুভূতিতে ওতপ্রোত, সে তখন তার পরম প্রিয়কে দেহের প্রত্যেক অংশে ও প্রতি কোষে প্রত্যক্ষরূপে উপস্থিত বোধ করতে থাকবে।

পূর্ণযোগের সর্বসমন্বিত প্রণালী

……এ যোগ কেবল ভক্তিযোগই নয়; একে পূর্ণযোগ বলা হয় এই কারণে যে এতে সমগ্র সত্তার সকল অংশই ভগবানের দিকে পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকবে। অতএব এর মধ্যে ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও থাকবে এবং কর্মও থাকবে, তার সঙ্গে থাকবে প্রকৃতির সম্যক পরিবর্তন এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তির আকিঞ্চন, যাতে তোমার সমগ্র প্রকৃতিটাই ভগবানের প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে। কেবল হৃদয়েরই বদলে গিয়ে ভগবানের দিকে ফেরা নয়, কিন্তু মনেরও তাই হওয়া চাই,—সুতরাং সেক্ষেত্রে জ্ঞানেরও দরকার, এবং কর্ম করার ও সৃষ্টি করার ইচ্ছা এবং শক্তিও দরকার—অতএব কর্মেরও প্রয়োজন রয়েছে। তাই এই যোগে অন্যান্য যোগের নানারূপ পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে —যেমন এই পুরুষ-প্রকৃতি, কিন্তু তফাৎ এই যে এর অন্তিম উদ্দেশ্য হলো স্বতন্ত্র। পুরুষ পৃথক থাকবে প্রকৃতি হতে, কিন্তু তাকে পরিত্যাগ করতে নয়, নিজেকে এবং প্রকৃতিকে জানতে, প্রকৃতির ক্রীড়নক হয়ে না থেকে তার জ্ঞাতা ও প্রভু ও ধারক হয়ে থাকতে; এবং তাছাড়া তাই হবার পরেও তার সব কিছুকে ভগবানে সমর্পণ করে দিতে হবে। তুমি তোমার সাধনার কাজ শুরু করতে পারো জ্ঞান থেকেই হোক বা কর্ম থেকেই হোক বা ভক্তি থেকেই হোক, বা

আত্মশুদ্ধির তপস্যা থেকেই হোক (প্রকৃতির পরিবর্তন), এবং তার পরে বাকী সব কিছুকে একে একে এনে ফেলতে পারো অথবা, একসঙ্গে সবগুলির দিক থেকেই অগ্রসর হতে পারো। সকলের জন্য একই নিয়ম নয়, সেটা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষ ও প্রকৃতিবিশেষের উপর। এই যোগের আসল শক্তি হলো সমর্পণ, কিন্তু এই সমর্পণ উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধিত হওয়া চাই; গোড়া থেকেই পুরো সমর্পণ সম্ভব হয় না, কেবল সত্তার মধ্যে পুরো সমর্পণের সংকল্পই থাকে, কিন্তু তা সার্থক হতে সময় লাগে; তথাপি সমর্পণ সম্পূর্ণ হয়ে উঠলে তবেই সাধনাতে পূর্ণ বেগ আসা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে থাকা চাই নিজের ব্যক্তিগত প্রয়াস ও সেই সঙ্গে উত্তরোত্তর সমর্পণের বাস্তবতা বৃদ্ধি। এখানে ভাগবতী শক্তিকে আবাহন করা দরকার হয়, এবং সে শক্তি সত্তার মধ্যে একবার আসতে শুরু করলে তখন সে প্রথমে তোমার ব্যক্তিগত প্রয়াসকে সমর্থন দিতে থাকে, তার পরে ক্রমশ সমগ্র সাধনার ভার নিজের হাতে নিয়ে নেয়, কিন্তু সেখানেও সাধকের তাতে নিত্য সক্রিয় অনুমোদন থাকা দরকার। সেই শক্তি যখন কাজ শুরু করে দেয় তখন সাধকের পক্ষে আরো যা কিছু করা দরকার সেগুলিও সে করিয়ে নেয়, যেমন জ্ঞানের কাজ, ভক্তির কাজ, আধ্যাত্মিক ক্রিয়া, প্রকৃতির রূপান্তরের ক্রিয়া। এ কথা মনে করা ভুল যে সবগুলিকে একত্রে মিলিয়ে নিয়ে কিছু করা যেতে পারে না।

মুক্তি ও রূপান্তর

চৈত্য সিদ্ধিতে এই ফল হয় যে প্রকৃতির চৈত্য পরিবর্তন ঘটে, বিশুদ্ধীকৃত হয়ে তা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের দিকে নিয়োজিত হয়। তার পরে বা তার সঙ্গে সঙ্গে আসে বিশ্ব আত্মার উপলব্ধি। প্রাচীন যোগে এই দুইটি ছিল অভিপ্রেতের মধ্যে এবং এরই ভিতর দিয়ে তারা মোক্ষে বা নির্বাণে অথবা অন্য কোনোরূপ স্বর্গীয় পরাৎপরে গিয়ে পৌছত। এখানকার এই পূর্ণ যোগে সেই মুক্তি ও পরাৎপরে উঠে যাওয়া দুইই আছে, কিন্তু এতে মুক্তি বা কোনোরূপ নির্বাণ যাই এসে পড়ুক, তাই হবে আমাদের পক্ষে প্রথম ধাপ, সিদ্ধির চূড়ান্ত ধাপ নয়। পরাৎপরের দিকে উঠে যাওয়া যেমনই ঘটুক, তার সঙ্গে হওয়া চাই সেখানকার শক্তি, আলো ও চেতনা যা অর্জিত হয়েছে তাকে নিয়ে নেমে আসা, এবং সেই নেমে আসার দ্বারাই এখানকার আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক রূপান্তর সাধিত হবে।

পূর্ণযোগ ও জীবন

জীবন হলো দিব্য অভিব্যক্তির ক্ষেত্র যা এখনও অপূর্ণ; এখানেই, এই জীবনে, এই পৃথিবীতে, এই দেহে—উপনিষদের ভাষাতে যাকে জোর ক'রে বলা হয়েছে 'ইহইব'—এখানেই সেই পরম দেবতাকে আমাদের আবরণমুক্ত করতে হবে; এখানেই তার পরাৎপর মহিমাকে, তার জ্যোতি ও মাধুর্যকে আমাদের চেতনার কাছে বাস্তব ক'রে তোলা চাই, তাকে আয়ত্তাধীন করা চাই, এবং যতদূর সাধ্য তাকে সপ্রকাশ করা চাই। অতএব এই যোগে আমরা জীবনকে মেনে নেবো তাকে অবস্থান্তরিত ক'রে নেবারই জন্য; তাতে যদি আমাদের সংগ্রামের বিঘ্নবিপদের মাত্রা আরো বেড়ে যায় তথাপি তাতে পরাঙ্মুখ হওয়া আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। তার প্রতিফল এই মিলবে যে আমাদের পথ যদিও খুব বন্ধুর, যদিও আমাদের প্রচেষ্টা হবে আরো জটিল ও ব্যর্থতাময় ও দুঃসাধ্য, তথাপি একটা ঘাঁটি পার হয়ে গেলে তখন প্রচুর সুবিধা মিলবে। কারণ মন একবার কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে স্থির হয়ে গেলে এবং ইচ্ছাবৃত্তি ঐ একমাত্র প্রয়াসে একাগ্র হয়ে গেলে, তখন জীবনই হবে আমাদের সহায়ক। তখন একাগ্র, সতর্ক ও পূর্ণচেতন হয়ে তার প্রত্যেকটি ক্রিয়াকেই আমাদের ভিতরকার অগ্নিতে যজ্ঞাহুতি দিতে পারব। বিজয়ী হয়ে তখন আমরা স্বয়ং পৃথিবীকেই আমাদের পরিণতিতে সাহায্য করতে বাধ্য করব এবং বিরোধী শক্তির কাছ থেকে সিদ্ধির জয়মাল্য ছিনিয়ে আনব।

* * *

ভারতে ফিরে আসার পর থেকে আমার জীবন ও আমার যোগ দুইই ছিল ইহজগতের ও জগতান্তরের, কেবল একদিকের একরোখা জিনিস কোনোটাই ছিলনা। মানব স্বার্থ কেবল ইহজগৎ সম্পর্কেই কাজ করে, এবং তার অধিকাংশই আমারও মানসক্ষেত্রে স্থান পেয়েছিল, এবং কিছু কিছু জীবনেও অবশ্য স্থান পেয়েছিল, যেমন রাজনীতি,—কিন্তু বোম্বাই এপোলো বন্দরে নেমে দেশের মাটিতে পা দেবার পর থেকেই আমি আধ্যাত্মিক অনুভূতি পেতে শুরু করলাম। তথাপি তা ইহজগৎ ছাড়া নয়, বরং তার মধ্যে একটা সুগভীর ও সীমাতীত তাৎপর্য ছিল, আমি বোধ করতে থাকলাম যে অনন্তই এখানে সর্বত্র ছেয়ে আছে, আর সেই অন্তর্বাসী সকল বস্তু ও সকল দেহের মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে এও আমি দেখলাম যে আমি অতি-

ভৌতিক জগতের স্তরে প্রবেশ ক'রে সেখানকার প্রভাব এই বাস্তবের স্তরে এনে ফেলছি, সুতরাং আমি যাকে বলেছি অস্তিত্বের দুই প্রান্ত এবং তার মাঝামাঝি যা কিছু আছে, তার মধ্যে কোনো বিশেষ আড়াল দেওয়া পার্থক্য বা অকাট্য বিরোধ বোধ করিনি। আমার কাছে সবই ব্রহ্ম এবং সর্বত্রই আমি ভগবানকে দেখি। অবশ্য প্রত্যেকেরই ইহজগৎকে বর্জন ক'রে কেবল উহজগৎকে গ্রহণ করার অধিকার আছে, তাতে যদি সে শান্তি পায় সেটা তার পক্ষে ভালোই কথা। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলব যে শান্তি লাভের জন্য আমি কখনো সেরূপ করার প্রয়োজন বোধ করিনি। আমার যোগে আমি দুই রকমের জগৎকেই—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগৎ ও বাস্তবের জগৎ—আমার স্বীকৃতির অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েছি, এবং চেষ্টা করেছি যাতে দিব্য চেতনা ও দিব্য শক্তি মানুষের হৃদয়ে ও পার্থিব জীবনেও হতে পারে সুপ্রতিষ্ঠ, এবং তা আমার ব্যক্তিগত মুক্তির কারণে নয়, কিন্তু এখানের জগতে দিব্য জীবনের আবির্ভাবের জন্য। একেই আমি সবচেয়ে বড়ো আধ্যাত্মিক লক্ষ্য বলে মনে করি, এবং আমার এই জীবন যে পার্থিব জিনিসকে ও পার্থিব কর্মগুলিকেও তার কর্তব্যসীমার মধ্যে স্থান দিয়েছে, তার জন্য যে আমার আধ্যাত্মিকতা কিছু ক্ষুন্ন হয়েছে কিংবা তার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়েছে এমন আমার মনে হয় না। অন্ততপক্ষে এই আমার অভিমত এবং সত্য সম্বন্ধে ও জগৎপ্রকৃতি সম্বন্ধে ও পরমেশ্বর সম্বন্ধে এই আমার অনুভূতি; ঐগুলিকে নিয়েই পূর্ণ সত্য, তাই বলে যতদুর সম্ভব আমার জানা আছে, তাই পূর্ণযোগ সম্বন্ধে ওগুলিকে একত্রে নিয়েই আমি যা কিছু বলেছি।...পরম ঈশ্বরকে উপলব্ধি করাই অবশ্য আসল কথা; কিন্তু প্রেম ভক্তি ও আত্মনিবেদনের সঙ্গে তাঁকে আকিঞ্চন করা, কর্মের দ্বারা তাঁর সেবা করা, ও জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জানা, বুদ্ধির দ্বারা জানা নয় কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুভূতি দিয়ে জানা, এগুলিও পূর্ণযোগের সাধনার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

* * * *

দিব্যত্ব প্রাপ্তি মানে যা কিছু মানবীয়তার বিনাশ সাধন নয়; ওর অর্থ হলো সেগুলিকে বরং হাতে নিয়ে তারই পূর্ণতার দিকে পথ প্রদর্শন করা পূর্ণ শক্তিতে ও আনন্দে ওগুলিকে বিশুদ্ধ ও সুপরিণত ক'রে তোলা, তার মানে সমগ্র পার্থিব জীবনকে পূর্ণ শক্তিতে ও আনন্দে উন্নীত ক'রে আনা।...

জীবনের দিব্যত্ব মানে বস্তুত বৃহত্তর একটা জীবনশিল্প ; এখনকার এই অহং ও অজ্ঞানতা দিয়ে গড়া যে জীবনশিল্প তা অপেক্ষাকৃত হীন ও স্থূল ও অপূর্ণ জিনিস (যেমন নিম্ন ধরনের শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্য সৃষ্টিতে হয়ে থাকে, যা তবুও সাধারণ মানুষের মন প্রাণের কাছে চিত্তাকর্ষক বলে বোধ হয়),—এবং কেবল চৈত্য ও আধ্যাত্মিক উন্মীলন ও বিশুদ্ধীকরণের দ্বারাই সুমার্জিত সেই পূর্ণতায় উপনীত হওয়া যায়। তেমন হওয়া যেতে পারে যদি দিব্যের আলোক ও অগ্নিধারার মধ্যে জীবনকে নিমজ্জিত করে দিতে পারো, যাতে ওর সমস্ত খাদগুলো পুড়ে ও ঝরে গিয়ে আসল ধাতুটি বেরিয়ে পড়তে পারে।

শ্রীঅরবিন্দের পন্থা ও অন্যান্য পন্থা

…আমার নিজের যোগের প্রথম বাস্তব ফল এই হলো যে আমি একেবারে নির্বাণে পৌছে গেলাম। হঠাৎ আমাকে তা এমন উচ্চ অবস্থাতে উঠিয়ে নিয়ে গেল যেখানে কোনো চিন্তা মাত্র নেই, মনের বা প্রাণের কোনো ক্রিয়াই নেই ; অহংবোধ কিছু রইল না, জগতের বাস্তবতা রইল না—অসাড় ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়ে যা দেখা গেল তা যেন সেই নীরবতার মধ্যে শূন্য আকৃতিময় এক জগৎ, যেন চারিদিকে অন্তঃসারবিহীন সব ছায়া ছায়া মূর্তি। সেখানে একও নেই বহুও নেই, কেবল সম্পূর্ণরূপে তাইই যা নিরাকার নিঃসম্পর্কীয়, শুধুই তাই যা অবর্ণনীয়, অভাবনীয়, অথচ চরমতম রূপে একমাত্র বাস্তবের অপেক্ষা বাস্তব। এটা মনের উপলব্ধি নয় কিংবা উপরে কোথাও কিছু নজরে দেখতে পাওয়াও নয়—অথচ বিবিক্ত কিছু নয়—সম্পূর্ণ ইতিবাচক ও একমাত্র জলজ্যান্ত বাস্তব—যদিও তা স্থানজোড়া স্থূল জগতের মতো জিনিস নয়, যা সর্বত্রই ঘিরে থেকে সব কিছুকে ডুবিয়ে নিয়ে অবস্থান করছে, নিজেকে ছাড়া অন্য কিছুকে স্থান মাত্র দেয়না, অন্য কোনো কিছুকে বাস্তব বা সার জিনিস বলে মনে হতে দেয়না। এ অনুভূতির মধ্যে যে কিছু উল্লাস বা হর্ষবোধ ছিল তাও বলতে পারিনা—(অনির্বচনীয় যে আনন্দ আমি পেয়েছিলাম তা অনেক বছর পরে)—কিন্তু ওতে পেলাম এক অব্যক্ত রকমের শান্তি, এক সুগভীর স্তব্ধতা, এক অপরিসীম নিষ্কৃতি ও মুক্তি। এই নির্বাণের অবস্থাতে আমি অহোরাত্র অবস্থান ক'রে যাচ্ছি, তার কিছুকাল পর থেকে ওর মধ্যে কিছু অদলবদল ঘটতে থাকল, তথাপি ওর আভ্যন্তর

অনুভূতি ও নিত্য স্মৃতি ও পুনরায় ফিরে আসার অবস্থা রয়ে গেল, অবশেষে ওটা ঘুচে গিয়ে উপর থেকে আরো উচ্চতর অতিচেতনা আসতে শুরু করল। ইতিমধ্যে উপলব্ধির পর উপলব্ধি এসে প্রথম আদি অনুভূতির সঙ্গে মিশে যেতে থাকল। প্রথম দিকে যে মায়াময় জগতের ভাবটা এসেছিল, সেটা বদলে গিয়ে এখন কেবল বাইরে বাইরে তাই 'গৌণভাবে' রইল বটে, কিন্তু তাব পিছনে প্রতিভাত হলো এক বিরাট ও পরমতম দিব্য বাস্তবতা, উপরেও সেই পরমতম বাস্তবতা, আর যাকে প্রথমে মনে হতো শূন্য ছায়া-বাজির মতো তার অন্তরেও সেই সুগভীর দিব্য বাস্তবতা। আর এগুলি ইন্দ্রিয়াদির পুনর্বদ্ধ অবস্থায় পতন হয়ে বা সেই চবম অনুভূতি হ্রাস পেয়ে জানা নয়, এগুলি হলো সেই সত্যের আরো স্পষ্টতব অধিকতর বিকাশ ও বিস্তারের আকারে ; এইসব যা কিছু দেখছিল যে, সে আমার ইন্দ্রিয়াদি নয়, দেখছিল আমার অন্তরাত্মা, আর অনন্তের ভিতরকার শান্তি ও নীরবতা ও মুক্তি সর্বক্ষণই বর্তমান ছিল এই জগতের বা সর্ব জগতের সঙ্গে পরম ব্রহ্মেব কালাতীত চিরন্তন ও বিরামবিহীন একত্বেব অবস্থার স্বরূপে।

এখন এই হলো আমার মায়াবাদ মেনে নেবার পক্ষে আসল মুশকিলেব কথা। আমার মুক্ত চেতনাতে নির্বাণ এসে আমার আরো বেশি উপলব্ধিব বরং সূত্রপাতই ক'রে দিলে, তা হলো একটা পূর্ণতর জিনিসেব প্রথম ধাপ মাত্র, তা প্রকৃত যথাসম্ভব সিদ্ধিও নয় বা শেষ চবম সিদ্ধিও নয়। সেই নির্বাণের অবস্থা আমার না-চাওয়াতেই এসেছিল, যদিও তাকে সৌভাগ্যই বলব। অন্ততপক্ষে ও সম্বন্ধে আগের থেকে আমার কোনো ধাবণাই ছিলনা, কোনো আস্পৃহাও ছিলনা, বরং ছিল বিপরীত রকমেব কিছু আস্পৃহা, আমি চেয়েছিলাম কিছু আধ্যাত্মিক শক্তি যাতে জগতের সাহায্যকল্পে আমি আমাব নির্দিষ্টকরা কাজগুলো সম্পন্ন করতে পাবি,—তথাপি ঐ জিনিস এসে পড়ল একেবারে না কিছু জানিয়ে, বা 'আমি কি আসতে পাবি' বলে কোনো অনুমতিমাত্র না নিয়ে। এমন ভাবে এসে কায়েমি হয়ে বসল যেন চিরদিনেব জন্যই রয়ে গেল, অথবা চিরদিন থেকেই ছিল। তারপরে তা ক্রমশ ক্রমশ না কমে আগের অবস্থার চেয়ে আরো বেশি বেড়ে যেতেই থাকল। তাহলে এ ক্ষেত্রে আমি কেমন ক'রে মায়াবাদকে মেনে নিই, কিংবা শংকরেব যুক্তিকে অতিক্রম ক'রে যে সত্য বাস্তবিক আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তার বিরুদ্ধে যাই?

…এই যোগ বিশ্বময় অস্তিত্বের মূল্য স্বীকার করে, এবং তাকে বাস্তব বলেই মানে ; এর লক্ষ্য হলো উচ্চতর ঋত চেতনাতে বা দিব্য অতিমানস চেতনাতে প্রবেশ করা, যাতে কর্ম ও সৃষ্টিকে অজ্ঞানতা ও অপূর্ণতার মায়া-বিকাশমাত্র বলার পরিবর্তে বলব যে তা হলো সত্যের এবং দিব্যজ্যোতির এবং দিব্য আনন্দেরই সত্যবিকাশ। কিন্তু সেই উচ্চতর চেতনাতে যাবার জন্য অবশ্য প্রয়োজন এই অনিত্য মন প্রাণ দেহের একান্ত সমর্পণ, কারণ এই মর-মানবের পক্ষে নিজের চেষ্টাতে তার মনকে ছাড়িয়ে অতিমানস চেতনাতে উঠতে পারা অতীব দুষ্কর, কারণ সেই চেতনার ক্রিয়াগতি মনের অধিকারের সীমার ভিতরকার জিনিসই নয়, তার শক্তি ওর চেয়ে সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। তাই যাবা ঐরূপ পরিবর্তনের জন্য উপরের আহ্বানকে শুনবে এবং মানবে, তারাই আসতে পারবে এই যোগের পথে।

ভগবান সম্বন্ধে পুরোপুরি মনোভাব

পূর্ণ যোগের জন্য প্রয়াস করার আগে প্রথমেই ভগবান,—যিনি স্বয়ংপূর্ণ ও সর্বপূর্ণ, তাঁর সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করা সবিশেষ দরকার। হৃদয়ের মধ্যে এমন আস্পৃহা জাগা চাই যার কোনোরকম সংকীর্ণ সীমা থাকবেনা, যা সেইরূপ পূর্ণতাকে উপলব্ধি করার মতো যথেষ্ট প্রশস্ত হবে। এখানে কেবল কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মমত বা দৃষ্টিভঙ্গীই নয়, কিন্তু সকল রকম একতরফা দার্শনিক ধারণাকেও বর্জন করতে হবে—যা সেই অনির্বচনীয়কে একটা কোনো নির্দিষ্ট মানসিক সূত্রের মধ্যে বেঁধে রাখে। আমাদের যোগের পক্ষে সবচেয়ে কার্যকরী ও জোরদার এই ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে যে, সেই অনন্ত সত্তা চেতনভাবে একাধারে সর্ববিধৃত এবং সর্বোত্তীর্ণ। আমরা এই দেখব যে তিনি এক ও অদ্বিতীয় সর্বমুক্ত সর্বশক্তিমান সর্বসম্পূর্ণ সদানন্দময় অনন্ত, এবং সেই এক ও অনন্তের মধ্যে বহুবিধ সকল প্রাণীই জীবিত থেকে ঘোরাফেরা করছে, এবং তার ভিতর দিয়ে সকলেই শেষে মিলে গিয়ে সেই এক হয়ে দাঁড়াবে। সেই শাশ্বত তাঁর আত্মবিকাশের জন্য ও আত্মাকে আপন স্পর্শদানের জন্য ব্যক্তিও হতে পারেন, নির্ব্যক্তিকও হতে পারেন। যেহেতু তিনি চেতন ঈশ্বর সেহেতু তিনি ব্যক্তি, এক অসীম ব্যক্তি যিনি তাঁর নিজের কিছু অংশের খণ্ডে খণ্ডে ভাঙা প্রতিরূপকে সারা বিশ্বের দিব্য ও

অদিব্য অসংখ্য ব্যক্তিসত্তার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ তিনি নির্ব্যক্তিক, যেহেতু আমাদের কাছে তিনি এক অনন্তস্বরূপ সৎ চিৎ ও আনন্দ, আব যেহেতু তিনি সকল অস্তিত্বের ও সকল শক্তির আদি উৎস ও ভিত্তি ও মূল উপাদান—বস্তুত আমাদের সত্তার ও মন প্রাণ দেহের ও আত্মার ও জড়বস্তুর একমাত্র উপাদানই তাই। তাঁকে নিয়ে একাগ্র রকমে ভাবতে গিয়ে আমাদের কেবল বুদ্ধির দ্বারাই বোঝা চলবেনা যে তিনি আছেন, অথবা যুক্তির দিক দিয়ে প্রয়োজন হিসাবে তাঁকে একটা কিছু নিছক বিবিক্ত রকমের বস্তু বলেও ধরে নেওয়া চলবেনা, সে চিন্তা হওয়া চাই দৃষ্টিপূর্ণ, যে তাঁকে দেখবে এখানে সকলের মধ্যে অন্তর্বাসী রূপে, নিজেদের মধ্যেও তাঁকে বোধ করতে থাকবে, তাঁরই শক্তিগুলি যে সকল কাজই ক'রে যাচ্ছে তা লক্ষ্য করতে এবং বারে বারে তাই প্রত্যক্ষ ধরে ফেলতে থাকবে। তিনিই হলেন একমাত্র অস্তিত্ব, তিনিই হলেন আদি ও মৌলিক বিশ্বানন্দ যা সব কিছুর মধ্যে থেকেও সব কিছুকে উত্তীর্ণ হয়ে আছে, তিনিই হলেন একমাত্র অনন্ত চেতনা যার থেকে সকল চেতনাই উদ্ভূত ও তাদের সকল ক্রিয়াই সম্পাদিত; তিনিই একমাত্র সীমাশূন্য সত্তা যার দ্বারা সকল কর্ম ও সকল অনুভূতি বিধৃত; তাঁরই ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণে সকল জিনিসের বিবর্তনক্রিয়া এগিয়ে চলেছে যা এখনও অপ্রকাশিত কিন্তু এক অপরিহার্য পরিপূর্ণতা ও লক্ষ্যের দিকেই যাচ্ছে। আমাদের হৃদয় তাঁরই কাছে আত্মনিবেদিত হতে পাবে, পরমতম প্রিয় জ্ঞানে তাঁরই দিকে ঝুঁকতে পারে, প্রেমের বিশ্বময় মাধুবী ও আনন্দের জীবন্ত জলধি জ্ঞানে তাঁরই মধ্যে নিরন্তর স্পন্দিত হতে পাবে। কারণ তাঁরই সেই নিগূঢ় আনন্দ আত্মাকে তার সকল অনুভূতির মধ্যে পোষণ করছে এবং এমন কি আমাদের ভ্রান্ত অহংকেও তার সকল পরীক্ষা ও সকল সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বাঁচিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সকল দুঃখ ও কষ্টভোগের পালা থেমে না যায়। তাঁর প্রেম ও আনন্দ হলো সেই অনন্ত ও দিব্য মহাপ্রেমিকের দান, যিনি সকলকেই তাদেব আপন আপন পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর নিজের হর্ষপূর্ণ একত্বের মধ্যে। তাঁরই অদৃশ্য শক্তি পথ দেখিয়ে যে নিয়ে যাচ্ছে তাঁরই ইচ্ছা পূরণের দিকে আমাদের ইচ্ছাশক্তির উৎস হয়ে, এ বিশ্বাসে আমাদের ইচ্ছা অবিচল ভাবে লেগে থাকতে পারে। সেই সম্পাদক শক্তির স্বয়ংদীপ্ত নির্ব্যক্তিক তেজের মধ্যে সকল সাফল্যই বিধৃত আছে, কিন্তু তা ধীরে ধীরে কাজ ক'রে যাচ্ছে যতক্ষণ

না তা সুসম্পন্ন হয়; আর ব্যক্তিরূপে তিনি হলেন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান যোগেশ্বর, যাঁকে কোনো কিছুতেই তাঁর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া থেকে নিবারণ করতে পারেনা। এই বিশ্বাসটি নিয়েই সাধককে তার সাধনার কাজ শুরু করতে হবে; কারণ তার সব কিছু প্রয়াসের মধ্যে, আর বিশেষ ক'রে তার সেই অদৃশ্যের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টার মধ্যে মানুষকে একমাত্র এই বিশ্বাসকে সম্বল করেই অগ্রসর হতে হবে। যখন আসবে উপলব্ধি ও সিদ্ধি তখনই সেই বিশ্বাস হবে সার্থক ও সুসম্পূর্ণ, তখন তা জ্ঞানের এক চিরন্তন শিখায় রূপান্তরিত হয়ে সর্বক্ষণ জ্বলতে থাকবে।

যোগের পথে আলো

আমাদের এখানে যোগের যে পথ অনুসরণ করা হয় তার উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য যোগ থেকে অন্যপ্রকার—সে উদ্দেশ্য যে কেবল সাধারণ অজ্ঞানময় পার্থিব চেতনা থেকে দিব্য চেতনাতে উন্নীত হওয়া তাই নয়, কিন্তু তা ছাড়াও উদ্দেশ্য সেই দিব্য চেতনার অতিমানস শক্তিকে আমাদের মন প্রাণ দেহের অজ্ঞানতার মধ্যে নামিয়ে আনা, যাতে সেগুলি রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, এবং ভগবানকে এখানে অভিব্যক্ত করা, যাতে জড়ের মধ্যে দিব্যজীবন সৃষ্টিলাভ করে। অতএব এই যোগও অতীব কঠিন এবং এর উদ্দেশ্যও অতীব কঠিন, অনেকের বা অধিকাংশের কাছেই এটা অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। সাধারণ অজ্ঞানময় জগৎ-চেতনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত সকল শক্তিই এর বিরোধী, এবং একে কোনো আমল না দিয়ে ওরূপ চেষ্টাকে বরং তারা নিবারণই করতে থাকবে, সুতরাং এর সাধক তার আপন মন প্রাণ দেহের মধ্যে এর সাফল্যের বিরুদ্ধে অতি দুস্তর রকমের বাধাবিঘ্নই অনুভব করতে থাকবে। কিন্তু তুমি যদি এ আদর্শকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারো, যদি সকল রকমের বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারো, অতীতের সকল বন্ধনকে পিছনে ফেলে রেখে এই দিব্য সম্ভাবনাকে সফল করবার জন্য সব কিছুকে পরিত্যাগ করতে ও সকল রকমের ঝুঁকি নিতে পারো, তাহলে যে তুমি আপন অনুভূতির দ্বারা ভিতরকার সত্যকে নিশ্চয় আবিষ্কার করবে এটা অবশ্যই আশা করতে পারো।

এ যোগের সাধনাতে কোনো মানসিক শিক্ষাপ্রণালীর ভিতর দিয়ে কিংবা বিধিবদ্ধ কোনো ধ্যানের দ্বারা বা মন্ত্রের দ্বারা কিংবা অন্য কোনো নির্দিষ্ট

উপায়ের দ্বারা অগ্রসর হতে হয়না, কেবল চাই আস্পৃহা। চাই ভিতরের দিকে বা উপরের দিকে একাগ্র আত্মনিবিষ্টতা, আমাদের উপরিস্থ দিব্যশক্তি ও তার ক্রিয়াগুলির প্রভাব গ্রহণের দিকে আত্মোন্মীলন, হৃদয়ের মধ্যে ভগবৎ উপস্থিতিকে নিত্যবোধ করা, ও এইগুলির পরিপন্থী সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান করা। এরূপ আত্মোন্মীলন আসবে কেবল নিজের বিশ্বাস ও আস্পৃহা ও সমর্পণের ফলে।

* * *

এখানে সৃষ্টি হতে বাকী রয়েছে কেবল অতিমানসের, অর্থাৎ দিব্য সত্যকে এই পৃথিবীতে নামিয়ে আনার, কেবল মন ও প্রাণের মধ্যেই নয় কিন্তু স্থূলদেহ এবং জড়ের মধ্যেও। আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে অহংএর আরো বেশি প্রসারের দ্বারা সকলরকম 'সীমাগুলি' ঘুচে যাক, কিংবা মানব মনের অহংকেন্দ্রিক প্রাণশক্তির সকল কামনা ও কল্পনাকে আরো সফল করবার জন্য অপরিমিত অবকাশ ও ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত ক'রে দেওয়া হোক। আমরা কেউই আপন 'খুশিমতো' কাজ করতে এখানে আসিনি, অথবা এমন কোনো জগতের সৃষ্টি করতে আসিনি যেখানে অবশেষে আমরা নিজের ইচ্ছামত সকল কাজই করতে পারব; আমরা এখানে আছি বস্তুত ভগবৎ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে এবং এমন জগতের সৃষ্টি করতে যেখানে ভগবৎ ইচ্ছা মানুষের অজ্ঞানতার দ্বারা বিকৃত ও বিফল না হয়ে ও প্রাণগত কামনার দ্বারা বিপরীতার্থ না হয়ে আপন খাঁটী সত্যকেই পুরো অভিব্যক্ত করতে পারে। অতিমানস যোগের সাধককে যে কাজ করতে হবে সে তার নিজের কাজ নয়, যার উপর সে তার নিজের শর্তগুলিকে আরোপ করতে পারে, সে কাজ কেবল ভগবানের এবং তাঁরই শর্ত অনুযায়ী। আমাদের যোগ আমাদের নিজের জন্য নয়, এ যোগ ভগবানের জন্য। এতে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি চাইব না, অর্থাৎ ব্যক্তিগত অহংকে সকল সীমা ও সকল বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে প্রকাশ করতে চাইব না, আমরা চাইব যে ভগবানের অভিব্যক্তি সম্যক প্রকাশিত হোক। আমাদের নিজের আধ্যাত্মিক মুক্তি ও অপূর্ণতার পূরণ তারই ফলস্বরূপ ও তারই একটা অংশমাত্র হবে, কিন্তু তা কোনো অহংকেন্দ্রিক স্বার্থপূরণের দিক থেকে নয়। মুক্তি, সিদ্ধি, পূর্ণতালাভ, কোনোটাই আমাদের নিজের জন্য নয়, সবই হবে ভগবানের জন্য।

* * *

এই যোগ করা মানে কেবল ভগবানকে উপলব্ধি করাই নয়, কিন্তু সকল ভাবে বাহ্য ও আভ্যন্তর জীবনকেও সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত ও পরিবর্তিত ক'রে আনা, যাতে তা দিব্য চেতনাকে অভিব্যক্ত করবার ও দিব্য কর্মে অংশগ্রহণ করবার উপযোগী হতে পারে। অর্থাৎ এতে এমন আভ্যন্তরীণ নিয়মানুশীলনের দরকার যা নৈতিক ও শারীরিক আত্মসংযমাদির কঠোরতা সাধনের চেয়ে আরো অনেক বেশি কঠোর ও কষ্টসাধ্য। এ যোগের পথ অন্যান্য অধিকাংশ যোগের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক ও ক্লেশজনক, সুতরাং যে জন চৈত্যের সুস্পষ্ট ডাক না শুনেছে এবং শেষ অবধি চলে যেতে প্রস্তুত না হয়েছে তার পক্ষে এ পথে প্রবেশ করাই উচিত নয়।

* * *

আগেকার যোগে চাওয়া হতো আত্মার মুক্তির অনুভূতি এবং ভগবানের সঙ্গে সাযুজ্য অর্থাৎ এক হয়ে যাওয়া। তাতে প্রকৃতির পরিবর্তন ততটাই দরকার হতো যাতে তা ঐ জ্ঞান ও অনুভূতি লাভের পক্ষে অন্তরায় না হয়। দেহ পর্যন্ত সমগ্র সত্তার আমূল পরিবর্তন খুব কমই চাওয়া হতো এবং তাও 'সিদ্ধি' হিসাবে ছাড়া আর কিছু নয়। পার্থিব চেতনার মধ্যে একটা নতুন প্রকৃতি দেখা দিক এ উদ্দেশ্য একেবারেই ছিলনা।

* * *

জীবন্ত জড়াধারের মধ্যে মনোময় যে মানব সত্তা, তার সমগ্র চেতনাকেই আরো উপরে উঠে উচ্চতর এক চেতনার সঙ্গে মিলিত হতে হবে ; আর সেই উচ্চতর চেতনাকেও নীচে নেমে আসতে হবে মন প্রাণ দেহ ও জড়ের মধ্যে। তবে মাঝখানের বাধার বেড়াগুলো ঘুচবে, এবং উচ্চ চেতনা সমগ্র নিম্ন প্রকৃতিকে নিয়ে অতিমানস শক্তির দ্বারা তার রূপান্তর ঘটাবে।

এই পৃথিবী হলো বিবর্তনের বাস্তব ক্ষেত্র। এখানকার পার্থিব চেতনার মধ্যে মূলতঃ মন, প্রাণ, অতিমানস, সচ্চিদানন্দ সবই আছে নিবর্তিত হয়ে ; তার থেকে প্রথমে কেবল জড়ই গঠন পেলে ; তার পরে প্রাণের স্তর থেকে সেখানে প্রাণ নেমে এসে সেই জড়ের মধ্যে জীবনের সূত্রপাত ক'রে সেখানে জীবন্তের আকৃতি এনে জীবনক্রিয়া শুরু ক'রে দিলে, যার ফলে সৃষ্টি হলো উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলের ; তার পরে মনের স্তর থেকে নেমে এলো মন, যার

ফলে মনোময় মানবের সৃষ্টি হলো। এবার নেমে আসবে অতিমানস, যার ফলে নতুন এক অতিমানস জাতির সৃষ্টি হবে।

*   *   *

ক্ষণচিন্তা ও ক্ষণদৃষ্টির কণিকা

জানার গণ্ডী যখন পার হবো, তখন পাবো জ্ঞান। যুক্তি তখন ছিল সহায়ক; কিন্তু যুক্তি এখন প্রতিবন্ধক।

ইচ্ছা করবার গণ্ডী যখন পার হবো, তখন পাবো শক্তি। ইচ্ছার প্রয়াস তখন ছিল সহায়ক; সে প্রয়াস এখন প্রতিবন্ধক।

ভুক্তির গণ্ডী যখন পার হবো, তখন পাবো আনন্দ। কামনা তখন ছিল সহায়ক; কামনা এখন প্রতিবন্ধক।

ব্যক্তিত্ব প্রকাশের গণ্ডী যখন পার হবো, তখন হবো খাঁটী ব্যক্তি। অহং তখন ছিল সহায়ক; অহং এখন প্রতিবন্ধক।

মানুষ-জাতীয়-পশুর গণ্ডী যখন পার হবো, তখন হবো প্রকৃত মানুষ। পশুত্ব তখন ছিল সহায়ক; পশুত্ব এখন প্রতিবন্ধক।

যুক্তিবৃত্তিকে রূপান্তরিত করো বোধিবৃত্তিতে; তোমার সমস্তটাই আলো হয়ে উঠুক। এই হোক তোমার লক্ষ্য।

চেষ্টাকৃত প্রয়াসকে রূপান্তরিত করো আত্মাশক্তির সহজ ও স্বতঃউৎসারিত প্লাবনে; তোমার সম্পূর্ণটাই হয়ে যাক এক সচেতন শক্তি। এই হোক তোমার লক্ষ্য।

উপভোগ সুখকে রূপান্তরিত করো এক সরল ও অহেতুক হর্ষানন্দে; তোমার সম্পূর্ণটাই হয়ে যাক আনন্দময়। এই হোক তোমার লক্ষ্য।

তোমার টুকরো টুকরো ব্যক্তিত্বকে রূপান্তরিত করো এক জগৎব্যক্তিত্বে; তোমার সম্পূর্ণটাই দিব্য হয়ে উঠুক। এই হোক তোমার লক্ষ্য।

তোমার ব্যক্তি-পশুকে রূপান্তরিত করো রাখালিয়া পশু-চারকে; তোমার সম্পূর্ণটাই কৃষ্ণ হয়ে যাক। এই হোক তোমার লক্ষ্য।

*   *   *

প্রথমে নিজের মধ্যে নিজের সম্বন্ধে চেতন হও, তার পরে চিন্তা করো ও কাজ করো। জীবন্ত চিন্তা মাত্রই হলো এক প্রস্তুতির জগৎ; প্রকৃত কাজ

মাত্রই হলো কোনো চিন্তার অভিব্যক্তি। এই বাস্তব জগতের যে অস্তিত্ব রয়েছে, তার কারণ ভগবানের আত্মচেতনার মধ্যে প্রথমে একটি ভাব উঠে তার এইরূপই লীলা শুরু করেছিল।

অস্তিত্বের ভিতরে চিন্তা অবশ্য প্রয়োজন নয় বা তার নিমিত্তও নয়, কিন্তু সম্ভূতির পক্ষে চিন্তাই হলো যন্ত্র স্বরূপ; আমি নিজেকে যেমন দেখি তেমনই হয়ে দাঁড়াই। চিন্তা আমার কাছে যেমন প্রস্তাব করে তাই আমি করতে পারি; চিন্তা আমার মধ্যে যেমন ছবি তুলে ধরে তাই আমি হতে পারি। মানুষের নিজের সম্বন্ধে এ বিশ্বাস অটুট থাকা চাই, কারণ তার মধ্যেও ভগবান বাস করছেন।

২। পূর্ণযোগের পন্থা

তিনটি জিনিসের উপর এর সিদ্ধি নির্ভর করবে;

(১) মনের উপরকার ধাপটিতে উঠে যাওয়া ও অন্তরে বিশ্বচেতনার উন্মীলন হওয়া;

(২) চৈত্যের উন্মীলন হওয়া; এবং

(৩) উচ্চতর চেতনা তার শান্তি, আলো, শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি সমেত সত্তার সকল স্তরে ও তার সর্বাপেক্ষা স্থূলের মধ্যেও এসে অবতরণ করা।

এ সব কিছুই হবে মায়ের শক্তির ক্রিয়াতে, তার সঙ্গে থাকবে তোমার আস্পৃহা, ভক্তি ও সমর্পণ। এই হলো পন্থা। বাকী আর যা কিছু তা এরই ক্রিয়াতে সম্পন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু তার জন্য চাই মায়ের শক্তির ক্রিয়ার উপর তোমার একান্ত অটুট আস্থা।

আস্পৃহা, কৃপা ও সমর্পণ

আমাদের প্রচেষ্টার যে সুমহৎ ও সুকঠিন লক্ষ্য, তাকে সফল ক'রে তোলার পক্ষে একত্রে কেবল দুইরূপ শক্তি কাজ করা চাই,—নীচের দিক থেকে চাই সুদৃঢ় আস্পৃহার সুনিশ্চিত আহ্বান, আর উপরের দিক থেকে তাতে পরম ভগবৎ কৃপার সাড়া।

কিন্তু এই পরম কৃপা কেবল আলো এবং সত্যের মধ্যেই কাজ করতে

পারে ; যেখানে অসত্য ও অবিদ্যা তার নিজের শর্ত বজায় রেখে কৃপা পেতে চায়, সেখানে তা কাজ করেনা। কারণ অসত্যের দাবিও যদি তাকে মানতে হয়, তাহ'লে তার আপন উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

সেই আলো এবং সত্যের অবস্থা আনবার জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি তোমাকে পূরণ করতে হবে, তবেই সেখানে সর্বোচ্চ শক্তি অবতরণ করবে, আর সেই সর্বোচ্চ অতিমানস শক্তি উপর থেকে নেমে এসে যদি নীচের দিকের উন্মীলন ঘটায়, তবেই তা এই স্থূল প্রকৃতিকে কবলিত ক'রে তার সকল বাধাবিপত্তিকে সার্থক ভাবে দূর ক'রে দেবে।... এর জন্য চাই ঐকান্তিক ভাবে সম্পূর্ণ সমর্পণ ; দিব্য শক্তির কাছে একান্তভাবে আত্মোদ্ঘাটন করে দেওয়া চাই ; যে সত্য উপর থেকে নেমে আসছে তাকেই পূর্ণভাবে গ্রহণ করা চাই, নিত্য লালন করা চাই, এবং মন-প্রাণ-দেহাধিকারী যে অসত্য শক্তি ও তার স্বরূপগুলি এখনও পার্থিব প্রকৃতির উপর রাজত্ব করছে তাকে নিত্য পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করতে থাকা চাই।

সমর্পণ হওয়া চাই সমগ্রভাবে ও সত্তার সমস্ত অংশগুলি দিয়ে। কেবল যদি চৈত্য তাতে রাজী হয়, আর মনের এবং এমন কি ভিতরকার প্রাণ সত্তারও উচ্চতর অংশগুলি তাতে সায় দিয়ে যায়, আর আভ্যন্তরীণ দেহচেতনাও তার প্রভাব অনুভব করতে থাকে, তাতেও যথেষ্ট হবেনা। সত্তার কোনো অংশে, এমন কি সম্পূর্ণ বাহ্যতর অংশেও এমন কিছু থাকবেনা যা নিজেকে হাতে রেখে দেবে, এমন কিছু থাকবেনা যা সন্দেহের কিংবা প্রতারণার বা ছুতনাতার পিছনে গাঢাকা দিয়ে রইল, ফাঁক পেলেই বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

যদি সত্তার কতক অংশ সমর্পিত হলো আর অন্য একটা অংশ নিজেকে হাতে রেখে দিলে, এবং নিজের মতে চলতে থাকল বা নিজের শর্ত বজায় রাখতে চাইলে, তাহলে যতবারই এমন হচ্ছে ততবার নিজেই তুমি সেই কৃপাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ।

যদি তোমার ভক্তি ও সমর্পণের পিছনে নিজের কিছু কামনাকে এবং অহংএর দাবিকে ও প্রাণের চাহিদাকে আড়াল ক'রে রেখে দাও, যদি তা প্রকৃত আস্পৃহার স্থান অধিকার করে কিন্তু তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থেকে ভাগবতী শক্তিকে তারই দ্বারা প্রভাবিত করতে চায়, তাহলে ভগবৎ কৃপাকে তোমার রূপান্তর ঘটাতে আবাহন করাই বৃথা।

যদি সত্যের দিকে তোমার এক অংশকে বা একটা দিককে উন্মীলিত করে

দাও আর অন্য একটা দিক নিত্যই বিরোধী শক্তিদের জন্য দরজা খুলে দেয়, তাহলে তবুও যে ভগবৎ কৃপা তোমার জন্য আসবে এমন প্রত্যাশা করাই বৃথা। যদি তোমার মন্দিরের মধ্যে জাগ্রত দেবতার উপস্থিতি প্রতিষ্ঠিত করতে চাও তাহলে সেই মন্দিরকে সম্পূর্ণই শুদ্ধ করা চাই।

যদি ভগবৎ শক্তি যতবারই সত্যকে এনে হাজির করতে চাইছে ততবারই তুমি মুখ ফিরিয়ে আবার বিতাড়িত অসত্যগুলোকে ডেকে আনো, তাহলে সেখানে ভগবৎ কৃপার উপর দোষ চাপিয়ে কি লাভ আছে, তোমার নিজেরই ইচ্ছার কপটতা ও নিজেরই সমর্পণের অপূর্ণতা তার জন্য দায়ী হবে।

যদি তুমি সত্যকে চাইতে থাকো তবু তোমার ভিতরকার একটু কিছু অংশ মিথ্যাকেই পছন্দ করে, যা অবিদ্যা ও অদিব্য তাকে একেবারে পরিত্যাগ করতে অরাজী হয়, তাহলে তার আক্রমণের সম্ভাবনা থেকেই গেল, সেখানে ভগবৎ কৃপা তোমার থেকে তফাতেই সরে যাবে। নিজের মধ্যে আগে খুঁজে দেখ কোথায় কি অসত্য বা গোলমেলে জিনিস রয়ে গেছে, এবং তাকে বার বার প্রত্যাখ্যান করতে থাকো, তবেই তোমার মধ্যে রূপান্তর আনতে দিব্যশক্তিকে আহ্বান করতে পারবে।

এমন কথাকে মনেও ঠাঁই দিওনা যে সত্য ও মিথ্যা, আলো এবং অন্ধকার, সমর্পণ এবং স্বার্থপরতা একত্রে থাকতে পারে সেই ঘরে যা ভগবানের নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। যখন রূপান্তর হওয়া চাই পূর্ণ, তখন তার বিরোধী সব কিছুর প্রত্যাখ্যানও হওয়া চাই পূর্ণ।

এমন মিথ্যা ধারণা করা ভুলে যাও যে তুমি যা কিছু চাইবে তাই দিব্যশক্তি তোমার জন্য ক'রে দিতে বাধ্য হবে, এমন কি যদি তাঁর শর্তগুলি তুমি না মানো তবুও। সুতরাং আগে তোমার সমর্পণকে সত্য ও সম্পূর্ণ ক'রে তোলো, তবে তোমার জন্য সব কিছু করা হবে।

এমন ভ্রান্ত ও অলস রকমের প্রত্যাশাও পরিত্যাগ করো যে ভাগবতী শক্তি তোমার হয়ে সমর্পণটাও করিয়ে দেবে। তিনি চান বটে তোমার সমর্পণ, কিন্তু তা কখনো জোর ক'রে আরোপ করেননা; প্রতি মুহূর্তেই তুমি মুক্ত, স্থায়ী রূপান্তর না আসা পর্যন্ত যখনই ইচ্ছা করবে তখনই পথ বদলে ভগবানকে অস্বীকার করতে পারবে কিংবা তোমার আত্মদান ফিরিয়ে নিতে পারবে, অবশ্য তার যা আধ্যাত্মিক পরিণাম তা সইতে যদি রাজী থাকো। সমর্পণ যখন করবে তখন তা তোমার নিজের অর্থ ইচ্ছাকৃত ও সম্পূর্ণ

মুক্তভাবে হওয়া চাই; তিনি তো কোনো অসাড় জড়যন্ত্রের কাছ থেকে সমর্পণ চাননা, তিনি চান একজন জীবন্ত মানুষের জীবন্ত সমর্পণ।

একটা এলে-দেওয়া রকমের নিষ্ক্রিয়তাকে প্রায়ই প্রকৃত সমর্পণ বলে ভুল করা হয়, কিন্তু তেমন নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা আসল কাম্য ও শক্তিশালী জিনিস কিছুই মিলতে পারে না। স্থূল প্রকৃতি যখন ঐরূপ অসাড় ও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, তখনই যত কিছু অদিব্য গোলমেলে প্রভাব তার উপর এসে পড়ে। ভগবৎ শক্তির সার্থক ক্রিয়ার জন্য চাই সক্রিয় স্বচ্ছন্দ ও সুদৃঢ় রকমের অনুকূল আনুগত্য, সত্যের জ্ঞানদীপ্ত ভক্তের স্বেচ্ছাকৃত বাধ্যতা, অসত্য ও তামসের বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ যোদ্ধার সংগ্রাম, ভগবানের বিশ্বস্ত ভৃত্যের সক্রিয় বশ্যতা।

এই হলো প্রকৃত মনোভাব। যারা এরূপ মনোভাব বজায় রাখবে, যারা হাজার ব্যর্থতা ও বিপত্তি সত্ত্বেও অটুট আস্থা রাখবে, তারা সকল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে চরম বিজয়ে ও বৃহৎ রকমের রূপান্তরে গিয়ে পৌছবে।

* * * *

বিশ্বের মধ্যে যা কিছু ঘটছে তার পিছনে ভগবান ক্রিয়া করছেন তাঁর ভাগবতী শক্তির দ্বারা। কিন্তু তিনি আপন যোগমায়ার অন্তরালে থেকে সব কিছু করাচ্ছেন জীবের নিম্ন প্রকৃতির অহংএর মারফতে।

যোগের বেলাতেও তাই, তিনিই সাধক এবং তিনিই সাধনা; তাঁরই ভাগবতী শক্তি তাঁর নিজের আলো, শক্তি, জ্ঞান, চেতনা ও আনন্দ নিয়ে আধারের উপর ক্রিয়া করতে থাকে, এবং সেই আধার যখন ঐগুলির দিকে উন্মীলিত হয়ে যায় তখন তার মধ্যে তিনি ঐসকল দিব্যশক্তিকে ঢেলে দিতে থাকেন, তাতেই সাধনা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ নিম্ন প্রকৃতি সাধকের মধ্যে কাজ করছে ততক্ষণ তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে চালিয়ে যাবার প্রয়োজন আছে।

এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যে তিনটি ধারা থাকবে—আস্পৃহা, প্রত্যাখ্যান, ও সমর্পণ: তন্মধ্যে—

আস্পৃহা হবে নিরবচ্ছিন্ন, সদাজাগ্রত, সদাসতর্ক—

মনের থাকবে ইচ্ছা, হৃদয়ের থাকবে আকিঞ্চন, প্রাণের থাকবে সমর্থন, দেহচেতনা ও প্রকৃতি যথেষ্ট নমনীয় হয়ে নিজেকে উন্মুক্ত ক'রে দিতে উন্মুখ হবে।

প্রত্যাখ্যান করতে হবে নিম্ন প্রকৃতির তৎপরতাকে—

মনের তরফের যত কিছু ভাবধারণা, মতামত, ঝোঁক, অভ্যাস ও সংগঠনকে প্রত্যাখ্যান, যাতে নীরব ও ফাঁকা মনের মধ্যে সত্য জ্ঞান প্রবেশ করবার জায়গা পায়—প্রাণ প্রকৃতির তরফের যত কিছু দাবি, চাহিদার টান, সংবেদন, অনুরাগ, স্বার্থ, গর্ব, দম্ভ, লালসা, লোভ, দ্বেষ, ঈর্ষা, সত্যের প্রতি বিরাগকে প্রত্যাখ্যান, যাতে সেই অচঞ্চল ও প্রশস্ত ও সুদৃঢ় ও নিবেদিত প্রাণ সত্তার মধ্যে উপর থেকে শক্তি ও আনন্দ নেমে আসার মতো জায়গা পায়—আর দেহ প্রকৃতির যত কিছু মূঢ়তা, ক্ষুদ্রতা, সংশয়, অবিশ্বাস, তামসিকতা, একগুঁয়েমি, কুঁড়েমি, পরিবর্তন-বিমুখতা ও তমস্ ভাবকে প্রত্যাখ্যান, যাতে উত্তরোত্তর দিব্য ভাবপ্রাপ্ত দেহের মধ্যে দিব্য আলোক ও শক্তি ও আনন্দ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

সমর্পণ করতে হবে ভগবান ও ভগবতী শক্তির কাছে—

নিজেকে ও নিজের সর্বস্বকে ও নিজের বলতে যা কিছু আছে সমস্তকে এবং চেতনার সকল স্তরকে ও সকল রকমের তৎপরতাকে অবাধ সমর্পণ।

এই সমর্পণ ও আত্মনিবেদন যতই অগ্রসর হ'তে থাকবে ততই সাধক বোধ করতে থাকবে যে ভগবতী শক্তিই তার মধ্যে সাধনার ক্রিয়া করছে, নিজের ক্রিয়ার দ্বারা তাকে নিষিক্ত ক'রে আনছে, তার মধ্যে দিব্য প্রকৃতির মুক্তি ও বিশুদ্ধতার ভিত্তিস্থাপনা করছে। তার আপন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার স্থানে যতই এরূপ প্রণালী চেতনভাবে কাজ করতে শুরু করবে ততই তাড়াতাড়ি প্রকৃত উন্নতিও হ'তে থাকবে। কিন্তু সমর্পণ ও আত্মনিবেদন যতক্ষণ আদি অন্ত পর্যন্ত সুসম্পূর্ণ ও সর্ববিশুদ্ধ না হয় ততক্ষণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রয়োজনও ওর সঙ্গে থাকবেই।

এখানে জেনে রাখা দরকার যে তামসিক সমর্পণ, যাতে নিজে কিছু কষ্ট স্বীকার না ক'রে ও সংগ্রামের মধ্যে না নেমে ভগবানকেই বলা হয় যে যা কিছু করবার তা তুমিই সব ক'রে দাও, এ জিনিস হলো একরূপ প্রতারণা এবং এতে কখনো মুক্তি বা সিদ্ধি মিলবেনা।

যদি সকল রকমের ভয়ভীতি ও বিপদ-আপদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নির্বিঘ্নভাবে বর্মাবৃত হয়ে জীবনের পথ অতিক্রম করতে চাও, তাহলে তার জন্য কেবল দুটি জিনিস থাকা দরকার, যে দুটি সর্বদা একত্রেই থাকে—ভগবতী মাতার দিক থেকে চাই তাঁর কৃপা, আর তোমার দিক থেকে চাই

শ্রদ্ধা, ঐকান্তিকতা ও সমর্পণের দ্বারা গড়ে তোলা এক আভ্যন্তরীণ নির্ভরতার অবস্থা। তোমার সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যেন হয় খাঁটী ও নিখুঁত ও অকুণ্ঠ। মনের ও প্রাণের তরফের যে অহং-মিশ্রিত শ্রদ্ধার মধ্যে যত উচ্চাকাঙ্খা, গর্ব, অভিমান, মনের আত্মদম্ভ, প্রাণের আত্মকামনা, ব্যক্তিগত দাবিদাওয়া, নিম্ন প্রকৃতির তুচ্ছ বাসনা পূরণের অভিপ্রায় প্রভৃতি মিশে তা কলঙ্কিত হয়ে থাকে, তেমন শ্রদ্ধার স্তিমিত শিখা ধোঁয়াতেই আচ্ছন্ন হয়ে যায়, সে শিখা কখনো উপরের দিকে সতেজে জ্বলে উঠতে পারেনা। এ কথা মনে রেখো যে তোমাকে তোমার জীবনটি দেওয়া হয়েছে কেবল ভগবৎ কর্মের জন্য ও ভগবৎ অভিব্যক্তির সহায়ক হবার জন্য। অতএব তুমি আর কিছু চেওনা, চাইবে কেবল দিব্য চেতনার শুদ্ধতা, শক্তি, আলো, উদারতা, অচঞ্চলতা ও আনন্দ, চাইবে কেবল তা যেন এসে তোমার মন প্রাণ দেহকে সম্যক রূপান্তরিত ক'রে দেয়। আর অন্য কিছু চাইবেনা, চাইবে কেবল দিব্য আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক সত্যকে, সে সত্য যেন তোমার মধ্যে ও পৃথিবীর মধ্যে ও আহূত এবং চিহ্নিত সকল ব্যক্তির মধ্যে অভিব্যক্ত হয়, এবং সকল বিরোধী শক্তিকে পরাভূত ক'রে সেই সত্যের সৃষ্টি হবার জন্য যেরূপ অবস্থা আসার প্রয়োজন তা যেন সত্বর এসে উপস্থিত হয়।

আর তোমার ঐকান্তিকতা ও সমর্পণও যেন হয় খাঁটী ও পুরোপুরি রকমের। নিজেকে যখন দিতে চাও তখন পুরোপুরি ভাবেই দিয়ে দেবে, তার মধ্যে যেন কোনো দাবিদাওয়া না থাকে, কোনো শর্ত না থাকে, কিছু হাতে রাখা না থাকে, যেন তোমার সম্পূর্ণটাই ভগবতী মায়ের জিনিস হয়ে যায়, যেন অহংএর জন্য কিংবা অন্য কোনো শক্তিকে দেবার জন্য বাকী রাখা কিছুমাত্র না থাকে।

তোমার ঐ শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিকতা ও সমর্পণ যতই সম্পূর্ণতর হতে থাকবে, ততই তোমার কৃপালাভ ও মাতৃআশ্রয়লাভ ঘটতে থাকবে। আর ভগবতী মায়ের কৃপা ও অভয় আশ্রয় যখন একবার মিলে যাবে, তখন কিসে আর তোমাকে ছুঁতে পারবে কিংবা কাকেই বা তোমার ডরাবার থাকবে। সে কৃপার অতি সামান্য মাত্রও তোমাকে সকল বাধাবিঘ্ন, সকল ভয় ও সকল বিপদ-আপদ পার করিয়ে দেবে; আর তার পুরো জিনিসটা পেয়ে গেলে তখন তো তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদেই তোমার পথে এগিয়ে যাবে, কারণ সে পথ হলো তাঁরই পথ, তখন আর কোনোরকম ভয়কে গ্রাহ্যই করবেনা, বিরোধ

যতই কেন প্রবল হোক দৃশ্য বা অদৃশ্য জগতের কোনো বিরুদ্ধতাই তোমাকে ঠেকাতে পারবেনা। তার স্পর্শে সকল রকম দুর্যোগই সুযোগ হয়ে যায়, সকল রকমের বিফলতাই সফলতা হয়ে দাঁড়ায়, আর দুর্বলতাও পর্যবসিত হয় সুদৃঢ় সবলতায়। কারণ ভগবতী মায়ের কৃপা মানেই স্বয়ং পরমেশ্বরের দেওয়া মঞ্জুরী, এবং আজ হোক বা কাল হোক তার ফল সুনিশ্চিত, পূর্বনির্দিষ্ট, এবং তা অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য।

* * *

যদি প্রকৃতই তুমি দিব্যকর্মের কর্মী হতে চাও, তাহলে প্রথমেই তোমার লক্ষ্য হবে যাতে তুমি সম্পূর্ণরূপে কামনাবর্জিত ও স্বার্থান্বেষী-অহংবর্জিত হতে পারো। তোমার সমস্ত জীবনটাই যেন হয় ভগবানে উৎসর্গীকৃত আহুতি স্বরূপ; তোমার সকল কাজের একমাত্র উদ্দেশ্যই হবে ভগবতী শক্তির সকল কাজের অভিব্যক্তির যন্ত্রস্বরূপ হয়ে তাকে গ্রহণ করা, তার জন্য খাটতে থাকা, তাকে সুসম্পূর্ণ ক'রে তোলা। তাঁর দিব্য চেতনার মধ্যে এমন ভাবে প্রবেশ করবে যাতে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে তোমার ইচ্ছার কোনো পার্থক্যই না থাকে, তাঁর প্রেরণা ছাড়া নিজের কোনো প্রেরণা না থাকে, তোমার মধ্যে ও তোমার ভিতর দিয়ে তাঁরই চেতন কর্মের সম্পাদন ছাড়া অন্য কোনো কর্মই না থাকে।

যতদিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এমনি সক্রিয়ভাবে একাত্ম হতে না পারছ, ততদিন পর্যন্ত এই কথা মনে করবে যে তোমার দেহ এবং আত্মা তাঁরই কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, তার দ্বারা তুমি সব কিছু কাজ করবে তাঁরই জন্য। যদি আলাদা একজন কর্মী বলে নিজেকে মনে হয় এবং এমন বোধ করতে থাকো যে কাজগুলি তুমি করছ বলেই তা হচ্ছে, তথাপি মনে করবে যে সেই কাজগুলি তাঁরই জন্য করা হচ্ছে। কাজ সম্বন্ধে সবকিছু অহংমূলক নির্বাচন, ব্যক্তিগত লাভের জন্য ঔৎসুক্য, আত্মমুখী কামনার সকল নির্বন্ধ, এগুলিকে প্রকৃতির ভিতর থেকে একেবারে নির্মূল ক'রে দিতে হবে। কোনো ফলের আশা বা পুরস্কার লাভের আশা আদৌ করবেনা; একমাত্র ফল পাবে ভগবতী মাতার সন্তোষ ও তাঁর কাজের সাফল্য, একমাত্র পুরস্কার পাবে দিব্য চেতনা লাভের দিকে ক্রমিক উন্নতি এবং তার সঙ্গে স্থিরতা ও শক্তি ও আনন্দলাভ। স্বার্থ বর্জিত কর্মীর পক্ষে এই সেবার আনন্দ ও কর্মের ভিতর দিয়ে আভ্যন্তরীণ উন্নতির আনন্দ, এইতো যথেষ্ট পুরস্কার।

কিন্তু একটা সময় আসবে যখন থেকে তুমি উত্তরোত্তর বোধ করতে থাকবে যে বস্তুত তুমি কোনো কর্মের কর্তা নও, তুমি তার যন্ত্র মাত্র। কারণ প্রথমত তোমার ভক্তির জোরে তুমি ভগবতী মায়ের সঙ্গে এমনই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে যে যখন খুশি একবার মনের মধ্যে একাগ্রতা এনে মাকে স্মরণ ক'রে তাঁর হাতে সব কিছু ছেড়ে দিলেই তাঁর উপস্থিত নির্দেশ পেয়ে যাবে, হয় তাঁর প্রত্যক্ষ আদেশ বা কিছু প্রেরণা আসবে, তাতেই নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে তোমাকে কিভাবে কি করতে হবে আর তার ফলই বা কি হবে। এবং তার পরেও তুমি উপলব্ধি করতে থাকবে যে মাতৃশক্তি কেবল তোমাকে প্রেরণা ও নির্দেশই দিচ্ছেনা, কিন্তু তোমাকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে স্বয়ং তিনিই তোমার কাজগুলো চালিয়ে যাচ্ছেন; তোমার সমস্ত গতিবিধির তিনিই সূত্রপাত করছেন, তোমার যা শক্তি সে তাঁরই শক্তি, তোমার মন প্রাণ দেহ তাঁরই কাজের সানন্দে উন্মুখ যন্ত্র, তাঁরই লীলার উপকরণ, বস্তুবিশ্বে তাঁরই অভিব্যক্তির জন্য গড়া ছাঁচস্বরূপ। তাঁর সঙ্গে এমন নিবিড় মিলন ও এতখানি সর্বনির্ভরতা, এর চেয়ে বেশি আনন্দের অবস্থা আর কিছু হতে পারেনা। কারণ এই ভাব নিয়ে চললে এতে তোমাকে অজ্ঞানময় জীবনের কষ্ট দুঃখের সীমানা ছাড়িয়ে নিয়ে হাজির করবে তোমার আপন অধ্যাত্ম সত্তার সত্যের অন্তর্দেশে, তার সুগভীর শান্তি ও সুতীব্র আনন্দের মধ্যে।

এই রূপান্তরের কাজ যখন অগ্রসর হচ্ছে তখন খুব বেশি দরকার নিজেকে অহংএর সকল শঠতা থেকে তফাৎ ক'রে রাখা। তার কোনোরকম দাবি-দাওয়া বা আবদার যেন তোমার আত্মদান ও আহুতির বিশুদ্ধতাকে একটুও কলঙ্কিত করতে না পারে। কাজের দিকে বা তার ফলের দিকে তোমার কিছুমাত্র আসক্তি থাকবেনা, কোনো শর্ত আরোপ করা থাকবেনা, উচ্চশক্তি তোমার আয়ত্তের মধ্যে আসুক এই বলে কোনো দাবি থাকবেনা, বরং সে শক্তি তোমাকেই অধিকার ক'রে নেবে। তুমি যে যন্ত্রস্বরূপ হতে পেরেছ তার জন্যও কোনো গর্ব থাকবেনা, কোনোরকম আত্মাভিমান বা দম্ভ আদৌ থাকবেনা। যে বিরাট শক্তি তোমার ভিতর দিয়ে ক্রিয়া করছে তাকে নিয়ে তোমার মন প্রাণ দেহের কোনো অংশ তার নিজের কাজে প্রয়োগ করতে কিংবা নিজের ব্যক্তিগত আলাদা কিছু সুবিধা ক'রে নিতে চেষ্টা করবেনা। তোমার শ্রদ্ধা, ঐকান্তিকতা ও আস্পৃহার বিশুদ্ধতা যেন তোমার সত্তার সকল স্তরকে ব্যাপ্ত ক'রে পুরোপুরি বজায় থাকে। তাহলে তোমার

প্রকৃতি হতে সকল বিঘ্নকারী জিনিস ও তার প্রভাব ক্রমে ক্রমে আপনিই ঘুচে যাবে।

এইরূপ পরিণতির শেষের দিকে এমন অবস্থা আসবে যখন তুমি ভগবতী মায়ের সঙ্গে পুরোপুরি ভাবে একাত্ম হয়ে গিয়ে নিজেকে আর আলাদা একজন কেউ কিংবা যন্ত্র কিংবা ভৃত্য কিংবা কর্মী বলেও কিছুই আর ভাববেনা, কেবল জানবে যে তুমি প্রকৃতই তাঁর একটি সন্তান, তাঁর চেতনা ও শক্তির এক শাশ্বত অংশ। তখন সর্বদা তিনিও থাকবেন তোমার মধ্যে আর তুমিও থাকবে তাঁর মধ্যে। নিত্যই তুমি অতি সহজে ও স্বাভাবিক রূপে অনুভব করবে যে তোমার সকল চিন্তা ও সকল দেখা ও সকল কাজ করা, এমন কি তোমার নড়াচড়া এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াও তাঁরই থেকে হচ্ছে, এবং তাঁরই সবকিছু। তুমি তখন জানবে এবং দেখবে এবং বোধ করতে থাকবে যে তুমি তাঁরই ভিতর থেকে হয়েছ এই ব্যক্তি ও শক্তিস্বরূপ, তাঁর লীলার জন্য তিনি তোমাকে এইভাবে বাইরে বের ক'রে দিয়েছেন অথচ তুমি তাঁরই মধ্যে রয়েছ নিরাপদে, তাঁরই সত্তার সত্তা, তাঁরই চেতনার চেতনা, তাঁরই শক্তির শক্তি, তাঁরই আনন্দের আনন্দ। এ অবস্থা সম্পূর্ণ হলে এবং তাঁর অতিমানস শক্তি মুক্তভাবে তোমার মধ্যে কাজ করতে থাকলে, তখন তুমি দিব্যকর্মের পূর্ণ আধার হবে; তখনকার জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়াকর্ম, সবই হবে অব্যর্থ, সহজ সরল, উদ্দীপিত, স্বয়ংক্রিয়, ত্রুটিশূন্য, তা হবে স্বয়ং ভগবানেরই বহিঃপ্রকাশ, শাশ্বতের এক দিব্য ক্রিয়া।

* * *

এমন রূপান্তর যদি চাও, তাহলে বিনা বাধায় ও বিনা ওজরে নিজেকে মায়ের ও তাঁর শক্তির হাতে ছেড়ে দাও, তিনি অবাধে তোমার মধ্যে তাঁর যা করবার তা করুন। তিনটি জিনিস থাকাই চাই—সচেতনতা, নমনীয়তা, অকপট অকুণ্ঠ সমর্পণ। সচেতনতা থাকা চাই মনে, প্রাণে, হৃদয়ে, জীবনে, এমনকি দেহের কোষগুলিতে পর্যন্ত, সে চেতনা মা এবং তাঁর শক্তি সম্বন্ধে। যদিও তিনি তোমার অজানিতে ও তোমার অজ্ঞাত অংশে ও অজ্ঞাত মুহূর্তে তাঁর কাজ করতে পারেন এবং করেও থাকেন, তথাপি তোমার জাগ্রত চেতনাতে ও তাঁর সঙ্গে জীবন্ত সংযোগের অবস্থাতে যতটা যে কাজ হয় ততটা তেমন হতে পারেনা। আর তোমার প্রকৃতি তাঁর স্পর্শের প্রতি খুব নমনীয়

থাকা চাই—আত্মসর্বস্ব অজ্ঞান মন যেমন প্রশ্ন করে ও তর্ক করে ও সন্দেহ করে, এবং পরিবর্তন ও দীপ্তিলাভে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তা থাকলে চলবে না; আর মানুষের প্রাণ যেমন তার অদম্য কামনা ও উল্টা অভিপ্রায়ের দ্বারা দিব্য প্রভাবের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় তা থাকলেও চলবেনা; আর মানুষের দেহ-চেতনা যেমন তার অক্ষমতা ও জড়তা ও তমসের মধ্যে ডুবে থেকে নিজের ক্ষুদ্রতা ও অন্ধকারকেই আরামে আঁকড়ে থাকে, এবং তার গতানুগতিক সুপ্তির ও অসাড় আলস্যের উপর কোনো কিছুর স্পর্শমাত্র পেলেই অমনি চেঁচিয়ে উঠে তার প্রতিরোধক হয়ে দাঁড়ায় তা থাকলেও চলবেনা। তোমার বাহ্য ও আভ্যন্তর সত্তার সমর্পণ অকপট ও অকুণ্ঠ হলে এই নমনীয়তা তোমার প্রকৃতির সকল অংশে আপনিই এসে পড়বে; তাঁর যে প্রজ্ঞা ও জ্যোতি, তাঁর যে শক্তি ও সঙ্গতি ও সৌন্দর্য ও পূর্ণতা উপর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, তার দিকে নিজেকে নিত্য উন্মীলিত রাখলে ঐ চেতনা তোমার মধ্যে সর্বত্রই জেগে উঠবে। এমনকি তোমার স্থূল দেহও জেগে উঠে অবশেষে তার নিম্নগর্ভ প্রচ্ছন্ন চেতনাকে অতিমানস অতিচেতনার শক্তির সঙ্গে মিলিত ক'রে দিয়ে উপর নীচ ও সকল দিক থেকে উৎসারিত মাতৃশক্তিকে অনুভব ক'রে পরম প্রেমে ও আনন্দে আপ্লুত হয়ে যাবে।

কিন্তু সাবধান, ভগবতী মাকে যেন বুঝতে ও বিচার করতে যেওনা তোমার ঐ ক্ষুদ্র পার্থিব মন দিয়ে—যে মন নিজের নাগালের বাইরের জিনিসকেও নিজের নিরিখ এবং ওজন দিয়ে, নিজের সংকীর্ণ যুক্তি ও ভ্রান্তি-প্রবণ ধারণা দিয়ে এবং তার অতল দাম্ভিক অজ্ঞানতা দিয়ে ও তুচ্ছ আত্ম-প্রত্যয়ী জ্ঞানটুকু দিয়ে যাচাই ক'রে দেখতেই ভালোবাসে। মানুষের মন রয়েছে আধা-আলো অন্ধকারের কারাগারের মধ্যে আবদ্ধ, মুক্ত ও বহুমুখী দিব্যশক্তি যে কোন দিকে কখন কি করছে তা অনুধাবনই করতে পারেনা। তাঁর ত্বরিত দৃষ্টি এবং ক্রিয়াগুলি এই ভ্রান্ত মনের আন্দাজের সীমার অনেক বাইরে; তার মাপকাঠি আর মায়ের কাজের মাপকাঠি কখনো সমান নয়। তাঁর যে বহুবিভিন্ন ব্যক্তিত্বের দ্রুতগতি অদল বদল, সেই সঙ্গে তার ছন্দের গড়া ও ভাঙা, তাঁর কখনো দ্রুত এগিয়ে যাওয়া কখনো পিছিয়ে আসা, বিভিন্ন জনের সমস্যাকে বিভিন্ন প্রকারে সমাধান করা, কখনো বা একরূপ সূত্র আর কখনো বা অন্যরূপ সূত্র ধরা আর সবগুলিকে একজোট ক'রে নেওয়া—এতে মানুষের মন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, আর সেই পরমাশক্তি যখন গোলক-ধাঁধার

ভিতর দিয়ে ঘুরপাক খাওয়াতে খাওয়াতে অজ্ঞানতাকে উপরের চরমতম আলোর দিকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, সে তখন তার কিছু বুঝতেই পারেনা। অতএব তার চেয়ে বরং তোমার অন্তরাত্মাকে সেই মায়ের দিকে খুলে দিয়ে তোমার চৈত্য প্রকৃতির দ্বারা তাঁকে অনুভব করেই খুশি থাকো, আর চৈত্যের দৃষ্টি দিয়ে তাঁর উপস্থিতিকে দেখতে থাকো, এতেই সত্যের সহজ সাড়া পেতে পারবে। তখন মা স্বয়ং তোমার মন ও হৃদয় ও জীবন ও দেহচেতনাতে তার চৈত্য উপাদানের মধ্যে আলোকপাত করবেন এবং তাঁর কর্মপ্রণালীর আভাস দিয়ে দেবেন।

আর আমাদের অজ্ঞান মন মাতৃশক্তির সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তার কর্মরীতি সম্বন্ধে নিজের যে স্থূল ধারণা নিয়ে সেই মতোই হোক বলে প্রত্যাশা ও দাবি করতে থাকে, তার এই ভুল অভ্যাসটিকেও পরিহার করো। কারণ আমাদের মন কেবলই চাইবে যে মাতৃশক্তি কথায় কথায় আশ্চর্য সহজ সাফল্যের সঙ্গে চমকপ্রদ অঘটন ঘটিয়ে আমাদের তাক লাগিয়ে দিক, তবে তো জানবো যে ভগবান বাস্তবিকই এখানে রয়েছেন, নইলে কেমন ক'রে তা বিশ্বাস করি। কিন্তু মা অজ্ঞানতার সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা করছেন তা অজ্ঞানতারই আপন ক্ষেত্রে নেমে ; সর্বদা উপরে থেকেই নয়, কিন্তু সেখানে নেমেই তাঁকে কাজ করতে হচ্ছে। সুতরাং তাঁর প্রজ্ঞাকে ও শক্তিকে কতক বা চাপা দিয়ে রাখছেন আর কখনো কতক বা প্রকাশ করছেন, তাঁর যন্ত্রগুলি ও ব্যক্তিত্বগুলি হতে সরিয়ে রেখে তাদেরই গতিকে অনুসরণ ক'রে চলছেন, যাতে তাদেরই সন্ধানী মনেরও আস্পৃহান্বিত চৈত্যের ও সংগ্রামী প্রাণের ও অবরুদ্ধ দেহপ্রকৃতির কষ্টের ভিতর দিয়ে সেই পথকেই অনুসরণ ক'রে তাদের রূপান্তর আনতে পারেন। তাছাড়া পরাৎপরের ইচ্ছা কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দিয়েছে, আর অনেক রকমের গ্রন্থিও আছে, সেগুলিকে একে একে ছাড়াতে হবে, সব হঠাৎ একেবারে কেটে ফেলা চলেনা। আর যত অসুর ও রাক্ষসের দল এই বিবর্তনমুখী পার্থিব প্রকৃতিকে এমন দখল ক'রে রেখেছে যে, তাদের বহুকালের জয় করা রাজত্বের মধ্যে তাদেরই শর্ত অনুযায়ী তাদের পরাজয় ঘটাতে হবে ; আমাদের ভিতরকার উপস্থিত মানবত্বকে ক্রমশ প্রস্তুত ক'রে আনতে হবে তার সীমা ছাড়িয়ে ওঠার জন্য, তা এমনই দুর্বল ও তমসাচ্ছন্ন যে তাকে হঠাৎ তার অনেক উপরকার অবস্থার মধ্যে উঠিয়ে দেওয়া যায়না। ভগবৎ চেতনা ও ভগবৎ শক্তি সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে প্রতি মুহূর্তে যখনকার যে অবস্থা সেই অনুযায়ী কাজ করতে,

অপূর্ণতার মধ্যে যে পূর্ণতা এনে ফেলা পূর্বনির্দিষ্ট তাকে সমুচিত গঠন দেবার ব্যবস্থা করতে। কেবল যখন অতিমানস তোমার মধ্যে অবতরণ করেছে তখনই সে পারে তার অতিমানস শক্তি ও প্রকৃতির দ্বারা সরাসরি কাজ করতে। তুমি যদি তোমার মনকেই অনুসরণ ক'রে চলো, তাহলে মা যখন তোমার কাছে প্রত্যক্ষ রূপে অভিব্যক্ত হচ্ছেন তখনও তুমি চিনতেই পারবেনা। মনের বদলে অনুসরণ করো তোমার আত্মাকে, যে মন কেবল বাইরের চেহারাটাই দেখে তাকে নয়, কিন্তু যে আত্মা সত্যের উপস্থিতিতে সাড়া দেয় তাকে; মাতৃশক্তির উপর বিশ্বাস রাখো, তিনিও তোমার ভিতরকার দিব্যত্বকে উন্মুক্ত ক'রে সব কিছুকে দিব্যপ্রকৃতির স্বরূপে গঠন দেবেন।

এই অতিমানসিক পরিবর্তন আসা পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে আছে এবং পার্থিব চেতনার ক্রমবিবর্তনের ধারাতে এটা অবশ্যম্ভাবী; কারণ তার উর্ধ্বগতির কাজ এখনও শেষ হয়নি, আর মন জিনিসটাই তার চূড়ান্ত পরিণতি নয়। কিন্তু সে পরিবর্তন এসে যাতে স্থায়ী রকমের আকার নিয়ে টিঁকে থাকে তার জন্য নীচের দিক থেকেও সাড়া জাগা দরকার, সে আলো যখন দেখা দেবে তখন তাকে অস্বীকার না ক'রে তাকে চিনে নেবার ইচ্ছা জাগা দরকার, আর সেই সঙ্গে উপরে পরাৎপরের দিক থেকেও তার জন্য মঞ্জুরী আসা দরকার। ঐ নীচেকার আহ্বান আর উপরকার মঞ্জুরীর মাঝে থেকে মধ্যস্থতা করছে ভগবতী মায়ের উপস্থিতি এবং তাঁর শক্তি। মায়ের সেই শক্তির ক্রিয়া ছাড়া কেবল কোনো মানুষের চেষ্টা ও তপস্যার জোরেই ঢাকনি খুলে যেতে পারেনা ও পর্দার আবরণ ছিঁড়ে যেতে পারেনা, এবং এখানকার আধারও উপযুক্ত গড়ন নিতে পারেনা—কেবল সেই শক্তিই পারে এই তমস ও মৃত্যু ও দুঃখভরা জগতে এনে দিতে দিব্য সত্য ও আলো এবং দিব্য জীবনের ও অমরত্বের আনন্দ।

যোগ ও আত্মোৎসর্গ

যোগ মাত্রই স্বভাবত এক নবজীবন প্রাপ্তি; মানুষের সাধারণ মনোময় স্থূল জীবন থেকে একটা উচ্চতর আধ্যাত্মিক চেতনাতে এবং বৃহত্তর এক দিব্য সত্তাতে জন্মলাভ করা। এই বৃহত্তর আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব লাভের আকিঞ্চন যদি তীব্রভাবে নাজাগে তাহলে কোনোরকম যোগই সার্থক ভাবে অনুষ্ঠিত ও

ম্পাদিত হতে পারেনা। যে আত্মার কাছে এইরূপ বিরাট পরিবর্তনের দিকে যাবার জন্য ডাক আসে, তার পক্ষে প্রথম পূর্বজীবন ছেড়ে আসা অনেক কম ভাবেই হতে পারে। হয়তো নিজের অজ্ঞাতে সে এই জাগরণের জন্য তলে তলে প্রস্তুত হচ্ছিল এবং একদিন স্বাভাবিক প্রগতি হিসাবেই সে ঐদিকে অগ্রসর হতে শুরু করে; কিংবা হয়তো ধর্মের প্রভাবে বা দার্শনিক চিন্তাধারার আকর্ষণে তার ঐদিকে মোড় ফিরে যায়; হয়তো অল্পে অল্পে একটা জ্ঞানদীপ্তি এসে পড়ে কিংবা হঠাৎ কিছুর স্পর্শ পেয়ে বা আকস্মিক কোনো আঘাত খেয়ে মন ঐদিকে ছুটে যায়; কিংবা হয়তো বাহ্য ঘটনার চাপে বা আভ্যন্তরীণ তাগিদের তাড়াতে সে ঐদিকে নীত হয়, কিংবা বিশেষ একটি কথা শুনে বা দীর্ঘকাল চিন্তার ফলে তার মনের আগল টুটে যায়, অথবা এই পথগামী কারো দৃষ্টান্ত দেখে বা তার সাহচর্যে বা নিত্য প্রভাবের টানেও তা হতে পারে। ডাক যখন আসে তখন তা ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতি ও অবস্থা অনুসারেই আসে।

কিন্তু যেমন ভাবেই ডাক আসুক, মনের ও ইচ্ছার দিক থেকে একটা স্থির নিষ্পত্তি ক'রে নেওয়া চাই এবং তার ফলে সম্পূর্ণ ও সার্থকভাবে আত্মোৎসর্গ ক'রে ফেলা চাই। নতুন আধ্যাত্মিক ভাব-শক্তিকে চূড়ান্তভাবে মেনে নেওয়া, আত্মার মধ্যে উপর দিকের জন্য এবং আলোক প্রাপ্তির জন্য উন্মুখতা আসা, হৃদয়ের ইচ্ছা ও আস্পৃহার দ্বারা সেই নতুন দিকটিকে আঁকড়ে থাকা—এই মূল আন্তরিক ক্রিয়াটুকুর মধ্যেই বীজের মতো যোগের সমস্ত ফলাফল নিহিত হয়ে থাকে। কেবল উপরে বিশেষ রকমের কিছু একটা আছে এই ধারণা নিয়ে থাকা বা বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে তার সন্ধান করা, এমনি ধরনের ভাব নিয়ে মনের মধ্যে যতই প্রবল আগ্রহ থাকুক, তার ফল কিছুই হবেনা—যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয় তাকে একমাত্র কাম্য বলে ও ইচ্ছা তাকে একমাত্র প্রার্থনীয় কর্ম বলে গ্রহণ না করছে। কারণ আত্মার সত্য নিয়ে কেবল চিন্তা ক'রে কোনো ফল নেই, তার মধ্যে ডুবে গিয়ে তাতেই অবস্থান করতে হবে, এবং তার জন্য চাই সত্তার সম্মিলিত একাগ্র একনিষ্ঠতা; যোগের উদ্দিষ্ট এতবড়ো একটা পরিবর্তন কেবল ভাগাভাগি রকমের ইচ্ছার দ্বারা বা আংশিক প্রচেষ্টার দ্বারা বা দ্বিধাগ্রস্ত মনের চেষ্টার দ্বারা আসতে পারেনা। ভগবানকে যে চাইবে সে একমাত্র কেবল ভগবানের কাছেই নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দেবে।

*   *   *

কিন্তু জীবন লাভ করার যে অপূর্ব সুযোগ আমরা পেয়েছি তার যদি সমুচিত সদ্ব্যবহার করতে চাই, যে ডাক এলো আমাদের কাছে তাতে যদি সমুচিত সাড়া দিতে চাই, যে লক্ষ্যের আভাস পেয়েছি সেখানে যদি পৌঁছতে চাই, তাহলে কেবল ঐদিকে একটু অগ্রসর হওয়াই যথেষ্ট নয়, তাহলে পূর্ণ আত্মদান সম্পূর্ণভাবেই করতে হবে। যোগে সাফল্যলাভের নিগূঢ় পন্থাই হলো এই যে তাকে কেবল জীবনের একটা অন্যবিধ লক্ষ্য বলে ধরে নিলেই চলবেনা, সমগ্র জীবনকেই তাতে নিযুক্ত করতে হবে।

*   *   *

আমাদের যোগে আমরা চাইব যে আমাদের অতীত ও বর্তমান দিয়ে এ পর্যন্ত যা গড়ে উঠে আমাদের এই সাধারণ মনোময় মানুষটিতে এসে দাঁড়িয়েছি, তার সম্পূর্ণটাই সম্পূর্ণ ভেঙে যাক এবং আমাদের মধ্যে এক নতুন দৃষ্টিকেন্দ্র ও কর্ম জগতের সৃষ্টি হোক, যার থেকে দিব্য মানবত্ব বা অতিমানব প্রকৃতির উদ্ভব হতে পারে।

প্রথম প্রয়োজন হলো এই যে আমাদের মন যে আপন উন্নতি এবং সন্তোষ বিধানের দিকেই ব্যাপৃত থেকে কেবল আগেকার অভ্যস্ত বাহ্য বিষয়েই নিবিষ্ট থাকতো, তার সেই কেন্দ্রগত মামুলী পূর্বআস্থাকে ও দৃষ্টিভঙ্গীকে একেবারে বিলোপ ক'রে দিতে হবে। তার এই বাহ্য রীতির বদলে আনতে হবে এক গভীরতর আস্থা ও দৃষ্টি, যা কেবল ভগবানকেই দেখবে এবং ভগবানকেই চাইবে। তার পরের প্রয়োজন আমাদের সমগ্র নিম্ন সত্তাকেও এই নতুন আস্থা ও বৃহত্তর দৃষ্টিকে সাদরে মেনে নিতে বাধ্য করা। আমাদের সমগ্র প্রকৃতিতেই পূর্ণরূপে সমর্পিত হওয়া চাই; আমাদের অশুদ্ধ মনশ্চেতনার কাছে যে জিনিসকে স্থূল বস্তুজগতের জিনিসের তুলনায় অনেক কম বাস্তব ও ধোঁয়াটে বলে বোধ হয়, ওরই কাছে তার সকল অংশ ও সকল ক্রিয়াকে নিবেদন ক'রে দিতে হবে। আমাদের অন্তরাত্মা, মন, চেতনা, হৃদয়, ইচ্ছা, জীবন ও দেহ—অর্থাৎ সম্পূর্ণ সত্তাই তার সমস্ত শক্তিকে এমনভাবে নিবেদিত করবে যাতে সে ভগবানের উপযুক্ত যন্ত্রস্বরূপ হতে পারে। এ বড়ো সহজ কাজ নয়; কারণ জগতের সব কিছুই চলছে একটা বাঁধা নিয়মে, তার আমূল পরিবর্তন সে কিছুতেই মানতে চাইবেনা। অথচ পূর্ণযোগে চাই তেমনই বিপ্লবাত্মক আমূল পরিবর্তন। আমাদের ভিতরকার সব কিছুকেই নিত্য

সেই কেন্দ্রীয় বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। সকল চিন্তা ও সকল প্রবৃত্তিকেই উপনিষদের ভাষাতে সেই কথা স্মরণ করাতে হবে যে, 'উহাই আসল ব্রহ্ম, ইহা নয় যা লোকে কামনা করে।' আগেকার অস্তিত্বের সব কিছুকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে প্রাণের প্রত্যেকটি তন্ত্রীকে বাধ্য করতে হবে। মন আর যেন মন হয়েই না থেকে তার চেয়ে উজ্জ্বলতর কিছু হয়ে ওঠে। প্রাণ যেন বৃহৎ ও বিরাট শক্তিময় হয়ে তার আগেকার সংকীর্ণ ও কামনাপূর্ণ অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। দেহও যেন তার রক্ত মাংসের পিণ্ডময় পশুত্বের উপরে উঠে আত্মার সচেতন ভৃত্য ও যন্ত্র ও জীবন্ত আধার হয়ে কাজ করতে থাকে।

ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে

ঐকান্তিকতা সহকারে যে-কেউ ভগবানের দ্বারদেশে গিয়ে আঘাত করবে, তার জন্য ভগবানের গৃহ কখনো রুদ্ধ থাকবেনা, পূর্বে সে যতই কেন দোষ এবং ভুল কাজ ক'রে থাক।

* * *

এটাই একমাত্র অপরিহার্য রূপে প্রয়োজন, এই ঐকান্তিকতা।

২। পূর্ণ যোগের ভিত্তি

স্থিরতা, শান্তি ও সমতা

স্থির মন মানে এই নয় যে সেখানে কোনো চিন্তামাত্র থাকবেনা, মনের কোনোরূপ ক্রিয়াই থাকবেনা। কিন্তু এগুলি হতে থাকবে ভাসা ভাসা ভাবে, তথাপি তুমি আপন আসল সত্তার মধ্যে তার থেকে স্বতন্ত্র বোধ করবে। সেগুলিকে লক্ষ্য করবে মাত্র কিন্তু নিজেকে তাতে জড়াবেনা, তাকে দেখে বিচার ক'রে যা প্রত্যাখ্যান করবার তা প্রত্যাখ্যান ও যা গ্রহণ করবার তা গ্রহণ করবে, এবং যা সত্যকার চেতনা ও সত্যকার অনুভূতি তার মধ্যেই অবস্থান করবে।

* * *

সবচেয়ে দরকার যত কিছু বিরক্তিকর চিন্তার, অনুচিত অনুভবাদির, বিভ্রান্তিকর ধারণার, দুঃখদায়ক অস্থিরতার আক্রমণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। এইগুলি প্রকৃতিকে বিচলিত ও মেঘাচ্ছন্ন ক'রে তোলে, সেখানে উচ্চশক্তির পক্ষে তাই কাজ করা মুশকিল হয়; মন যদি স্থির ও শান্ত থাকে, তখন সেই শক্তি সহজে ক্রিয়া করতে পারে।

* * *

প্রথম দিকে স্থিরতা ও শান্তভাব বরাবর অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেনা, কেবল আসা যাওয়া করে, প্রকৃতির মধ্যে তা থিতিয়ে বসতে অনেক সময় লাগে। সুতরাং অধৈর্য না হয়ে যেমন করছ তেমনি ক'রে যাওয়াই ভালো। শান্তি ও স্থিরতার পশ্চাতে যা রয়েছে তা যদি পেতে চাও; তাহলে ভিতরকার সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে খুলে রেখে ভগবৎ শক্তির চেতনাকে তোমার মধ্যে কাজ করতে দাও। ঐরূপ ঐকান্তিকতা আসার জন্যই খুব তীব্রভাবে আস্পৃহা করতে থাকো, কিন্তু অধৈর্য হয়োনা, তাহলেই তা এসে যাবে।

* * *

শান্তিময় যে নীরব চেতনা তোমার মনকে এখন অধিকার করেছে—ত কেবল নীরব থাকলেই চলবেনা, তার যথেষ্ট প্রসারও হওয়া চাই। সর্বত্রই তাকে অনুভব করবে এবং নিজেও সমস্তটা সম্পূর্ণরূপে তার মধ্যে অবস্থান করবে। এতেও সেই নীরবতাকে দিব্য ক্রিয়ার ভিত্তিস্বরূপ ক'রে আনতে সাহায্য করবে।

* * *

স্থির হয়ে থেকে নিজেকে উদার উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে মাতৃ-শক্তিকে আহ্বান করো তাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ক'রে দিতে, চেতনাকে সম্প্রসারিত ক'রে দিতে, এবং বর্তমান অবস্থাতে যতটা আলো ও শক্তিকে সে গ্রহণ করতে ও জীর্ণ করতে পারে ততটা তার মধ্যে এনে দিতে।

* * *

সমতা এই যোগের পক্ষে বিশেষ দরকারী; এইজন্য দরকার যে ব্যথা-বেদনা এবং কষ্টভোগের মধ্যেও সমতা বজায় থাকবে—তার মানেই হলো এই যে তুমি নীরবে ও দৃঢ়চিত্তে সব কিছুকেই সহ্য করবে, আদৌ অস্থির বা

বিরক্ত বা নিরুদ্যম বা হতাশ হবেনা, ভগবৎ ইচ্ছার উপর অটুট আস্থা রেখে সমানভাবে চলতে থাকবে। কিন্তু সমতা মানে জড়বৎ অসাড়ভাবে তাকে মেনে নেওয়া নয়। যদি মনে করো তোমার সাধনার কোনো প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়, তবুও তাতে ক্ষুণ্ণ বা হতাশ না হয়ে সমতা বজায় রাখবে, কিন্তু সেই ব্যর্থতাকে ভগবৎ ইচ্ছার লক্ষণ ভেবে নিয়ে তোমার চেষ্টা থেকে বিরত হবেনা। বরং খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে সেই ব্যর্থতার হেতু এবং অর্থ কি, এবং আস্থা অটুট রেখে সাফল্যের দিকে অগ্রসর হবে। রোগপীড়া সম্বন্ধেও সেই কথা—তাতেও বিচলিত কিংবা অস্থির হবেনা, কিন্তু এটা ভাববেনা যে সেই রোগপীড়া হওয়াটাও ভগবানের ইচ্ছা, বরং এই বুঝবে যে তোমার দেহে এমন কিছু অপূর্ণতা আছে যাকে দূর করা দরকার, যেমন প্রাণের অপূর্ণতা ও মনের দোষত্রুটির বেলাতেও ক'রে থাকো।

*　　　*　　　*

সবই যখন ঠিকঠাক অবস্থায় রয়েছে এবং লোকজনের দিক থেকে বা ঘটনাবলীর দিক থেকে কোনো গণ্ডগোল নেই, তখন শান্তভাবে থেকে সমতা বজায় রাখা খুবই সহজ; কিন্তু যখন তা বিগ্‌ড়ে যায় তখনই হয় তোমার স্থিরতা ও শান্তভাব ও সমতার পরীক্ষা, তখনই তার পুনরুদ্ধার ক'রে তাকে সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে হয়।

সমর্পণ

নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সমর্পণ হওয়া সম্ভব নয়—কারণ সম্পূর্ণ সমর্পণ মানে সত্তার প্রত্যেক অংশের অহংএর গ্রন্থি কেটে ফেলে গোটা সবটুকুই ভগবানকে নিবেদন ক'রে দেওয়া। মন প্রাণ ও দেহচেতনাকে (এবং তার প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতি অংশকে) একে একে স্বতন্ত্রভাবে সমর্পণ করতে হবে, অর্থাৎ তার নিজেদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ভগবানের রাস্তায় চালাতে হবে। কিন্তু প্রথম থেকে এই করা যেতে পারে যে আত্মোৎসর্গের একটা কেন্দ্রগত সংকল্প নিয়ে থেকে যখন যেমন রাস্তা খোলা পাওয়া যায় তাতেই তাকে প্রতি পদে বাস্তবে সফল ক'রে তোল', এই আত্মদান সম্পূর্ণ ক'রে আনার পক্ষে যে সুযোগ মেলে তার সদ্ব্যবহার করা। একটা দিকে সমর্পণ

ঘটলে তখন অন্য দিকের কাজগুলি অপরিহার্য রূপে সহজ হয়ে আসে; কিন্তু তাতেও অন্যান্য গ্রন্থিগুলি শিথিল বা ছিন্ন হয়না,—বিশেষত যেগুলি বর্তমান ব্যক্তিত্ব ও তার সর্বাপেক্ষা অভ্যস্ত ও প্রিয় ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সেগুলিকে নিয়ে অত্যন্ত মুশকিলে পড়তে হয়, এমন কি যখন কেন্দ্রগত ইচ্ছা স্থায়ী হয়ে গেছে এবং সংকল্প কাজে পরিণত হচ্ছে তখনও পর্যন্ত।

* * *

আমাদের সাধনার প্রথম সূত্রই হলো এই যে সমর্পণই হবে তাকে সার্থক ক'রে তোলার প্রধান পন্থা, আর যতদিন পর্যন্ত অহংএর বা প্রাণের দাবি ও কামনাকে পোষণ করবে ততদিন পর্যন্ত পূর্ণ সমর্পণ সম্ভব হবেনা—আত্মদান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একথা কখনই আমরা গোপন করিনি। এটি খুব কঠিন কাজতো বটেই; কিন্তু এই হলো সাধনার মূল সূত্র। কঠিন বলেই তা অটলভাবে ধৈর্য সহকারে ক'রে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ সুসম্পূর্ণ না হচ্ছে।

উদ্ঘাটন

এই যোগের সমুদয় নীতিই হলো ভগবৎ প্রভাবের দিকে নিজেকে উদ্ঘাটিত ক'রে দেওয়া। সে প্রভাব তোমার উপরেই অবস্থান করছে, আর একবার তার সম্বন্ধে চেতন হলেই তখন তুমি তাকে নিজের মধ্যে ডেকে নিতে পারো। সে জিনিস নেমে আসবে তোমার মন ও দেহের মধ্যে আলোক রূপে, শান্তি রূপে, একটা সক্রিয় শক্তি রূপে, ভগবানের উপস্থিতি রূপে, অথবা তা নিরাকার হলে আনন্দ রূপে। সে চেতনা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ শ্রদ্ধা ও আস্থা নিয়ে সেইরূপ উদ্ঘাটনের জন্য আস্পৃহা করবে। আস্পৃহা, আহ্বান, উপাসনা, প্রার্থনা, সবই এক জিনিসের বিভিন্ন আকার এবং সবই ফলপ্রদ; ওর মধ্যে যেটা তোমার আসে বা তোমার পক্ষে সহজ হয় সেটাই বেছে নিতে পারো। আর এক উপায় হলো একাগ্র হওয়া; চেতনাকে হৃদয়ের মধ্যে একাগ্র করবে (কেউ বা করে মাথার মধ্যে বা তার উপরে) এবং হৃদয়ে মাকে ধ্যান ক'রে তাঁকে সেখানে ডাকতে থাকবে। এর মধ্যে যেটা খুশি কিংবা দুই রকমই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে করতে পারো—যেটা যখন স্বাভাবিক রকমে

আসবে কিংবা সেই সময়টিতে যেদিকে মন টানবে। প্রথম অবস্থাতে বিশেষ ক'রে যা প্রয়োজন তা হলো মনকে শান্ত ও সুস্থির করা, ধ্যানের সময়ে সাধনার পক্ষে অবাঞ্ছিত যত কিছু মানসিক চিন্তা ও ক্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করা। স্থির মনের অবস্থাতেই অনুভূতি আসার পক্ষে উত্তরোত্তর একটা প্রস্তুতি ঘটতে থাকবে। কিন্তু অধৈর্য হওয়া কিছুতেই চলবেনা, যদিও এসব। এক কালে না হতে পারে। মনের মধ্যে পূর্ণ স্থিরতা আনতে সময় লাগে অতএব তোমাকে বরাবর চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত চেতনা প্রস্তুত হয়ে না উঠছে।

*   *   *

এ যোগের পক্ষে সব কিছুই নির্ভর করছে এরই উপর যে তুমি ভগবৎ প্রভাব গ্রহণের দিকে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারো কিনা। যদি তোমার আস্পৃহাতে তেমন ঐকান্তিকতা থাকে আর সকল রকম বাধা সত্ত্বেও উচ্চতর চেতনাতে পৌছবার জন্য ধৈর্যপূর্ণ আগ্রহ থাকে, তাহলে একভাবে বা অন্য ভাবে সে উদ্‌ঘাটন নিশ্চয়ই আসবে। এ যোগের পক্ষে আর অন্য কোনো পদ্ধতি নেই, কেবল একাগ্র হওয়া, বিশেষ ক'রে হৃদয়ের মধ্যে, এবং মায়ের উপস্থিতিকে ও শক্তিকে আহ্বান করা, যেন তিনি তোমার সত্তাকে নিয়ে তাঁর শক্তির ক্রিয়াতে তোমার চেতনার রূপান্তর এনে দেন ; এই একাগ্রতা মাথার মধ্যে কিংবা ভ্রূমধ্যেও আনতে পারো, কিন্তু অনেকের পক্ষেই তা কঠিন হয়। যখন মন হয়েছে নীরব এবং একাগ্রতা ও আস্পৃহাও হয়ে উঠেছে তীব্র, তখন অনুভূতি আসার সূত্রপাত হয়। আস্থা ও শ্রদ্ধা যতই বেশি হবে, ফলও তত শীঘ্রই মিলতে পারবে। তারপর বাকী কথা এই যে কেবল নিজের প্রচেষ্টার উপরেই নির্ভর করে থাকলে চলবেনা, ভগবানের সঙ্গে একটা সংযোগ ও সংস্পর্শ স্থাপন এবং মায়ের শক্তি ও উপস্থিতি সম্বন্ধে একটা গ্রহিষ্ণুতাও অর্জন করা চাই।

কামনা, আহার ও যৌনতা সম্বন্ধে

প্রাণসত্তার দ্বারা যা কিছু ক্রিয়া হয় তা ভিতরকার আসল সত্তাটির ক্রিয়া নয়, সেগুলি বাইরের থেকে আসে ; তা আত্মার জিনিস নয় এবং আত্মার মধ্যে উদ্ভূতও হয়না, ওগুলি আসে সাধারণ প্রকৃতি থেকে এক এক তরঙ্গ রূপে।

কামনাও আসে বাহির থেকে। প্রাণের অবচেতনের মধ্যে প্রথমে ঢোকে, তারপর সেখান থেকে চেতনার উপরে বেরিয়ে পড়ে, তখনই মন তার সম্বন্ধে টের পায়, আর তখনই আমরা আমাদের নিজের কামনা জাগছে বলে জানতে পারি। তাকে তখন আমাদের নিজের জিনিস বলে মনে হয়, কারণ আমরা বোধ করতে থাকি যে তা প্রাণ থেকে উঠে মনের মধ্যে এলো, তা যে বাইরের থেকে এসেছে সেকথা আমরা বুঝতে পারিনা। প্রাণের এবং সত্তার তরফের যে জিনিস, যার জন্য তাকে দায়ী বলা যায়, সে ঐ কামনাটি নয়—কিন্তু তা হলো ওতে সায় দেবার অভ্যাস, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে যখম ঐ জিনিসের প্রস্তাব নিয়ে কোনো তরঙ্গ এসে ঢোকে তখন আমরা তাতে ঐভাবে সায় দিয়ে থাকি।

* * *

কামনা করা ও 'চাওয়া' হলো একই জিনিসের দুটি বিভিন্ন রূপ—কামনাতে যে মনোভাব উত্তেজিত বা অস্থির হয়ে উঠবে এমন কোনো কথা নেই; বরং নীরবে তা স্থায়ী হয়েও থাকতে পারে কিংবা অনবরত ফিরে ফিরেও আসতে পারে। কামনা বা চাওয়ার তাগিদ আসে মন কিংবা প্রাণের দিক থেকে, কিন্তু চৈত্য বা আধ্যাত্মিক চাহিদা হলো স্বতন্ত্র জিনিস। চৈত্য কিছু চায়ওনা বা কামনাও করেনা—সে করে আস্পৃহা; চৈত্য তার সমর্পণের মধ্যে কোনো শর্ত আরোপ করেনা, কিংবা আস্পৃহাটি তখনই পূরণ হলোনা বলে তাকে ফিরিয়েও নেয়না—কারণ ভগবান বা গুরুর উপর তার সম্পূর্ণ আস্থা, সে ভগবৎ কৃপা নিশ্চয় আসবে জেনে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করে।

* * *

কামনাকে একেবারে দূর করতে যথেষ্ট সময় লাগে। কিন্তু তুমি যদি তাকে আপন প্রকৃতি হতে বাদ দিতে পারো এবং এটা উপলব্ধি করতে পারো যে তা বাইরের থেকে এসে তোমার প্রাণ ও দেহের উপর তার থাবা বসাচ্ছে, তাহলে সেই আক্রমণকারীকে তাড়াতে পারা সহজ হয়ে আসবে। তুমি এটাই বরাবর বোধ করতে অভ্যস্ত হয়েছ যে ওটা তোমার নিজেরই অংশ স্বরূপ কিংবা তোমার মধ্যেই রোপিত হয়ে আছে—তাতেই তোমার উপর তার পুরাণো কর্তৃত্বকে ও তার অভ্যস্ত ক্রিয়াগুলিকে ঘোচানো আরো বেশি কঠিন হয়।

* * *

আহারে আসক্তি, খাবার জন্য লোভ এবং ঔৎসুক্য, জীবনের মধ্যে তাকেই অন্যায্য রকমের একটা গুরুত্ব দিতে থাকা, এটা যোগের মনোভাবের পক্ষে প্রতিকূল। খেতে ভালো লাগছে, কিছু খেয়ে রসনাতে তৃপ্তিবোধ হচ্ছে, এমন বোধ করার মধ্যে দোষের কিছু মেই ; কিন্তু তার জন্য কামনা বা লিপ্সা থাকা উচিত নয়, পেলে মহাউল্লসিত হওয়া উচিত নয়, না পেলে অসন্তুষ্ট বা ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। অবিচলতা ও সমতা বজায় রাখতে হবে, খাদ্য তেমন আস্বাদযুক্ত না হলে বা পরিমাণে যথেষ্ট না হলে তাই নিয়ে উত্তেজিত বা ক্ষুণ্ণ হওয়া চলবেনা। নির্দিষ্ট পরিমাণে যতটুকু খাওয়া দরকার ততটুকুই খাবে, কমও নয় বেশিও নয়। আর খাদ্য সম্বন্ধে ব্যগ্রতাও থাকবেনা, বিরাগও থাকবেনা।

*   *   *

অতঃপর যৌন প্রবৃত্তি সম্বন্ধে। একে বীভৎস একটা পাপকাজ অথচ লোভনীয় জিনিস ভাবা ঠিক নয়, নিম্নপ্রকৃতির একটা ভ্রান্ত ও অনুচিত কাজ বলেই একে ভাববে। একে পুরোপুরি ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে, কিন্তু ওর সঙ্গে লড়াই ক'রে নয়, নিজেকে ওর থেকে সরিয়ে নিয়ে এবং নিজের ওতে সম্মতি না দিয়ে। একে তোমার নিজের জিনিস হিসেবে দেখবেনা, দেখবে যে বাইরের থেকে প্রকৃতির শক্তি ওটা তোমার উপরে আরোপ করছে। সেটাকে তুমি মেনে নেবেনা। যদি দেখ যে তোমার প্রাণসত্তার কোনো অংশ তাতে সম্মতি দিতে চাইছে, তখন সেই অংশের উপর জোর করবে সেই সম্মতিকে প্রত্যাহার ক'রে নিতে। আর ভগবৎ শক্তিকে আহ্বান করবে সে বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করতে। যদি স্থির ও অটল ভাবে এবং ধৈর্যের সঙ্গে এই করতে থাকো, তাহলে অবশেষে তোমার আভ্যন্তর ইচ্ছা সেই বাহ্য প্রকৃতির অভ্যাসের উপর প্রাধান্য স্থাপন করবে।

অর্থ সম্বন্ধে

অর্থ হলো এক বিশ্বশক্তির দৃশ্য রূপ, যা তার পার্থিব অভিব্যক্তির দ্বারা প্রাণিক ও দৈহিকের স্তরে ক্রিয়া করে, এবং বাহ্য জীবনের পূর্ণতার পক্ষে যা অপরিহার্য। মূলতঃ এবং এর সত্যিকার কাজের দিক দিয়ে এটি ভগবানেরই জিনিস। কিন্তু যেমন ভগবানের অন্যান্য শক্তির বেলাতে তেমনি এর

বেলাতেও, একে এখানে পাঠানোর পরে নিম্ন প্রকৃতির অজ্ঞানতার দ্বারা একে অন্যায় পূর্বক অধিকার ক'রে নেওয়া ব্যক্তিগত অহংএর পুষ্টির জন্য, কিংবা আসুরিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়াতে তারই কাজে লাগিয়ে এর আসল উদ্দেশ্যকে বিকৃত করা সম্ভব হয়েছে। ক্ষমতা, সম্পদ এবং যৌনতা—এই তিনটি শক্তির কেবল মানবের ভিতবকার অহং ও অসুরের দিকে সর্বাপেক্ষা প্রবল আকর্ষণ, সেইজন্য যারা এই শক্তিগুলির অধিকারী হয় তারা সাধারণত ঐ কারণেই এগুলিকে ধরে রাখে এবং তার অপব্যবহার করে। যারা সম্পদ পায় বা তার রক্ষক হয়, তারা প্রায়ই সেই সম্পদের প্রভু হয়ে থাকার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে সম্পদই তাদের প্রভু হয়ে দাঁড়ায়; বহুকাল ধরে রাখলে আসুরিক একরূপ বিকৃতিসূচক প্রভাবে ওর দ্বারা যে ছাপ পড়ে, খুব কম লোকই তার থেকে মুক্ত হতে পাবে। এই কারণে অধিকাংশ আধ্যাত্মিক অনুশাসনেই বলা হয় সম্পূর্ণ আত্মসংযত হয়ে সম্পদের সকল রূপ বন্ধনকে বর্জন ক'রে ওব সম্বন্ধে অনাসক্ত হতে, এবং সম্পদ লাভেব জন্য সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও অহংগত কামনাকে পরিত্যাগ করতে। এমনকি কোনো কোনো নীতিতে অর্থ ও সম্পদ একেবারে নিষিদ্ধ, এবং আধ্যাত্মিক সাধনের পক্ষে দারিদ্র্য এবং সম্পদরিক্ত জীবনই একমাত্র কাম্য। কিন্তু তাতে এই ভুল করা হয় যে এই শক্তিকে বিরোধী শক্তিদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়। আমাদেব সাধকেব পক্ষে অতিমানসিক পন্থা হবে ভগবানের জিনিস ভগবানের জন্যই পুনরুদ্ধাব ক'রে দিব্যভাবে দিব্য জীবনের প্রয়োজনে তার সদ্ব্যবহার করা।

অর্থশক্তিকে এবং তার দ্বারা যে সকল সুযোগ ও যেসব বস্তু মেলে সেগুলিকে সন্ন্যাসীর মতো হাত গুটিয়ে প্রত্যাখ্যানও কববেনা, আবার তাব প্রতি রাজসিক আসক্তি বা আত্মসুখ পূরণের জন্য তার সম্বন্ধে দাসত্ব ভাবও পোষণ করবেনা। সম্পদ কেবল একটা শক্তি, যাকে মায়ের জন্য এবং মায়েব কাজে দেবার জন্য আয়ত্ত করা দরকার, এই মনোভাবই গ্রহণ করবে।

সকল সম্পদই ভগবানের জিনিস। যারা তার অধিকারী তাদের কাছে তা গচ্ছিত স্বরূপ রাখা হয়েছে, তারা তার প্রকৃত মালিক নয়। আজ রয়েছে তাদের কাছে, কাল তা অন্যত্র চলে যেতে পারে। সমস্তই নির্ভর করে কেমন প্রকারে, কোন মনোভাব ও কোন চেতনা নিয়ে এবং কোন প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা হচ্ছে তারই উপর।

তোমার নিজের বেলাতে অর্থের ব্যবহার সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গী নেবে যে

তোমার হাতে যা রয়েছে বা যা কিছু পাচ্ছ বা আনছ তা সবই হলো মায়ের। কোনো রকম দাবি না ক'রে তিনি যা দিচ্ছেন তা গ্রহণ করবে এবং যে উদ্দেশ্যে তা দেওয়া হয়েছে তারই জন্য তা ব্যবহার করবে। একেবারে স্বার্থশূন্য ও সম্পূর্ণ হুঁশিয়ার হয়ে, কড়াক্রান্তির নিখুঁত হিসাব রেখে মায়ের উত্তম খাজাঞ্চী বা তবিলদার বনে যাও; সর্বদাই মনে রেখো যে তুমি যে অর্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করছ আর খরচ করছ তা মায়ের অর্থ, তোমার নিজের নয়। তাছাড়া তাঁর জন্য যা কিছু পাও তা একান্তভাবে তাঁকেই দাও, নিজের বা অন্য কারো জন্য কিছু বাজে খরচ না ক'রে।

যারা ধনী হয়েছে তাদের ধন আছে বলে বড়ো ক'রে দেখোনা, কিংবা তাদের জাঁকজমকে বা শক্তি বা প্রভাব দেখে ভুলোনা। মায়ের নামে যখন তুমি তাদের কিছু চাইবে, তখন মনে করবে যে তিনিই তোমার মাধ্যমে তাঁর নিজেরই জিনিস থেকে সামান্য কিছু চাইছেন, তারা কি ভাবে তাতে সাড়া দেয় তাই দিয়ে তার বিচার হবে।

এইভাবে যদি তুমি অর্থ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক থাকো, অথচ সন্ন্যাসীর মতো নিবৃত্তিও যদি তোমার না থাকে, তাহলে দিব্যকর্ম সাধনের জন্য তোমার কাছে অর্থশক্তির মূল্য অনেক বেশি বেড়ে যাবে এবং তুমি তাই দিয়ে অনেক বেশি দরকারী কাজ করতে পারবে। মনের মধ্যে সমতা থাকা, কোনো চাহিদা না থাকা, তোমার যা কিছু আছে বা পাচ্ছ তা সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করা, এবং অর্থোপার্জনের সমস্ত শক্তিকে দিব্যশক্তির কাজে উৎসর্গ করা, এইগুলোই হলো এ বিষয়ে মুক্তির লক্ষণ। অর্থ ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে মনের সামান্যমাত্র বিচলতা, বা কোনো দাবি বা কাতরতা বোধ করা, এগুলি হলো অপূর্ণতা বা লিপ্ততার লক্ষণ।

এই ধরনের আদর্শ-সাধক সেই হবে, যে দরকার হলে অতি দরিদ্রভাবেও থাকতে পারবে অথচ কিছু অভাববোধের দ্বারা ক্লিষ্ট হবেনা, অথবা তার ওতে ভিতরকার দিব্য চেতনার ক্রিয়াগুলি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবেনা; আর যদি তার কখনো ধনী হয়ে থাকার দরকার হয়, তাও সে পারবে কিছুমাত্র কামনা বা আসক্তির বন্ধনে না পড়ে, যে সব মূল্যবান জিনিস সে ব্যবহার করছে তার দাস না হয়ে বা কিছুমাত্র আত্মপ্রশ্রয় না দিয়ে, কিংবা ধনী হওয়ার ফলে যে সকল অভ্যাস এসে পড়ে তার মধ্যে কিছুমাত্র জড়িত না হয়ে। ভগবৎ ইচ্ছাই এবং দিব্য আনন্দই তার কাছে সব কিছু, এই ভাব নিয়ে সে থাকবে।

অতিমানসের সৃষ্টিতে অর্থশক্তি আবার ফিরে যাবে দিব্যশক্তির অধিকারে, এবং ভগবতী মাতা স্বয়ং তাঁর সৃষ্টিমূলক দৃষ্টিতে যেমন ভাবে নিরূপণ করবেন সেই ভাবেই একটা নবতর দিব্য ভাবাপন্ন দেহপ্রাণগত অস্তিত্বকে সুষ্ঠু ও সত্য ও সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য যেমন যেমন প্রয়োজন সেইভাবে তা ব্যবহৃত হবে। কিন্তু সর্বাগ্রে তা মায়ের জন্য পুনর্দখল ক'রে আনা দরকার, এবং তারাই হবে তাকে জয় করে আনার পক্ষে সবচেয়ে বলবান সৈনিক যারা তাদের প্রকৃতির এই দিক দিয়ে সরল ও বৃহৎ ও অহংবর্জিত, এবং যারা বিনা দাবিতে ও বিনা দ্বিধায় সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়ে পরমতম শক্তির বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় আধার হতে পেরেছে।

চৈত্য অথবা আত্মা

আত্মাকে যে বলা হয়েছে জীবন ও জড়ের মধ্যে দিব্য অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, সেটা প্রতিরূপ হিসাবে। তা যে চেতনার স্ফুলিঙ্গ এমন কথা বলা হয়নি।

মনের প্রাণের ও দেহের আলাদা আলাদা চেতনা আছে—যা চৈত্য চেতনা থেকে স্বতন্ত্র। চৈত্য-সত্তা আর চৈত্য-চেতনা এক জিনিস নয়।

যখন আত্মা বা যাকে বলা হয়েছে 'দিব্য অগ্নির স্ফুলিঙ্গ'—সে একটি চৈত্য ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে, সেই ব্যক্তিত্বের সত্তাকে বলা হয় চৈত্য সত্তা।

আত্মা বা সেই স্ফুলিঙ্গ থাকে প্রাণ ও মন গড়ে ওঠার আগে হতেই। আত্মা হলো ঈশ্বরের কিছু অংশ যা বিবর্তনের ক্ষেত্রে নেমে আসে তার মধ্যে একটি দিব্য বীজ হয়ে, যাকে অবলম্বন ক'রে একটি ব্যক্তিসত্তা ক্রমবিবর্তিত হয়ে উঠতে থাকে অবিদ্যার অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে। সেই ক্রমবিবর্তনের দ্বারা সেটি ক্রমশ গড়ে ওঠে একটি চৈত্য সত্তা বা আত্মিক ব্যক্তিত্বে, জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে, বিবর্তনমুখী মনপ্রাণ ও দেহকে তার পার্থিব যন্ত্রস্বরূপ ক'রে। আত্মাই কেবল অমর থাকে, বাকী সব কিছু নশ্বর; সেই আত্মা এক জীবন থেকে অন্য জীবনে তার লব্ধ অভিজ্ঞতার সারটুকুকে এবং ব্যক্তিত্বের বিবর্তনকে বজায় রেখে ক্রমিক ভাবে তাকে টেনে নিয়ে যায়।

...চৈত্য হলো সেই আত্মা বা দিব্য অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যাকে অবলম্বন ক'রে পৃথিবীতে ব্যক্তিত্বের ক্রমবিবর্তন হতে থাকে, এবং চৈত্য-সত্তা হলো ক্রমবিকাশমান আত্মিক চেতনা বা জীবন থেকে জীবনে তার ক্রমাভিব্যক্তি,

ন প্রাণ দেহকে তার যন্ত্রস্বরূপ ক'রে নিয়ে—যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভগবানের ঙ্গে পুনর্মিলিত হবার জন্য প্রস্তুত ও উপযুক্ত হয়ে না উঠছে।

চৈত্যসত্তা সর্বদা আছেই ভিতরে, কিন্তু মন ও প্রাণের দ্বারা আবৃত হয়ে থাকায় তাকে অনুভব করা যায়না; যখন সে আবরণমুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় ওর 'জেগে ওঠা'। যখন সে জেগে ওঠে তখন সত্তার অন্যান্য সকল অংশকে আপন অধিকারগত ক'রে নিয়ে তার এরূপ রূপান্তর ঘটায় যাতে সব কিছুই আভ্যন্তরীণ আত্মার খাঁটী অভিব্যক্তিস্বরূপ হতে পারে। এরূপ পরিবর্তনকেই বলা হয় আভ্যন্তরীণ রূপান্তর ক্রিয়া। চৈত্য সত্তার জাগরণ না হলে তা হতে পারেনা।

*   *   *

চৈত্যসত্তা যখন সম্মুখবর্তী হয়ে প্রকট হয়, তখন আপনা হতেই এসে যায় সত্য ও মিথ্যার সম্বন্ধে সঠিক বোধ, দিব্য ও অদিব্যের জ্ঞান, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ভালো এবং মন্দের পার্থক্য, আর প্রাণ ও মনের যা কিছু ভুল কাজ ও তার আক্রমণ তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে যাওয়াতে তা ব্যর্থ হয়ে যায়, এবং তার দ্বারা কোনোই ক্ষতি হয়না……

*   *   *

চৈত্যসত্তা জাগ্রত হলে তখন তুমি আপন আত্মা সম্বন্ধে চেতন হতে পারো; তুমি নিজেকে জানতে পারো। তখন আর তুমি তোমার মন ও প্রাণকে 'আমি' বলে ভুল করোনা। ঐগুলিকে নিজের আত্মা বলেও আর ভুল করোনা।

দ্বিতীয়ত, চৈত্যসত্তা জাগ্রত হলে ভগবানের প্রতি বা গুরুর প্রতি প্রকৃত ভক্তির উদয় হয়। মন প্রাণের ভক্তি থেকে সেই ভক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

*   *   *

চৈত্য ভক্তির কোনো কিছু দাবি নেই, কোনো কিছু হাতে রাখা নেই। আপনার অস্তিত্বে সে আপনি তুষ্ট। চৈত্যসত্তাই জানে কেমন ভাবে সঠিক রাস্তায় সত্যকে মেনে চলতে হয়। সে ভগবানের কাছে বা গুরুর কাছে

প্রকৃতই আত্মদান করে, সুতরাং প্রকৃতরূপে কেমনভাবে তার ফল গ্রহণ করতে হয় তাও সে জানে।

* * *

অবিরাম ঐকান্তিক আস্পৃহা বজায় রাখা, আর কেবল ভগবানের দিকে ফিরে থাকার ইচ্ছা করা, এই হলো চৈত্যকে প্রকাশিত করবার শ্রেষ্ঠ পন্থা।

আত্মা অথবা চৈত্য হলো আমাদের সত্তার শাশ্বত বস্তু, যা আমাদের মৃত্যুহীন ও সীমাহীন মূল ব্যক্তিত্ব। এই চৈত্য আছে বলেই আমরা ভগবানের দিকে বা শাশ্বত অনন্তের দিকে ফিরতে পারি। এই চৈত্য যখন জাগে তখন তার প্রভাব আমাদের প্রকৃতির সর্বত্র সমানে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তাতে ভগবতী মায়ের কাছে আমাদের সমর্পণ কেবল সম্ভবই হয়না, কিন্তু সে সমর্পণ সানন্দে ও সোৎসাহে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে; আর সেই সমর্পণ ও উদ্‌ঘাটনের ফলে মায়ের অতিমানস শক্তিও সরাসরি আমাদের উপর কাজ করতে থাকে। এই মা, এই ভাগবতী শক্তি স্বয়ংই সাধনা করেন প্রত্যেক সাধকের মধ্যে, এবং অভাবনীয় ও অব্যর্থ উপায়ে তাকে দিব্য জীবনের অতিমানস সিদ্ধির মহিমাতে উন্নীত ক'রে দেন।

ঊর্ধ্বে আরোহণ

আরোহণ বা ঊর্ধ্বগতি তখনই হতে পারে যখন সত্তার ভিতর থেকে, অর্থাৎ মন প্রাণ দেহের সকল স্তর থেকে যথেষ্ট আস্পৃহার বেগ জন্মাতে থাকে। প্রত্যেকেই তখন মনের উপরকার সেই বিশেষ স্থানে গিয়ে ওঠে যেখানে সে অতিমানসের সাক্ষাৎ পায় এবং উপর থেকে তার সকল ক্রিয়ার আদি উৎপত্তিকে গ্রহণ করতে পারে। আর উপরের জিনিস তোমার মধ্যে নেমে আসে যখন তুমি সত্তার সকল স্তরে স্থির প্রশান্ত ও গ্রহিষ্ণু হয়ে তাকে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত থাকো। দুইরূপ ক্ষেত্রেই অর্থাৎ ঊর্ধ্বের স্তরে উঠে যাবার জন্য আস্পৃহাই করো, অথবা তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করবার জন্য প্রশান্ত ও উন্মীলিত হয়েই থাকো, সত্তার সর্বাংশে একটা পুরোপুরি রকমের স্থিরতা ও অচঞ্চলতা থাকাই তার পক্ষে উপযোগী অবস্থা।

নীরব আস্পৃহা বা ইচ্ছা করার মধ্যে যদি তেমন শক্তিতেজ না পাও

এবং যদি মনে হয় যে ঊর্ধ্বমুখে ওঠার পক্ষে সাহায্যের জন্য খানিকটা সক্রিয় প্রয়াস থাকা দরকার, তাহলে সাময়িক ভাবে তার সাহায্যও নিতে পারো, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই স্বাভাবিক উন্মীলনের অবস্থা না আসে, যখন নীরব আহ্বান বা সহজ অপ্রয়াসী ইচ্ছার দ্বারাই উচ্চশক্তির ক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারবে।

অবতরণ

অবতরণ হয় উচ্চতর চেতনার শক্তিগুলির, যে জিনিস থাকে মাথার উপর দিকে। সে শক্তি নেমে আসে কেন্দ্র হতে কেন্দ্রে, তারপর সমগ্র সত্তাকেই ক্রমে অধিকার করে। কিন্তু প্রথম অবস্থাতে তার ক্রিয়া হয় অনিত্য রকমের। কেবল যখন উপরের শান্তি নেমে এসে সর্ব সত্তাতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হতে পেরেছে, তখনই তার ক্রিয়া অবিচ্ছিন্ন রকমের হতে পারে। এ অবতরণ আসে চেতনার রূপান্তর ঘটাতে, কিন্তু তাতে যথেষ্ট সময় লাগে। সে কাজ মুহূর্তের মধ্যে হয়না।

অবতরণের উদ্দেশ্য

উচ্চশক্তি অবতরণ করে দুটি জিনিসের জন্য—

(১) প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাতে।

(২) আমাদের যন্ত্রের ভিতর দিয়ে তার কাজ ক'রে যেতে।

প্রথম অবস্থায় এ দুটির কোনোটাই হচ্ছে বলে জানা যায়না, কিন্তু পরে জানা যায় যে সেই শক্তির কাজ হচ্ছে, কিন্তু কেমন ভাবে হচ্ছে তা বোঝা যায়না। শেষকালে তার সবই বিশদভাবে বুঝতে পারা যায়।

দেহেতে উচ্চতর চেতনার অবতরণের ফল

নিতান্ত স্থূল দেহেতেও সেই চেতনার অবতরণে কিছু ফল দেখা যায়। দেহের কোষগুলির মধ্যে এবং দৈহিক ক্রিয়াগুলির মধ্যেও আসে আলো, চেতনা, শক্তি ও আনন্দ। দেহ বেশ সচেতন ও সতর্ক হয়ে উপরের ইচ্ছা অনুযায়ী সঠিক ভাবে ক্রিয়াগুলি করতে থাকে, অথবা নবাগত চেতনার জোরে

আপনা হতেই সেরূপ করে। তখন শারীরিক ক্রিয়াগুলিকে শাসনে আনাও সম্ভব হয়, এবং যা কিছু ভুল ত্রুটি থাকে সেগুলির সংশোধন করা যায়, রোগ পীড়া ও ব্যথা বেদনাকেও দূর করা যায় ইত্যাদি। তখন দেহের সকল ক্রিয়ার উপরে এবং বাহির থেকে যা কিছু ঘটে তারও উপরে একটা প্রতিরোধক শক্তি আসে, তাই দুর্ঘটনা ও ছোটোখাটো বিপদ আপদের মাত্রা অনেক কমে যায়। দেহটি কাজের পক্ষে আরো বেশি উপযুক্ত যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। কাজে ক্লান্তি আসাও অনেক কমিয়ে দেওয়া যায়। দেহের সর্বাংশে এসে পড়ে একটা শান্তি, স্ফূর্তি, শক্তিবোধ ও লঘুতা।......

দিব্য শক্তি ও পূর্ণ রূপান্তর

আমাদের খণ্ডিত সত্তাকে পূর্ণ ও অখণ্ড ক'রে আনার দ্বারাই যোগের ভিতর দিয়ে দিব্য শক্তি তার উদ্দেশ্য সাধন করে; মুক্তি, সিদ্ধি, শক্তিলাভ সবই নির্ভর করে এই সর্বসম্পূর্ণতা লাভের উপর, কারণ উপরদিকের ছোটো ছোটো যত তরঙ্গ বিক্ষোভ তার নিজের ক্রিয়াকেই সামলাতে পারেনা, চারিপাশের বিশাল প্রাণের কথা ছেড়েই দিলাম। যিনি শক্তিরূপিণী, অর্থাৎ স্বয়ং যিনি অনন্তের ও শাশ্বতের শক্তি তিনিই এর জন্য নেমে আসবেন আমাদের মধ্যে, যা করবার তা তিনিই করবেন, আমাদের বর্তমান এই মনস্তাত্ত্বিক গঠনকে ভেঙে দেবেন, প্রত্যেকটি দেয়াল ভেঙে চূর্ণ ক'রে দেবেন, সত্তাকে মুক্ত ক'রে দেবেন, তাকে যথোচিত ভাবে প্রশস্ত ক'রে দেবেন, উত্তরোত্তর নতুন ও বৃহত্তর রকমের দৃষ্টিশক্তি দান করতে থাকবেন, নতুন রকমের ধারণাশক্তি ও অনুভব ও বৃহত্তর জীবনোদ্দেশ্য এনে দেবেন, আত্মাকে ও তার যন্ত্রগুলিকে উত্তরোত্তর নতুন ছাঁচে ঢেলে বড়ো ক'রে তুলবেন, প্রত্যেকটি অপূর্ণতাকে দোষের জিনিষ জানিয়ে নষ্ট ক'রে ফেলার জন্য চোখের সামনে এনে হাজির করবেন, বড়ো রকমের পূর্ণতার দিকে আমাদের সত্তাকে উন্মীলিত করবেন, যে কাজ সম্পন্ন হতে অনেক জন্ম বা অনেক যুগ লেগে যেতো তা অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন ক'রে দেবেন, যাতে নিত্যই আমাদের মধ্যে নব নব জন্মলাভ হয়ে নতুন নতুন খুলে যেতে থাকে, সবদিক থেকেই তা করবেন। তাঁর দিব্য ক্রিয়া হলো নিত্য-প্রসারী, তাই তিনি দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকা চেতনাকে মুক্ত ক'রে বের ক'রে দেন; সে চেতনা মুক্ত হয়ে চলে যেতে পারে সমাধি বা সুপ্তির মধ্যে, বা

এমন কি জাগ্রত অবস্থাতেও চলে যেতে পারে অন্যান্য জগতে কিংবা এই জগতেরই অন্যান্য স্থানে, এবং সেখানে কিছু কাজ ক'রে আসতে বা সেখান থেকে কিছু অনুভূতি নিয়ে আসতে পারে। সেই চেতনা তখন প্রসারিত হয়ে যাওয়াতে দেহটাকে নিজের একটা সামান্য অংশমাত্র বলেই গণ্য করে, এবং যার মধ্যে নিজে আগে বিধৃত হয়ে ছিল তাকেই এখন নিজের মধ্যে বিধৃত ক'রে নেয়; বিশ্বচেতনা অর্জন ক'রে এবং যথেষ্ট প্রসারিত হয়ে সে তখন বিশ্বের সঙ্গেই নিজেকে সমান বোধ করতে পারে। আর ওর ফলে সে তখন শুধু বাইরে দেখেই নয় কিন্তু ভিতর থেকেই সরাসরি সব কিছু জানতে পারে, এবং জগতের মধ্যে যে শক্তি ক্রিয়া করছে তার সংস্পর্শে এসে তার গতিবিধি অনুভব করতে পারে, তার ক্রিয়ার ভালোমন্দ বুঝে তখনই তার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে—যেমন ভাবে বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপর হস্তক্ষেপ ক'রে থাকে, এবং আমাদের মন প্রাণ দেহের উপর তার ফলাফল হয়তো মেনে নেয় নতুবা তাদের মধ্যে পরিবর্তন এনে ও অদলবদল ক'রে নতুন আকার দিয়ে আগেকার প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্রিয়াগুলির বদলে তাদের নতুন রকমের বিরাট শক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে দেয়। আর তখন আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে বিশ্বমানসের শক্তি কেমন ভাবে কাজ করছে, তার দ্বারা কেমন ভাবে আমাদের মনের চিন্তাগুলির সৃষ্টি হচ্ছে। ভিতর থেকে আমাদের সত্য মিথ্যার অনুভবকে তাতে তফাৎ ক'রে দেয়, সেই অনুভবের ক্ষেত্র বাড়িয়ে তার যা কিছু তাৎপর্য তাকে আলো দিয়ে ফুটিয়ে তোলে, তাতে আমরা নিজেদের মন ও তার ক্রিয়ার উপর প্রভুত্ব স্থাপন ক'রে আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের মনের ক্রিয়াকেও গঠন দিতে সক্ষম হই। তখন আমরা বিশ্বময় প্রাণশক্তির তরঙ্গ প্রবাহকে প্রত্যক্ষ করতে থাকি, আর আমাদের যত কিছু অনুভব ও আবেগাদির, সংবেদন ও অনুরাগ বিরাগাদির উৎপত্তি কোথায় ও কিরূপ তার নিয়মধারা তার সন্ধান পেয়ে যাই, এবং ইচ্ছামত তাকে গ্রহণ করতে বা ত্যাগ করতে অথবা নতুন ভাবে তাকে গড়ে নিয়ে প্রাণশক্তির উচ্চ স্তরে উঠে যেতে পারি। তাছাড়া জড়ের গুহ্য রহস্যের অর্থকেও আমরা অনুধাবন করতে থাকি, তার উপরে মন ও প্রাণ ও চেতনার ক্রিয়াগুলিকেও অনুসরণ করতে পারি, তার যন্ত্রস্বরূপ কার্য-কারণ পরম্পরাকে উত্তরোত্তর আবিষ্কার ক'রে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই যে জড় কেবল শক্তি তেজেরই একটা আকার গ্রহণ মাত্র নয় কিন্তু তাও নিবর্তিত বা স্তম্ভিত বা অস্থায়ী ভাবে জড়ে

নিরূপিত একরূপ চেতনা, এবং তারও সম্ভাবনা রয়েছে মুক্তির ও উচ্চতর শক্তির কাছে সাড়া দেবার মতো নমনীয়তা আসার, তারও সম্ভাবনা রয়েছে অতঃপর আর ঐরূপ প্রায় অচেতন অবস্থাতে আত্মার জড়-অভিব্যক্তি হয়ে না থেকে চেতন হয়েই ওঠার। ভগবৎ শক্তির ক্রিয়া যখন আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে তখন এত কিছু সবই সম্ভব হতে পারে, এবং আমাদের তমসাবৃত চেতনার নির্দেশের ও প্রতিরোধের বিরুদ্ধে যথেষ্ট লড়াই করতে হলেও, এবং অর্ধ-নিশ্চেতন জিনিসকে পূর্ণ-সচেতন জিনিসে সম্যক ভাবে রূপান্তরিত ক'রে আনার ক্রিয়ার দরুন একবার এগোনো একবার পিছানো ও পুনরায় এগোনো পুনরায় পিছানোর প্রয়োজন হলেও—তার দ্বারা আমাদের নীত করে আনে অধিকতর বিশুদ্ধতায় ও সত্যে, অধিকতর উচ্চতায় ও পরিসরে। সবই নির্ভর করে আমাদের ভিতরকার চৈত্যের জাগরণের উপর, সেই মাতৃশক্তির কাছে উন্মীলন ও ক্রমবর্ধমান সমর্পণের উপর।

ত্রয়ী রূপান্তর

[শ্রীঅরবিন্দের যোগের মূল লক্ষ্য হলো মানব চেতনা ও মানব প্রকৃতিকে দিব্য চেতনা ও দিব্য প্রকৃতিতে সম্যকভাবে রূপান্তরিত করা। এই রূপান্তর আনার তিনটি ধাপ আছে, যার কথা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সুবৃহৎ "দিব্য জীবন" ("The Life Divine") পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে তার কিছু কিছু সার অংশ উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া হলো, যাতে ঐ তিনটি বিভিন্ন ধাপের প্রকৃতি ও পরিণতি সম্বন্ধে কিছু ধারণা হতে পারে।]

চৈত্য রূপান্তর

বাহ্য প্রকৃতির পুরু ছালটাতে ফাটল ধরে ভিতরকার আড়ালের দেয়ালগুলি যখন ভেঙে পড়ে এবং তার ভিতর দিয়ে আভ্যন্তরীণ আলো প্রবেশ ক'রে হৃদয়ের মধ্যে আভ্যন্তরীণ আগুন যখন জ্বলে ওঠে, তখন প্রকৃতির ও চেতনার যত কিছু ধাতুবস্তুগুলো সেই আগুনে অধিকতর পরিমার্জিত ও বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, আর সেই তরলতর ও সূক্ষ্ম জিনিসের মধ্যে তখন গভীরতর চৈত্য অনুভূতি আসা সম্ভব হয়, যার মধ্যে আভ্যন্তরীণ মনপ্রাণের চরিত্র বিশেষ কিছু থাকেনা,

তখন আত্মা আপন আবরণ উন্মোচন করতে শুরু করে, চৈত্য ব্যক্তিত্ব তার পূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পায়। যাকে বলি আত্মা, অর্থাৎ চৈত্য সত্তা, সে তখন কেন্দ্রবস্তুরূপে অভিব্যক্ত হয়ে মনপ্রাণ-দেহকে আপন কবলে এনে আত্মার সকল শক্তি ও সকল ক্রিয়াকে সমর্থন দিতে থাকে, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা সে আমাদের প্রকৃতির নিয়ন্তা ও শাস্তা হয়ে কাজ করতে থাকে। এই নিয়ন্ত্রণ ও শাসনকার্য ভিতরের দিক থেকে শুরু হয় এবং আমাদের প্রত্যেক কাজকে সত্যের আলোর কাছে খুলে ধরে, তাতে যা কিছু মিথ্যা ও অন্ধকার ও দিব্য উপলব্ধির বিরোধী সমস্তকেই সম্পূর্ণ নিবারণ করে। সত্তার প্রত্যেক অংশ, প্রত্যেকটি আনাচ-কানাচ, তার প্রত্যেকটি ক্রিয়া ও গঠন ও গতির দিক, তার চিন্তার ধরন, ইচ্ছা, আবেগ, অনুভব, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, মতলব, ভাবগতিক, চিকীর্ষা, কামনা, চেতন বা অবচেতন ও এমন কি অতিগোপন দুর্জ্ঞেয় ও মৌন নিগূঢ় দৈহিক অভ্যাসগুলি, সমস্তই সেই অভ্রান্ত চৈত্যের আলোতে আলোকিত হয়ে ওঠে। তার দরুন যা কিছু উদ্বেগাদি সব ঘুচে যায়, জট পাকানো সব ছেড়ে যায়, গণ্ডগোল ও আত্ম-প্রতারণা সমস্তই ধরা পড়ে গিয়ে দূর হয়ে যায়; সকলই হয়ে ওঠে বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত, সমগ্র প্রকৃতি হয় সঙ্গতিপূর্ণ ও চৈত্যের স্বরে স্বরবাঁধা, আধ্যাত্মিকের সুষ্ঠু ধারাতে ধারান্বিত। এ প্রক্রিয়া প্রকৃতির অভ্যাসগত বিচ্যুতি ও বিরোধিতার মাত্রা অনুসারে শীঘ্রও হতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার কাজ অপ্রতিহতভাবে চলতেই থাকে। তার শেষ ফল এই হয় যে সমগ্র চেতনা সকল প্রকার আধ্যাত্মিক অনুভূতি গ্রহণের জন্য তৈরি হয়ে ওঠে; চিন্তা, অনুভব, বোধ ও ক্রিয়া কেবল আধ্যাত্মিক ও সত্যমুখী হয়ে ওঠে, সত্যের সাড়া নেবার উপযোগী হয়, তামসিক জড়তার অন্ধতা ও অবাধ্যতা থেকে মুক্ত হয়, রাজসিক আবেগের ঘোলাটে ও অস্থির রকমের অসঙ্গতি ও অতিচাঞ্চল্য থেকেও মুক্ত হয়, আর সাত্ত্বিক দীপ্তিপ্রাপ্ত অতি-কঠোরতার ধরাবাঁধা সংকীর্ণতা থেকে বা গড়ে তোলা সাম্য স্থাপনের হিসাব করা থেকেও মুক্ত হয়—কারণ সেগুলি হলো সবই অজ্ঞানতার লক্ষণ।

* * *

এই হলো প্রথম ফল। কিন্তু দ্বিতীয় ফল হবে সকল প্রকার আধ্যাত্মিক অনুভূতির মুক্তভাবে প্রবেশলাভ। আত্মাকে অনুভূতি, ঐশ্বরিক ও ভগবতী শক্তির অনুভূতি, বিশ্বচেতনার অনুভূতি, বিশ্বশক্তিদের ও বিশ্বপ্রকৃতির গুহ্য

ক্রিয়াগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ, অন্যান্য সব সত্তার সঙ্গে ও প্রকৃতির সঙ্গে চৈত্য সহানুভূতি ও ঐক্য এবং সকলপ্রকার আদান প্রদান, মনের জ্ঞানদীপ্তি, হৃদয়ে প্রেম ভক্তির দীপ্তি, আধ্যাত্মিক আনন্দ ও মহোল্লাস, উচ্চতর অনুভূতির ফলে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতেও দীপ্তিলাভ, বিশুদ্ধীকৃত মন ও হৃদয় ও অন্তরাত্মার সত্য ও বৃহৎ রকমের সক্রিয়তার ক্ষেত্রে দীপ্তিলাভ, দিব্য জ্যোতি ও তার নির্দেশপ্রাপ্তির সম্বন্ধে একটা নিঃসন্দেহ নিশ্চয়তা, দিব্য শক্তি আমার ইচ্ছা ও চরিত্রের ভিতর দিয়ে ক্রিয়া করছে জেনে একটা আনন্দময় ক্ষমতাবোধ। এই সকল অনুভূতি মেলে আভ্যন্তর ও গভীরতম সত্তার ও প্রকৃতির বাহ্য উন্মীলন হবার ফলে; কারণ তখন আত্মার সহজাত অভ্রান্ত চেতনার শক্তিই কাজ করতে থাকে, তার দৃষ্টি ও স্পর্শ তখন সকল জিনিস সম্বন্ধেই যেমন ভাবে টের পায় তা মনের টের পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি; চৈত্যের চেতনার সুবিশুদ্ধ ক্রিয়ার দস্তুরই এই যে জগৎ ও তার ভিতরকার সকল প্রাণীর সম্বন্ধে সে তৎক্ষণাৎ সুবিদিত হতে পারে, কারণ সে ভিতরে ভিতরে তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে এবং আত্মার ও ভগবানের সঙ্গেও তার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ লাভ হয়—এ হলো প্রত্যক্ষ জ্ঞান, মূল সত্যকে ও সকল সত্যকে সরাসরি ভাবে দেখা, সরাসরি একটা অন্তর্ভেদী আধ্যাত্মিক আবেগ ও অনুভূতি আসা, সঠিক ইচ্ছা ও সঠিক ক্রিয়া সম্বন্ধে সরাসরি একটা বোধি আসা, বাহ্য সত্তার হাতড়ানির পরিবর্তে ভিতরকার সত্যের দিক থেকে ও প্রকৃতির গুহ্য সত্যের দিক থেকে এমন শক্তি লাভ করা যাতে সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার একটা সুনিশ্চিত ধারার স্থায়ী সৃষ্টি হয়ে যায়।

আধ্যাত্মিক রূপান্তর

…এতে একটা আলো নেমে এসে নিম্ন সত্তাকে ও মনপ্রাণ দেহকে পরিব্যাপ্ত করে, অথবা তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়; অথবা একটা উপস্থিতি বা শক্তি বা জ্ঞানপ্রবাহ তরঙ্গে তরঙ্গে এসে অকস্মাৎ এক আনন্দ প্লাবনে আপ্লুত ক'রে দেয়; ততক্ষণে অতিচেতনার সঙ্গে সংস্পর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কারণ পুনঃ পুনঃ ঐসকল অনুভূতি আসতে আসতে তা স্বাভাবিক ও সুপরিচিত ও উত্তমরূপে বোধগম্য হয়ে যাওয়াতে তার ভিতরকার রহস্য ও তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়ে এসেছে। প্রথমে যেমন তার বাহ্য অনুভূতি রহস্যে আবৃত ও নিবর্তিত হয়ে

থাকতো তা আর নেই। এর কারণ উপর থেকে একটা জ্ঞানধারা বারে বারে এবং নিত্যই আসছে নেমে, প্রথমে সবিরাম তার পরে অবিরাম, এবং তা মনের নীরবতার মধ্যে নিত্যই অভিব্যক্ত হচ্ছে; বোধি এবং প্রেরণা পেয়ে এবং বৃহত্তর আলোতে দিব্যদৃষ্টি পেয়ে তখন স্পষ্ট দেখা সম্ভব হচ্ছে, সত্তার মধ্যে এক উচ্চতর সত্য ও প্রজ্ঞা এসে প্রবেশ করছে, একটা দীপ্তিপূর্ণ ও বোধি-যুক্ত বিবেচনা শক্তি সেখানে কাজ করছে যাতে বোঝবার পক্ষে সকল অস্পষ্টতা ও ধাঁধা ও অন্ধকার দূর ক'রে দিচ্ছে, আর সব কিছুই সুশৃঙ্খলে ঘটে যাচ্ছে; একটা নবতর চেতনা তখন আকার নিচ্ছে। মন তখন এক অতি-মানসিক চেতনাতে বা বোধিতে বা জ্ঞানদীপ্তিতে উচ্চ ও ব্যাপক রকমের স্বাধিকার অস্তিত্ব নিয়ে নতুন চিন্তাশক্তিতে ও দৃষ্টিতে সরাসরি ভাবে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি পেয়ে তদনুরূপ ভাবে চিন্তা করতে পারছে, সুতরাং সাধারণ চিন্তা ও দৃষ্টির শক্তিগুলি অপেক্ষা তা অনেক বেশি; আমাদের বর্তমান সত্তার আধ্যাত্মিক অংশে তখন এক বৃহত্তর সম্ভূতি দেখা দিয়েছে; হৃদয় ও ইন্দ্রিয়াদি হয়ে গেছে এমনই সূক্ষ্ম ও সুতীক্ষ্ণ ও সুবৃহৎ যে সকল অস্তিত্বকে সে আঁকড়াতে পারছে, ভগবানকে দেখতে পাচ্ছে, শাশ্বতকে অনুভব করতে ও শুনতে ও স্পর্শ করতে পারছে, একটা পরাৎপর উপলব্ধির দ্বারা নিজের ও সমগ্র জগতের মধ্যে একটা গভীরতর ও ঘনিষ্ঠ ঐক্য দেখতে পাচ্ছে। আরো অনেক কিছু অভ্রান্ত অনুভূতি ও চেতনার পরিবর্তন আসে এই মূল পরিবর্তনের আনুষঙ্গিক রূপে। এ বিপর্যয়ের কোনো সীমা টানা যায়না, কারণ এ হলো স্বয়ং অনন্তের হানা।

...একটা আলো এবং শক্তি, একটা জ্ঞান ও তেজ এসে দেখা দিয়েছে বলে বোধ হতে থাকে—যা প্রথমে মনকে অধিকার ক'রে তাকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করে, অতঃপর প্রাণের অংশকে নিয়ে তাকেও নতুন ছাঁচে ঢালে, শেষে ক্ষুদ্র দেহ চেতনাকে নিয়ে তাকে আর ক্ষুদ্র থাকতে না দিয়ে বৃহৎ ও নমনীয় করে ও এমন কি অনন্তে পর্যন্ত উত্তীর্ণ করে। কারণ এই নব চেতনার প্রকৃতিই হলো অনন্তধর্মী; ওতে আমাদের মধ্যে এসে পড়ে স্থায়ী রকমের অধ্যাত্মবোধ এবং অনন্ত ও শাশ্বতের সম্বন্ধে একটা অবগতি, তাতে প্রকৃতির সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে দিয়ে তাকে বিরাট ক'রে তোলে; অমরত্ব তখন আর বিশ্বাস মাত্র বা অনুভূতি মাত্র না থেকে স্বাভাবিক আত্মজ্ঞানের মধ্যে এসে যায়; ভগবান রয়েছেন সামনে, তিনিই জগৎ চালাচ্ছেন, এবং আমরা তাতে স্বাভাবিক অংশীদার, তাঁর শক্তি আমাদের মধ্যে এবং সর্বত্রই কাজ করছে

বলে জানছি, অনন্তের শান্তি ও আনন্দ এখন সত্তার মধ্যে নিরন্তর বিরাজ করছে বলে জানছি; সবকিছু দৃশ্যে এবং রূপে সেই শাশ্বত সৎবস্তুকেই দেখছি, সকল শব্দের মধ্যে তাকেই শুনছি, সকল স্পর্শের মধ্যে তাকেই অনুভব করছি, সকল আকৃতি ও ব্যক্তিত্ব ও অভিব্যক্তির মধ্যে সে ছাড়া আর কিছুই নেই; হৃদয়ের আনন্দ বা প্রেম, সকল অস্তিত্বের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে থেকে আত্মার ঐক্যবোধ, এইগুলিই হয় স্থায়ী রকমের বাস্তব। মনোময় জীবের চেতনাটি তখন ঘুরে যাচ্ছে বা সম্পূর্ণই ঘুচে গিয়ে অধ্যাত্ম সত্তার চেতনাতে এসে দাঁড়িয়েছে। এই হলো তিন রূপ রূপান্তরের দ্বিতীয় রূপ; অভিব্যক্ত অস্তিত্বের মিলে যাওয়া তার উপরকার জিনিসের সঙ্গে। এই হলো মাঝের ধাপ, আধ্যাত্মিক বিবর্তনমুখী প্রকৃতির কৃতনিশ্চয় মধ্যবর্তী উন্নয়ন।

অতিমানস রূপান্তর

...এবার এতে হবে উপর থেকে অতিমানসের অন্তঃপ্রবেশ, প্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞানময় সত্তার অবতরণ, আর নীচের দিক থেকেও প্রচ্ছন্ন অতিমানস তেজের নির্গমন; এই দুই জিনিসে মিলে সব কিছুকে উদ্ঘাটিত ক'রে প্রকৃতির মধ্যে তখনও যা কিছু অজ্ঞানতা আছে তাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে। নিশ্চেতনার রাজ্য একেবারেই ঘুচে যাবে; কারণ নিশ্চেতনা নিজেই বদলে যাবে তার ভিতরকার লুকিয়ে থাকা বৃহত্তর চেতনার স্ফুরণে, প্রকৃতপক্ষে যা ছিল গোপন আলোর আলো, প্রচ্ছন্ন অতিচেতনের লুকানো সমুদ্র। তার ফলে হবে আসল বিজ্ঞানময় চেতনা ও প্রকৃতির প্রথম সংগঠন।

...বিজ্ঞানময় পুরুষে যে পরিণত হয়েছে, সে যে তার বাহ্য ও আভ্যন্তর জীবনে বা সমষ্টিগত জীবনে কেবল একটা সঙ্গতিপূর্ণ ঐক্য উপলব্ধির উপর সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে নিরন্তর ঐরূপ ঘনিষ্ঠভাবেই জীবন যাপন করতে থাকবে তা নয়, কিন্তু যে মনোময় জগৎ এখনও রয়েছে অজ্ঞানের তমসাচ্ছন্ন, তথাপিও তারও সঙ্গে সে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যের সৃষ্টি ক'রে নেবে।...একটি বিজ্ঞানময় পুরুষ বেরিয়ে এলে তাতেই বেশ আশা থাকে এই পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে আরো সঙ্গতিজনক ভাবে ক্রমিক বিবর্তনের ধারা আরো ত্বরান্বিত গতিতে অগ্রসর হবার।

বিজ্ঞান হলো আত্মার কার্যকরী মূলসূত্র, আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের সর্বোচ্চ

সক্রিয়তা। বিজ্ঞানময় ব্যক্তি হবে সম্পূর্ণ রকমের আধ্যাত্মিক মানুষ,—তার সত্তার, চিন্তার, জীবন ধারণের, কাজ করবার সমগ্র ধারাই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে এক বিরাট বিশ্বময় আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা। আত্মার তিনটি ভাবই তার আত্মজ্ঞানের কাছে বাস্তব হয়ে আভ্যন্তর জীবনে উপলব্ধ হবে। তার সমগ্র অস্তিত্বই পরাৎপর ও বিশ্বময় পরমাত্মার সঙ্গে মিলে এক হয়ে যাবে। তার সকল কাজই উদ্ভূত হবে পরমাত্মা ও তার দ্বারা দিব্যভাবে পরিচালিত প্রকৃতি হতে এবং তারই বশে সে চলবে। তার কাছে সমগ্র জীবনটাই হবে ভিতরকার চেতন পুরুষের ভাববিকাশ, যা প্রকৃতির মধ্যে পূর্ণ আত্মবিকাশ পাচ্ছে; তার জীবন, চিন্তা, অনুভব, কর্মাদি সবই ওরই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওরই বাস্তবতায় সুপ্রতিষ্ঠ ভাবে গড়ে উঠবে। তার চেতনার প্রতি কেন্দ্রে, তার জীবনী শক্তির প্রতি স্পন্দনে ও তার দেহস্থ প্রতি কোষের মধ্যে সে ভগবৎ উপস্থিতি বোধ করতে থাকবে। তার প্রকৃতিগত সকল কাজের মধ্যেই সে জানবে যে বিশ্বমাতা ও পরাপ্রকৃতি যাবতীয় ক্রিয়াগুলি করছেন; সে দেখবে যে তার স্বাভাবিক সত্তাটি হলো সেই বিশ্বমাতার শক্তিরই সম্ভূতি ও অভিব্যক্তি। এই চেতনা নিয়ে সে সব কিছুই ক'রে যেতে থাকবে সম্পূর্ণ মুক্তভাবে ও আত্মার পূর্ণ আনন্দে, বিশ্বসত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ও বিশ্বময় সব কিছুর সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি নিয়ে। সে সকল জীবেই দেখবে তার নিজের স্বরূপ, সকল চেতনার সকল ক্রিয়া-ধারাতেই দেখবে তার নিজের বিশ্বগত চেতনার ক্রিয়াধারা।...তার নিজের জীবন এবং এই বিশ্বজীবন তার কাছে হবে এক পরমতম কারিগরের কলা-কৌশলের নিদর্শন।...এক সুবৃহৎ বিশ্বগত আত্মবিকাশ, এক সুবৃহৎ জগৎ-সত্তার সঙ্গতিপূর্ণ বিশ্বময়তা বোধ, এই হবে তার বিজ্ঞানময় প্রকৃতির ভিতরকার অতিমানস পুরুষের সুনির্দিষ্ট লক্ষণ।...এই অতিমানস সত্তার অস্তিত্ব হবে সেই অদ্বিতীয় অনন্য অস্তিত্বের ও অনন্য চেতনার ঋত শক্তির বহুভাবে ও বহুরূপে অভিব্যক্তির একটি লীলা।...তার বিজ্ঞানময় অস্তিত্ব ও সেই অস্তিত্বের আনন্দ সমগ্র বিশ্বেরই সম্ভূতি ও আনন্দ, সেই সমগ্রতাই তার প্রত্যেক বিভিন্ন সক্রিয়তার মধ্যে প্রকাশ পেতে থাকবে। তার মধ্যে নিজের কোনো আংশিক অনুভূতি বা নিজের ব্যক্তিগত আনন্দের একটি টুকরা মাত্রও নেই, তার মধ্যে থাকবে পূর্ণ সত্তার সমগ্র কৃতি ও উপস্থিতি ও পূর্ণ সত্তার পূর্ণানন্দ।

যাকে বলে অতিমানস রূপান্তর, অতিমানস ক্রমবিবর্তন, তাতে মন প্রাণ দেহ নিজের সীমা ছাড়িয়ে এক বৃহত্তর সম্ভূতির মধ্যে উঠে চলে যাবে, অথচ সেই মন প্রাণ দেহের নিজস্ব ধারা বর্জিত বা দমিত হবেনা, কিন্তু তারও হবে এক আত্মোত্তীর্ণ রকমের পূর্ণ পরিণতি।...এক অপূর্ব আত্মদীপ্ত, আলোর ভিতর থেকে আরো আলোর বিকাশ, এই হবে অতিমানস প্রকৃতির বিবর্তনের সুনিশ্চিত নিরূপণ।

পরিশিষ্ট

চিন্তা ও বাণীর চয়নিকা

মানুষ ইতিপূর্বে যা ক'রে গেছে আমরাও বরাবর তারই যে পুনরাবৃত্তি ক'রে যেতে থাকব এমন আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ তার চেয়ে আরো নতুনতর উপলব্ধিতে ও এমন কি স্বপ্নাতীত অধিকার লাভে গিয়ে পৌছনো। তার ক্ষেত্র রূপে পেয়েছি আমরা কাল ও আত্মা ও জগৎকে, দূরদৃষ্টি ও আশা ও সৃষ্টিমূলক কল্পনা হলো আমাদের উত্তর সাধক, ইচ্ছা ও চিন্তা ও শ্রম হলো আমাদের সর্বসাফল্যদায়ক যন্ত্র।

* * *

নতুন জিনিস কী আছে যা এখনও আমাদের আয়ত্ত করা হয়নি? প্রেম,—কারণ আজ পর্যন্ত আমরা যা শিখেছি তা শুধু ঘৃণা আর আত্মতুষ্টি; জ্ঞান,—কারণ আজ পর্যন্ত আমরা শিখেছি শুধু ভুল করা ও মনে বুঝে নেওয়া ও আন্দাজ করা; আনন্দ,—কারণ আজ পর্যন্ত জেনেছি শুধু সুখ আর দুঃখ আর ঔদাসীন্য; শক্তি,—কারণ আজ পর্যন্ত জেনেছি শুধু অশক্তি আর প্রয়াস আর পরাজিতের জয়লাভ; জীবন,—কারণ আজ পর্যন্ত জেনেছি শুধু জন্মাতে আর বড়ো হতে আর মরতে; একতা,—কারণ আজ পর্যন্ত শিখেছি শুধু যুদ্ধ আর জোট পাকানো সম্মেলন।

* * *

এক কথায়, আমরা চাই—দেবতা হতে, দিব্যের মতো নিজেদের গড়ে তুলতে।

* * *

মানুষ যদি শুধু আধ্যাত্মিক হতে রাজী হয় তাহলে সবই বদ্‌লে যায়; কিন্তু তার মন প্রাণ দেহগত প্রকৃতি অতি অবাধ্য, উপরের আইন মানতে চায়না। তার নিজের অপূর্ণতা নিয়ে থাকাই তার পছন্দ।

* * *

জগতে আজ আমরা যা কিছু পরিবর্তন দেখছি তা আদর্শ ও অভিপ্রায়ের দিক দিয়ে সবই বুদ্ধিগত, নীতিগত, বস্তুগত; আধ্যাত্মিক বিপর্যয় তার সময়

আসার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে, আর ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে এখানে ওখানে তার ঢেউ উঠছে। যতক্ষণ তা পুরো এসে না পড়ছে ততক্ষণ কোনোটারই অর্থ বোঝা যাবেনা, যা কিছু এখন হচ্ছে আর মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা ধারণা করা হচ্ছে তা সবই বৃথা। কারণ ঐ জিনিসেরই প্রকৃতি ও শক্তি ও ঘটনা পরম্পরা এসে আমাদের মানব জীবনের পরবর্তী ভবিষ্যৎ চক্রের সমুচিত নির্ধারণ করবে।

* * *

জীবনের এই এক বিশেষ শিক্ষা যে এ জগতে মানুষকে সব কিছুর কাছেই ঠকতে হয়—শুধু ভগবানের কাছে কখনো ঠকতে হয়না, যদি সে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের দিকে ফিরে দাঁড়ায়······ঐদিকে ফেরাই জীবনের একমাত্র সত্য।

* * *

পশুরা তাদের প্রয়োজনের জিনিস কিছুমাত্র পেলেই খুশি; দেবতারা তাদের আপন ঐশ্বর্য নিয়েই খুশি; কিন্তু মানুষ তার ভালোর সর্বোচ্চে গিয়ে না পৌছনো পর্যন্ত স্থায়ীভাবে কোনো কিছুতে খুশি হয়ে থাকতে পারেনা।

* * *

মানুষ হলো প্রকৃতির মস্ত এক মধ্যবর্তী পদ, যেখানে সে তার লক্ষ্য সম্বন্ধে রীতিমত সচেতন হয়ে উঠেছে; পশু ছেড়ে মানুষেরই ভিতর দিয়ে উপর দিকে চেয়ে খোলা চোখে সে তার দিব্য আদর্শকে দেখতে পাচ্ছে।

* * *

মানুষ উঠে যাবে স্বর্গে সেটাই চূড়ান্ত কাম্য নয়, বরং এখানেই তার আত্মার মধ্যে গিয়ে ওঠা চাই, এবং সেই আত্মার আবার স্বাভাবিক মানব জীবনের মধ্যে নেমেও আসা চাই এই পার্থিব প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাতে।

* * *

কোনো নীচু দরের সম্ভাব্য সামর্থ্য অর্জন করা বা তাতেই স্থৈতিক হয়ে থাকা আপাতত নিরাপদ, সহজ, যুক্তিযুক্ত ও আরামপ্রদ মনে হতে পারে, কিন্তু শেষফল তার খারাপ হয়; হয়তো দেখা যায় তা ব্যর্থ, কিংবা শুধু অন্ধকার গর্তের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া, অথবা তারই পাঁকের মধ্যে ডুবে পড়ে

থাকা। আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও ঠিক রাস্তা হলো উচ্চ চূড়ান্তের দিকে উত্তরোত্তর কেবল উঠে যাওয়া।

* * *

আধুনিক সভ্যতার মূল লক্ষ্য এখনও বাণিজ্যের দিকে; অতিব্যস্ত চমকপ্রদ কর্মণ্যতা এখনও তার প্রধান নিয়ামক শক্তি।

* * *

ধনকুবের ও প্রতিপত্তিশালী দৌলতী পুঁজিদার ও শিল্পপতি, এরাই এখনকার বাণিজ্য যুগের অতিমানব, আর তারাই সমাজেরও প্রকৃত রকমের শাসনকর্তা ও নিয়ন্তা, যদিও প্রায়ই তা গুহ্যভাবে।

* * *

এখনকার সকল আদর্শবাদের প্রধান নিরিখ হলো ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, এখনও পর্যন্ত তার কোনোটাই ধর্মীয় বা লোকায়ত জিনিস নয় যা ক্ষমতা পেতে চায়নি কিংবা ক্ষুদ্রতা বা অপচার থেকে মুক্ত থেকেছে।

* * *

ইউরোপ তার ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক সংগঠন ও সুপটুতা নিয়ে গর্ব করে। তা পুরোপুরি হয়ে না ওঠা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা ক'রে আছি; তারপর দেখা যাবে একটি শিশু তাকে হঠাৎ ধূলিসাৎ ক'বে দিলে।

* * *

মানবজাতি যখন আরো উন্নত হবে তখন তারা আমাদের এখনকার সভ্যতার দিকে ফিরে চেয়ে কতই না অবাক হয়ে তাচ্ছিল্য ক'রে বলবে, সেই অপূর্ণ রকমের সভ্যতার যুগে এতই ছিল কুসংস্কার ও কু-আচরণ।

* * *

যে আইন আমাদের নিজের নয় এবং যার প্রকৃতি আমরা বরদাস্ত করতে পারিনা, তাকেই বরাবর মেনে চলার চেয়ে বরং বে-আইনী অরাজকতাও ভালো।

* * *

চূড়ান্তের পথ অনুসরণ করা আমাদের জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক মনে হতে পারে…কিন্তু সেই বিপদের ভিতর থেকেই আসে জয় ও নিরাপত্তা।

* * *

আধ্যাত্মিকতা মানে উঁচু দরের জ্ঞানবুদ্ধিও নয়, আদর্শবাদও নয়, মানসিক নৈতিকতাও নয়, কিংবা চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও উগ্র সাধুতাও নয়, ধার্মিকতাও নয়, বা তীব্র ভাবানুরাগও নয়, এমন কি এইসব ভালো ভালো জিনিসের একত্রীকরণও নয়।

* * *

একজন ভালো মানুষ ও ধার্মিক ব্যক্তিও কতই না অন্ধ ও অহংকেন্দ্রিক হতে পারে।

* * *

লোকহিতৈষী এমন অনেকে আছে যারা খুব ক্ষুণ্ণ হবে যদি আমাদের মধ্যে দরিদ্র জনেরা না থাকে, কারণ তাহলে তো তাদের বদান্য দানশীলতা দেখানোর উপায় আর থাকবেনা।

* * *

লোককে সাহায্য করো, কিন্তু তাদের মধ্যে চেষ্টার অভাব আসতে দিওনা…দেখো যেন তাদের কর্মোৎসাহ ও মৌলিকতা বজায় থাকে…এই যে করতে পারবে সেই হবে নেতা ও গুরু।

* * *

যে অজ্ঞান আত্মা সেই থাববে পুস্তকের দাস হয়ে।

* * *

ইতিহাসে খুব বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটে গেছে চারটি—ট্রয় নগরীর অবরোধ, খ্রীষ্টের জীবন ও তাঁকে ক্রুশবিদ্ধকরণ, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের নির্বাসন, এবং কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন। ট্রয়ের অবরোধে সৃষ্টি হলো হেলাস্, কৃষ্ণের বৃন্দাবন নির্বাসনে সৃষ্টি হলো প্রেম ভক্তির ধর্ম (তার আগে ছিল শুধু ধ্যান ও উপাসনা), খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হওয়াতে সমগ্র ইউরোপ মানবতায় দীক্ষিত হলো, আর কুরুক্ষেত্রের গীতার কথোপকথন এখনও মানুষকে মুক্তির

নিদেশ দিতে থাকছে। অথচ বলা হয় যে এই চারটি ঘটনার কোনোটাই বাস্তবিক আদৌ নাকি ঘটেনি।

*   *   *

ভগবান হলেন অনন্ত সম্ভাবনাময়। তাই সত্য কখনো এক জায়গাতে স্থির থাকেনা; আর তাই তাঁর সন্তানদের বেলাতে ভুল কাজ করাও অন্যায্য হয়না।

*   *   *

ভগবান যদি আমাকে স্বর্গের দিকে টানেন, তাহলে যদিও বা তিনি তাঁর অপর হাতটা দিয়ে নরকে চেপে রাখতে চান, তবু আমি উপরে ওঠবার জন্যই লড়ে যেতে থাকবো।

*   *   *

কেউ যেন বলেছিল যে ভগবানের এমন কিংবা তেমন হওয়া উচিত, নতুবা তিনি ভগবান হতে পারেন না। কিন্তু আমার মনে হয় যে আমি ভগবানকে শুধু জানতেই পারি, কিন্তু তাঁর যে কেমন হওয়া উচিত সে কথা তাঁকে বলতে পারিনা। কারণ কোন আদর্শ ধরে তাঁর বিচার করতে যাবো? সব রকমের বিচারগুলো যে শুধু আমাদেরই আপন অহংএর পাগলামি।

*   *   *

ওরা নানা অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করলে যে ভগবান নেই, সে কথা আমায় মানতে হলো। কিন্তু তার পরে ভগবানকে আমি দেখলাম, তিনি স্বয়ং এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। এখন কোনটাকে আমি বিশ্বাস করি, তাদের যুক্তিকে না আমার নিজের দেখাকে?

*   *   *

জগৎকে যে শক্তি চালাচ্ছে তার অন্ততপক্ষে তোমার মতো বুদ্ধি থাকবে, সুতরাং এর জন্য তোমার কাছ থেকে তার বুদ্ধি নেবার খুব বেশি দরকার হবেনা; ভগবানই তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করছেন।

*   *   *

ভগবান শুধু সময় বিশেষেই বোকা সাজতে ভালোবাসেন; আর মানুষ সব সময়েই বোকা সাজে। এই কেবল তফাৎ।

মোটের উপর ভগবান কেমন? সে এক শাশ্বত শিশু শাশ্বত উদ্যানের মধ্যে এক শাশ্বতের খেলা খেলছে।

* * *

ভগবান যদি মানুষকে প্রলুব্ধ করবার ভারটা নিজে না নিতেন, তাহলে এই জগৎ অনতিকালের মধ্যেই লোপ পেয়ে যেতো।

* * *

লড়ে যাও, হাত যতদিন তোমার মুক্ত রয়েছে ততদিন হাত দিয়ে, আর কণ্ঠ দিয়ে আর মস্তিষ্ক দিয়ে আর সকল রকমের যন্ত্র দিয়ে শুধু লড়ে যাও। শত্রু কি তোমায় তার কারাগারে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে, সে কি তোমার মুখে কাপড় গুঁজে মুখ বন্ধ ক'রে রেখেছে? তবুও লড়ে যাও তোমার সর্ব-বিমুখ নীরব আত্মা দিয়ে, তোমার বহুবিস্তারী ইচ্ছাশক্তি দিয়ে, আর যদি মারা যাও তখনও লড়ে যাও তোমার জগৎ প্রসারী তেজ দিয়ে, যা ভগবানের ভিতর থেকে তোমার ভিতর ঢুকে রয়েছে।

যখন তুমি খুব একটা বড়ো কাজ করছ আর তার ফলও বিরাট রকমের হচ্ছে, তখনও যদি তোমার মনে হতে থাকে যে কিছুই করা হয়নি, তাহলে তখন জানবে যে ভগবান তোমার চোখের উপর থেকে তাঁর সীল-করা ঢাকনিটা সরিয়ে দিয়েছেন।

* * *

এ পথে চলতে যতই কেন কষ্ট ভোগ আসুক, যে বিজয় তোমার লাভ হবে তার পক্ষে তাও বেশি কিছু নয়, আর সঠিক মনোভাবের সঙ্গে তাকে যদি মেনে নাও তাহলে দেখবে যে তাই হবে বিজয় লাভের একটা উপায় স্বরূপ।

* * *

দুঃখ কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে তাকে জয় করার জন্যই।

* * *

ব্যথা হলো মায়ের হাতের স্পর্শ। তিনি ঐরূপ স্পর্শ দিয়ে শেখান যে কেমন ক'রে তাকে সয়ে নিয়েই আনন্দে উত্তীর্ণ হতে হয়। তাঁর এই শিক্ষার তিনটি ধাপ আছে, প্রথমে সহ্য করা, তারপরে আত্মাতে সমতা লাভ, শেষে পুলকানন্দ।

* * *

" ভগবান তাঁর জগৎকে এমন প্রচণ্ড ভাবে হাতুড়িপেটা ক'রে তাকে কাদার তালের মতো পায়ে দলে আর বারে বারে তাকে রক্তস্নান করিয়ে গনগনে আগুনের চুল্লীতে নিক্ষেপ করছেন কেন? তার কারণ এই মানবমণ্ডলী এখনও এমন বেয়াড়া রকমের কঠিন ধাতুপিণ্ড হয়ে রয়েছে যে ও ছাড়া তাকে গলিয়ে ঠিক গঠনে আনা যাচ্ছেনা। তাঁর গড়বার উপাদান যেমন হবে, প্রণালীটাও তো তেমনি হবে। এরা যদি চেষ্টা ক'রে নিজেকে রূপান্তরিত ক'রে বিশুদ্ধ রকমের উৎকৃষ্টতর ধাতুতে পরিণত হতে পারে, তাহলে তখন তাঁর আচরণও হবে শিষ্ট ও মধুর, আর এ ধাতু দিয়ে তাঁর কাজও হবে উত্তম ও উঁচুদরের।

* * *

কান্নার চেয়ে হাসি অনেক দামী জিনিস।

* * *

আমাদের ভিতরকার আত্মা বিশ্ব শক্তিদের চেয়েও বড়ো জিনিস।

* * *

জয়ের আনন্দ কখনো কখনো কষ্টদায়ক সংগ্রামের আকর্ষণের চেয়ে কম উপভোগ্য হয়; তথাপি বিজয়ী মানবাত্মার পক্ষে ক্রুশের পরিবর্তে জয়মাল্য লাভের দিকেই লক্ষ্য করা উচিত।

* * *

সাধনা ও ক্রমোন্নতিকে টপ্‌কে মুক্তিতে গিয়ে পৌছনো খুব অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটে।

* * *

নিজের কর্মপ্রেরণাতে বিশ্বাস রাখা ছাড়া, কিংবা সত্য তার পিছনে কাজ করছে এ বিশ্বাস থাকা ছাড়া কে কবে জগতে কোনো বড়ো কাজ করতে পেরেছে?

* * *

বড়ো বড়ো সাধুরা অলৌকিক অঘটন ঘটিয়েছেন; তার চেয়ে বড়ো সাধুরা তাতে গালি দিয়েছেন; আর যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু তাঁরা গালিও দিয়েছেন কিন্তু আবার তা নিজেরাও করেছেন।

* * *

যদি সমগ্র জীবনটাই যোগ হবে, তাহলে তার মধ্যে কোন জিনিসটাকেই বা তুচ্ছ কিংবা অপ্রয়োজনীয় বলা যাবে ?

* * *

আমার প্রিয় যখন আমার পাপের বসনটা ছাড়িয়ে নিলে, তখন আমি তা খুশি হয়ে ছেড়ে দিলাম ; তারপর যখন সে আমার পুণ্যের বসনটাও ধরে টান দিতে গেল, তখন আমি লজ্জিত হয়ে আর ভয় পেয়ে তাকে নিবারণ করতে গেলাম। যখন সেটাও সে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিলে, তখন দেখতে পেলাম যে আমার নিজের আত্মা কেমন ক'রে আমার নিজের কাছ থেকেই আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

* * *

যখন আমি কিছু জানতামনা, তখন আমি পাপী অপরাধী ও অসৎ লোকেদের ঘৃণা করতাম, যদিও আমার নিজের মধ্যে পাপ অপরাধ ও অসত্য যথেষ্টই ছিল ; কিন্তু যখন আমি বিশুদ্ধ হলাম আর আমার চোখ খুলে গেল, তখন আমি অন্তরে অন্তরে চোর আর খুনীকে প্রণাম করলাম, বারবণিতার পায়ে মাথা ঠেকালাম ; কারণ আমি দেখলাম যে এই সব আত্মা যত কিছু মন্দের ভারি বোঝাগুলো নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে ; আর জগৎসমুদ্র মন্থন ক'রে যে হলাহল উঠছে তার অধিকাংশই আমাদের হয়ে পান ক'রে নিচ্ছে।

* * *

পাপীকে ঘৃণা করা সব চেয়ে বড়ো পাপ, কারণ তাতে ভগবানকে ঘৃণা করা হয় ; তথাপি যে পাপ করে সে উচ্চতর পুণ্যকে গৌরবান্বিত করে।

* * *

এ এক আশ্চর্য রহস্য যে মানুষ ভগবানকে ভালোবাসতে পারে অথচ মানুষকে ভালোবাসতে অপারগ হয়। তাহলে কার প্রতি তাদের ভালোবাসা ?

* * *

ভগবান আমাকে আঘাত ক'রে তবে ভালোটা দিলেন। তাহলে কি আমি তাঁকে বলব, 'হে সর্বশক্তিমান, এবার তোমার এই নিষ্ঠুরতার কাজটাকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু আর যেন এমন আঘাত কোরোনা ?'

* * *

ভগবান ভালোবাসেন বলেই তিনি এমন দুর্দান্ত রকমের নিষ্ঠুর পীড়নকারী। তোমরা এ কথাটা বুঝতে পারোনা, কারণ কৃষ্ণকে তোমরা দেখনি, আর তাঁর সঙ্গে তো খেলাও কিছু করোনি।

* * *

হে প্রেমিক, তুমি আঘাত করো! এখন যদি তুমি না আঘাত হানো, তাহলে জানবো যে তুমি আমাকে প্রকৃত ভালোবাসো না।

* * *

কোনো অপরাধীকে ফাঁসী দিতে নিয়ে যাচ্ছে দেখে স্যার ফিলিপ সিড্‌নি বলেছিলেন, 'ঐ দেখ, ভগবানের দয়া পায়নি বলে ঐ স্যার ফিলিপ সিড্‌নি যাচ্ছে।' আরো প্রজ্ঞাবান হলে তিনি বলতেন, 'ঐ দেখ, ভগবানের দয়া পেয়ে ঐ স্যার সিড্‌নি ফিলিপ যাচ্ছে।'

* * *

বিধাতা কেবল তিনিই নন যিনি সমুদ্রে জাহাজ ডুবিতে অন্য সবাই ডুবে মরলেও আমাকেই শুধু বাঁচালেন। তিনিও সেই বিধাতা যিনি অন্য সবাইকে বাঁচিয়ে দিলেও কেবল আমাকেই পায়ের তলার পাটাতন খসিয়ে দিয়ে নিঃসঙ্গ ভাবে সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন।

* * *

জীবনে যে কখনো বিফল হয়নি আর কষ্ট পায়নি, তাকে কখনো বিশ্বাস কোরোনা; তার ভাগ্যকে অনুসরণ কোরোনা, তার পতাকার তলে লড়তেও যেওনা।

* * *

অনন্তকে যে বেছে নিয়েছে, অনন্তই তাকে আগে বেছে নিয়েছেন

* * *

ভগবানের যে দাস হয় তার সেবার মধ্যে দুটি কাজকে তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন; একটি হলো নীরব প্রেমে তাঁর মন্দির প্রাঙ্গণে ঝাঁট দেওয়া, আর একটি হলো জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করা যাতে সকল মানুষের মধ্যে তাঁর দিব্য সাযুজ্য সম্পাদন হতে পারে।

* * *

ভগবানের যে দাস হয় সে কিছুটা বড়ো; যে ক্রীতদাস হয় সে তার চেয়েও বড়ো।

* * *

যে সব আত্মার কোনো আস্পৃহা নেই তারা ভগবানের ব্যর্থ সৃষ্টি; কিন্তু প্রকৃতি তাদের নিয়ে খুশি আর তাদের সংখ্যা বাড়াতেই চায়, কারণ তাহলে তার সাম্রাজ্যটা বহুকাল স্থায়ী ভাবে বজায় থাকবে।

* * *

পথের কোনো ধাপকে শেষ লক্ষ্য বলে মনে করা আর সেখানেই অনেক-কাল ধরে শিকড় গেড়ে বসে থাকা, এর চেয়ে অচল-করা ভুল আর কিছু নেই।

যারা ভগবানের কাছে কিছু চায় তাদের সেটা তিনি দেন, কিন্তু যারা নিজেদের শুধু দেয় আর চায়না কিছু, তাদের যা যা দরকাব হ'তে পারে তার সব কিছুই তিনি দেন, তাছাড়া আপন প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত বরদান স্বরূপ তিনি নিজেকেও দিয়ে দেন।

* * *

আমাদের যোগ আগেকার চলাপথে আবার চলা নয়, এ হলো এক আধ্যাত্মিক অভিযান।

* * *

আমরা বিগত উষার অন্তর্ভুক্ত নই, আমরা হচ্ছি ভবিষ্যৎ মধ্যাহ্নের অন্তর্ভুক্ত।